ইসলামে শিক্ষা ও সংস্কৃতি

আবুল হোসেন

ইসলামে শিক্ষা ও সংস্কৃতি

আবুল হোসেন

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম - ঢাকা

www.amarboi.org

ইসলামে শিক্ষা ও সংস্কৃতি
আবুল হোসেন

প্রকাশক
এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল
জানুয়ারি/২০১৩

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ ডিজাইন ও অলংকরণ
ডিজাইন ওয়ান

মূল্য ঃ ২৫০/- টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।

Islameer Shikkha & Sangskrity (Educatin & Culture in Islam): Written by **Abul Hossain**, **Published by**: S.M. Raisuddin, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk. 250/- US : 08/-   ISBN - 984 - 70241 - 0055 - 9

www.amarboi.org

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত আব্বা আম্মার
পবিত্র রূহ মুবারকের বেহেশতী শান্তির
উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি নিবেদিত হল।

লেখক

www.amarboi.org

ভূমিকা

জীবজগতে বাঁচার জন্যে মানব জীবনের খেলা সব সময় চলে আসছে। মানুষ কখনও একটা জগৎ নিয়ে বাঁচে না। বাঁচার জন্যে তার কয়েকটা জগতের প্রয়োজন। বিশ্বজগৎ, মনোজগৎ, জ্ঞানজগৎ, ধর্মজগৎ এবং সর্বোপরি আধ্যাত্মিক বা পরজগৎ। প্রত্যেকটির সাথে আর একটির সম্পর্ক জড়িত। বিশ্বজগতের সাথে ধর্মজগৎ অর্থাৎ ইসলামকে ধরে রাখতে না পারলে মানবজগৎ পশুজগতের সাথে মিশে গিয়ে ধর্মীয়, সামাজিক এবং শিক্ষা সংস্কৃতিক জীবনে ধ্বংসের চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে বাঁচার জন্যে ইসলামে শিক্ষা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা তত্ত্ববিদ্যা না থাকলে ধর্ম তত্ত্ববিদ্যা থাকে না, তখন ইসলামের সবকিছু বিনষ্ট হয়ে মানব জীবন অবস্থান করে নরকরাজ্যে। মুক্তির উপায় হিসেবে প্রয়োজন শিক্ষা এবং ধর্মচর্চা। জীবনে গোঁজামিল দিয়ে বেঁচে থাকাটা অভিশপ্ত জীবন ছাড়া আর কিছু নয়। মানব জগতে নারী পুরুষ উভয়ের অচল জীবনকে সচল করার জন্যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অধিক গুরুত্ব নির্ধারিত হয়েছে স্বয়ং আল্লাহ ও রসূলের বিধানে।

এই গ্রন্থে আমার লেখা প্রত্যেকটি প্রবন্ধে মানব জীবনে শিক্ষা গ্রহণ এবং ইসলামকে ধর্মচর্চার মাধ্যমে লালন করার বিষয়গুলো সাধ্যমত আলোচনা করেছি।

ইসলামী জীবন ধারায় ধর্মীয় আচরণ এবং সংস্কৃতির মূল সম্পর্ক হচ্ছে ইলেম বা শিক্ষা। ইসলামে শিক্ষার গুরুত্বের অমোঘ চিন্তা অনেক দিন থেকে আমার মনে আন্দোলিত হচ্ছিল এ বিষয়ে কিছু লেখার জন্যে। লেখার চিন্তা অনুভব করেছি অনেক আগে থেকে কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে লেখার দিকে ঠিকমত নজর দিতে পারিনি। আমার কর্মজীবন শেষে অবসর জীবনকে কাজে লাগানোর ক্ষুদ্র প্রয়াসে স্বচেষ্ট হয়েছি এ বিষয়ে কিছু লেখার জন্যে এবং এটাই আমার লেখার প্রথম প্রচেষ্টা। আমার ক্ষমতাই বা কতটুকু তবুও সাহসকে পুঁজি করে লেখনী ধরেছি লিখব বলে।

www.amarboi.org

মুসলমান সমাজে ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মাঝে যে সব বাধা সৃষ্টি হচ্ছে শিক্ষাহীনতা এর অন্যতম কারণ। মুসলমান সমাজে জ্ঞানশিক্ষা এবং দূরদর্শীতার অভাবে যুগে যুগে মুসলিম সভ্যতায় ও সংস্কৃতি বিকাশে ঘটেছে উত্থান পতন। সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে প্রয়োজন কোরআন এবং হাদিসের আলোয় ধর্মজ্ঞান চর্চা। আমার লেখা এই গ্রন্থে ইসলামধর্ম শিক্ষার উপর কিঞ্চিত গুরুত্ব আরোপ করেছি। লেখার প্রয়োজন বোধে আল কোরআনের কিছু কিছু আয়াত মাঝে মাঝে সন্নিবেশিত করেছি গ্রন্থটি সমৃদ্ধ করার জন্যে।

সাবধানতা অবলম্বন করেও লেখায় এবং ছাপায় হয়তো কিছু কিছু ভুলত্রুটি থেকে গেছে। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের ইচ্ছা থাকলো। আমার ধর্ম বিষয়ে ক্ষুদ্র জ্ঞানকে কতটুকু কাজে লাগাতে পেরেছি তা এই লেখার ভালমন্দ বিচারের ভার থাকলো পাঠকদের কাছে। পাঠকের ভাল লাগার স্বীকৃতি হবে আমার শ্রম ও প্রচেষ্টার স্বার্থকতা।

গ্রন্থকার

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

মুসলমান হিসেবে বাঁচতে হলে ইসলাম শিক্ষা এবং ধর্মীয় আচার আচরণ একটি আবশ্যকীয় বিষয়। মুসলমান জাতি যাতে ধ্বংস না হয় তার জন্য প্রয়োজন ইসলাম শিক্ষা এবং জ্ঞানচর্চা। লেখকের "ইসলামে শিক্ষা ও সংস্কৃতি" গ্রন্থটি বাঙ্গালী মুসলিম পাঠকদের কাছে একটি ক্ষুদ্র জ্ঞান ভাণ্ডার। ইসলাম ধর্মের উপর খ্যাতিমান আলেমদের লেখা অনেক ধর্মগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা পাঠক জগতে খ্যাতি অর্জন করেছেন, সমাদৃতও হয়েছেন। কিন্তু আবুল হোসেন নতুন লেখক হিসেবে এখনও পাঠকবর্গের কাছে অপরিচিত। আশা করি তাঁর জ্ঞানলব্ধ রচনা ধারার জন্য তিনিও একদিন পাঠকবর্গের কাছে সমাদৃত হবেন।

মানুষের মুক্তির জন্য ইসলামে সাম্যের বাণী এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আবুল হোসেন এর লেখা "ইসলামে শিক্ষা ও সংস্কৃতি" গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। লেখকের সৃজনশীল চিন্তা ইসলামের আদর্শে গ্রন্থের সবখানে প্রতিফলিত হয়েছে। ইহা একটি অনবদ্য ধর্মগ্রন্থ যার মধ্যে ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচিত হয়েছে।

একজন মুসলমানকে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে পার্থিব এবং পরলৌকিক কল্যাণ অকল্যাণ বিষয়সমূহ জানার জন্য গ্রন্থখানা অমূল্য সম্পদ। ধর্মকে কেন্দ্রকরে পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন গড়তে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষয়টি গ্রন্থের সবখানে ফুটে উঠেছে। কিতাবখানা পাঠ করলে পাঠকবর্গের অনেক ফায়দা হাসিল হবে এ আমার বিশ্বাস। গ্রন্থের প্রত্যেকটি প্রবন্ধে ইসলামের ভূমিকা সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে শিক্ষনীয় উপদেশ গ্রহণের মত অনেক কিছু রয়েছে। আমি মনে করি শিক্ষার গুরুত্ব এবং এর তাৎপর্য গ্রন্থটিকে নানা ভাবে অলংকৃত করেছে। গ্রন্থটি পাঠ করলে একদিকে পাঠকের আত্মসচেতনতা যেমন বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে মনোবিকাশের পথও উন্মুক্ত হবে।

মুসলমান নারী পুরুষের জীবন ধারায় ইসলামী আদব কায়দায় শিক্ষার আবশ্যকতা এবং জ্ঞাতব্য দিকগুলো সমগ্র কিতাবখানায় স্বচ্ছ ভাবে

www.amarboi.org

সন্নিবেশিত হয়েছে। ইসলামের বাণী প্রচারে নবীজীর অক্লান্ত সাধনাশক্তি এবং তাঁর কওমের প্রতি শিক্ষার জন্য বাধ্যকারী নির্দেশ আর এক দিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে আল্লাহর ফরজ বিধান এসবের ব্যাখ্যা সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। এই উপমহাদেশে ইংরেজশক্তির আমলে মুসলমানদের লাজুক শিক্ষা ব্যবস্থায় সীমবদ্ধতা এবং নারী শিক্ষায় বেগম রোকেয়ার শিক্ষা সংগ্রামের চিন্তাচেতনা গ্রন্থটির মধ্যে গঠন মূলক পথে আলোচিত হয়েছে।

"ইসলামে শিক্ষা ও সংস্কৃতি" কেতাবটিতে পাঠকদের কাছে প্রকৃত তথ্যভিত্তিক সত্য উপস্থাপনের জন্য যেখানে যতটুকু প্রয়োজন সেখানে আল কোরআনের অনেকগুলো আয়াত এবং হাদীসের কিছু কিছু উদ্ধৃতি থাকায় ধর্মনৈপুণ্যের মহাপ্রাণ আরও উজ্জ্বল হয়েছে। আমরা যে আশা নিয়ে কেতাবটি প্রকাশ করে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের কাছে তুলে দিলাম আল্লাহপাক লেখকের সেই আশাটুকু যেন পূরণ করেন। আমীন।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.amarboi.org

সূচী পাতা

www.amarboi.org

ইসলাম ও শিক্ষা

মুসলমান জাতির জীবন যাত্রার ফল লাভই হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম একটি বিশাল্যকরণ ধর্ম পরিচয়। ইহা দিনের পরিস্ফুটিত উজ্জ্বল আলোর মত প্রয়োজনীয় ঐশী বিধান। ইসলাম মুসলমান জাতির ধর্মভিত শক্ত করার বুনিয়াদ। ইসলাম কেবল ধর্মগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকার বিষয় নয়। ইহা মুসলমান জাতির জীবন যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়ভিত্তিক এবং ধর্মসঙ্গত কার্য পালন।

ইসলাম আরবী শব্দ, অর্থ শান্তি। ইসলাম মুসলমানের শান্তির ও কল্যাণের ধর্ম। পবিত্র কেরআন অনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা তাঁর আদেশ পালন অর্থাৎ দীপ্তমান পদ্ধতিতে (Under Splendid Divine System) আল্লাহর হুকুম পালন। ইসলাম মুসলমান জাতির সর্বশেষ উপযোগী সহজ সত্য ধর্ম।

ইসলামে অংশীবাদ একেবারে বর্জনীয়। অংশীবাদে আছে বহু খোদা কিন্তু ইসলামে আছে এক খোদা অর্থাৎ এক আল্লাহ যিনি সর্ব শিক্তমান, সর্ব প্রজ্ঞাময় এবং সর্বতোভাবে স্বাধীন। তিনি জ্যোতির্ময়, পূর্ণ আধার ও নশ্বরতার অতীত। তাঁর সাথে অন্য কোন উপাস্য এবং কোন শক্তি প্রয়োগকারী নাই। এক আল্লাহ ইসলাম স্বীকার করে। আল্লাহ কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন, "এবং তাঁর সাথে অন্য কোন উপাস্য নাই, যদি থাকতো তবে প্রত্যেক উপাস্য নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে পড়তো এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইতো" (সূরা মোমেনুন, আয়াত-৯১)।

ইসলাম ধর্ম হচ্ছে শিক্ষার ধর্ম। ইসলাম ধর্মের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা। দেশের সামগ্রিক কল্যাণ এবং উন্নতির উদ্দেশ্যে সকল প্রকার অগ্রগতির জন্য জনশক্তির ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ানোর বিশাল দায়িত্ব নির্ভর করে একটি সুন্দর ও নিখুঁত শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। যখন একটি জাতি নিজেদের সুশিক্ষিত করে তুলতে পারে এবং ইসলামের আদর্শে জ্ঞানশিক্ষা অর্জনের জন্য নিজেদের তৈরী করে নিতে পারে তখনই সেই জাতির আত্মিক এবং পরলৌকিক মুক্তি নিশ্চিত সম্ভব। দুনিয়ার এবং আখেরাতের সফলতা আনতে হলে প্রয়োজন ইসলাম শিক্ষা। ইসলামী শিক্ষা

www.amarboi.org

একজন মুসলমানকে ধর্মীয় আদর্শে পরিচ্ছন্ন করে তোলে। তখন এই পরিচ্ছন্ন মানুষটি সব কিছুতে কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম হয় এবং কোন বিষয়ে দৃঢ়তা দেখাতে পিছ পা হয় না। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানের বৃদ্ধি ও প্রসার ঘটে এজন্যে জ্ঞানের মর্যাদা অনেক বড়।

ইসলাম ধর্মের সাথে শিক্ষার একটা সম্পর্ক বিদ্যমান। এজন্য শিক্ষাই হচ্ছে জ্ঞান সৃষ্টি এবং জ্ঞান বৃদ্ধির অবলম্বন। বিদ্যাশিক্ষা একজন মানুষকে বিভিন্ন গুণেজ্ঞানে জ্ঞানী তৈরী করে তোলে। ইসলাম এবং শিক্ষা এ দুয়ের মিলন ঘটিয়ে যে কার্যগতি সেটাই হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা।

শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা রূপায়নের ও ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের হাতিয়ার। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে একটি জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জাতিকে একটি বিশ্ববিপ্লবী এবং বিশ্ববিজয়ী জাতিতে রূপান্তরিত করে ছিলেন এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। তিনি সাফা মারওয়ার পাদদেশে কাবা ঘরের চত্বরে দাঁড়িয়ে উকাজের মেলায় ঘুরে ঘুরে ইকরা অর্থাৎ সেই পড়ার ডাক দিলেন। "তোমরা সবাই জ্ঞান অর্জন কর।" আল্লাহর নবী ভাল করেই জানতেন ইসলামকে শক্তিশালি এবং মজবুত করতে হলে সমাজের মানুষগুলোকে সুশিক্ষিত ও তাদের নৈতিক চরিত্রের সংশোধন এবং উন্নতি বিধান করতে না পারলে ইসলাম দুর্বল হয়ে যাবে।

পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের পরিভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে একটি ছোট্ট শব্দ "ইলম"। এই ইলম পরমাণু শক্তির মত অনেক শক্তিশালী। এই ইলম দ্বারা জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ। হাদিসে উল্লেখ আছে; "তালাবুল ইলমে ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুছলিমিন ওয়া মুছলিমা।" বিদ্যাশিক্ষা প্রত্যেক নরনারীর জন্য ফরজ অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য যা না করলে ইসলামের দৃষ্টিতে কবীরা গুনাহ অর্থাৎ বড় পাপ মানে মহাপাপ। সুতরাং বিদ্যাশিক্ষা না করা মহাপাপ। হাদিসে আরও উল্লেখ আছে "উৎলুবল এলমা ওয়ালাও কানাবে ছীন" অর্থাৎ জ্ঞান শিক্ষার জন্য সুদূর চীন দেশে যেতে হলে যাও। আল্লাহ পাক কোরআনে উল্লেখ করেছেন "আমি প্রত্যেক নরনারীর জন্যে ইলেম শিক্ষা ফরজ করেছি।" পবিত্র কুরআনে নামাজের মত ফরজ ইবাদতের নির্দেশ এসেছে ৮২ বার (ওয়া কিমুস সালাত ওয়াতজ্জাকাত) কিন্তু বিভিন্নভাবে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে আল্লাহর কাছে থেকে আমাদের জন্য

www.amarboi.org

নির্দেশ এসেছে ৯২ বার। মহান আল্লাহ বিদ্যাশিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন ফরজ করে দিয়েছেন। সমগ্র কোরআনের সর্বপ্রথম বিষয়বস্তু হলো জ্ঞান। আল্লাহ বলেছেন, তিনি মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন "ইকরাবিসমি" এই ক্ষুদ্র অংশটুকু দিয়ে যা সমগ্র জ্ঞানের সারাংশ। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবকে প্রসারিত করার জন্যে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন, "পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন" (সূরা আনক্বাবুত, আয়াত- ২০)।

সৃষ্টি রহস্যে আল্লাহই সবচেয়ে সুন্দর শিল্পী। আল্লাহর শিল্প কলাকৌশল জানার ও বুঝার জন্য তিনি মানুষকে দেশ ভ্রমণের উপদেশ দিয়েছেন। পৃথিবীকে সকল জীবের আবাস স্থলে সবুজ বনরাজি, সবুজ ঘাসের গালিচা দ্বারা আল্লাহ তাঁর ধরণীকে শ্যামল শোভায় সাজিয়েছেন। কোথাও ছায়া ঢাকা বিহঙ্গ কাকলী কুঞ্জবন। কোথাও স্রোতসিনী নদ-নদী আবার কোথাও বিশাল সমুদ্র, কোথাও আকাশচুম্বী পর্বতমালা যেখানে যেমনটা সাজে মানানসই ভাবে সেখানেই তিনি নিখুঁতভাবে সাজিয়েছেন এই পৃথিবীকে। আমাদের জন্যে এই ধরণীর গাছে গাছে পাখীর মধুর তান, ফুলবনে নানা রংয়ে চিত্রাঙ্কিত প্রজাপতির নৃত্য। কত সুন্দর আল্লাহর শিল্প সৃষ্টির বিচিত্র উপাদান। আর্ট গ্যালারীতে মানব শিল্পীর ছবি অঙ্কন দেখে আমরা আনন্দে মোহিত হয়ে পড়ি কিন্তু আল্লাহর শিল্প কলাকৌশল কত যে মহাসমারোহ তা বুঝার জ্ঞানশক্তি কজনেরই বা আছে?

মানুষকে বাঁচতে হলে সর্বক্ষণ প্রকৃতির প্রচুর সম্পদের উপর নির্ভর করে বাঁচতে হয়। বাঁচার কাঠামোয় মানুষের প্রয়োজনের এবং আকাজ্ক্ষার চাহিদা সবই আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত। জ্ঞানের উপর নির্ভর করে চিন্তা করলে বুঝা যায় আল্লাহর মহিমা আমাদের বাঁচার জন্যে কত শ্রেষ্ঠ দান। বাস্তবে এগুলো সবই আমাদের শিক্ষা লাভের বিষয় বস্তু।

বেঁচে থাকার জন্যে নানান প্রয়োজনে আল্লাহ পাক অসংখ্য নিয়ামত দান করে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মানব জাতি যেন ইসলামের বিধান মতে জীবন যাপন করে। মানব সৃষ্টির পিছনে আল্লাহ অসংখ্য নিয়ামত সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর বান্দার জন্যে কোটি কোটি নিয়ামত দান করেছেন। আল্লাহর সকল নিয়ামত ভোগে ইবাদতের সংজ্ঞা কিংবা ব্যাখ্যা অনেক ব্যাপক। সুতরাং সুন্দর পৃথিবী এর

www.amarboi.org

মধ্যে সব কিছু দিয়ে আল্লাহ এই ধরণীকে অতি সুন্দর এবং মনোরম করে সাজিয়ে আমাদের চাহিদার রূপতৃষ্ণা মিটানোর জন্যে মুগ্ধপরিপাটি, নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য, বিভিন্ন সুমিষ্ট ফল, ধনদৌলত, মনের মত সুদৃশ্য পোষাক, আরাম-আয়েশ, আবার স্নেহের পিতামাতা, আদরের ভাইবোন, মমতার স্ত্রী পুত্র কন্যা, এমন কি নিজ দেহের হাত-পা, চোখ, কান সবই আল্লাহর নিয়ামত দান। মানব দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ আল্লাহর অমূল্য দান। সৃষ্টিকর্তা যে যে অঙ্গ যে সব কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাকে ঠিক সেই কাজে ব্যবহার করা মানুষের কর্তব্য।

ইহলোকে সকল ধর্মকর্ম সম্পাদন করার জন্য মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলি আল্লাহর পছন্দনীয় কাজে ব্যবহার করলে সেই মহান আল্লাহর শোকর আদায় করা হয়। আল্লাহ প্রদত্ত সকল অফুরন্ত অবদান এবং নিয়ামত তাঁর বিধান অনুযায়ী ব্যবহার ও ভোগ করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। পবিত্র কোরআনের তফসীরে উল্লেখ আছে; শুধু মানবদেহে আল্লাহপাক পাঁচ হাজার প্রকার উপাদান নিয়ামত হিসেবে দান করেছেন। এগুলো সবই সুন্দর ও মজবুত ভাবে মানব দেহে সমন্বয় করা হয়েছে। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন, "এরপর অবশ্যই তোমাদের আল্লাহর অবদানের ভোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে" (সূরা তাকাসুর, আয়াত-৮)। আল্লাহ আরও বলেন ঃ "তোমরা যদি আমার নিয়ামত গণনা করতে চাও তবে তা গুণে শেষ করতে পারবেনা। (সূরা নাহাল, আয়াত-১৮)। অন্য আর এক তফসীরে উল্লেখ আছে; আদম (আঃ) থেকে শুরু করে পৃথিবীর শেষ মানুষটি পর্যন্ত একত্রিত হয়ে আল্লাহর নিয়ামত গণনার কাজে যদি নিয়োজিত হয় তবুও আল্লাহর নিয়ামত গণনা করে শেষ করতে পারবে না।

আল্লাহ পাকের আর একটি বড় নিয়ামত মানুষের বিবেক এবং জ্ঞান যা আল্লাহ তাঁর বান্দা ব্যতীত অন্য কোন জীবে দান করেননি। আল্লাহর নিয়ামত ভোগ ব্যবহারে ইসলামের যাবতীয় বিধি বিধান দ্বারা ধর্ম পালন সবই আল্লাহ বন্দেগীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত কেবল মানুষের জন্য। আল্লাহ পৃথিবীর সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করে তাদের অধীন করে দিয়েছেন। এজন্যে আল্লাহ মানুষকে জয়ের জন্য দিয়েছেন জ্ঞানশক্তি। এই জ্ঞানশক্তি নিয়েই মানুষ বিশ্বব্যাপী আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করছে।

www.amarboi.org

পৃথিবীর আলোবাতাস, পাহাড়পর্বত, বনজঙ্গল, নদনদী, সাগর মহাসাগর, মাটি ও পানি, ঊর্ধ্বে গ্রহ উপগ্রহ, সকল নক্ষত্ররাজি, চন্দ্র সূর্য সবই আল্লাহর নিয়ামত হিসেবে সৃজিত হয়েছে। আল্লাহ মানুষকে যত প্রকার নিয়ামত দান করেছেন এর এক একটির মূল্য কোটি কোটি টাকা অথবা ধনসম্পদ দিয়ে বিনিময় করা কখনই সম্ভব নয়। চিন্তা করলে বুঝা যায় বাতাস নামে অদৃশ্য নিয়ামতটি যদি পৃথিবীতে কেবল মাত্র দশ মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীর সকল প্রাণীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটবে।

উপরের দিকে তাকালে দেখি সীমাহীন প্রশস্ত নীল আকাশ। কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র রাতে শোভা দিচ্ছে এই নীল আকাশে। মাথার ওপর নীল আকাশে রাতের পূর্ণিমার চাঁদ পৃথিবীকে করে তোলে অপরূপ সৌন্দর্য। দিনের বেলায় সূর্য পৃথিবীকে কত উজ্জ্বল আলোক শোভায় আলোকিত করে রেখেছে। আল্লাহ পাক সূর্যকে পৃথিবীর প্রদীপ রূপে সৃষ্টি করেছেন। চন্দ্র, সূর্য, আকাশ-বাতাস, মাটি পানি সবই আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য। আল্লাহ পাক কোরআন মজিদে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন "তুমি কি দেখ না আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন অতঃপর ভূমিতে স্রোতরূপে প্রবাহিত করেন এবং তা দিয়ে বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন। অতঃপর এ শুকিয়ে যায় এবং তোমরা এ পীতবর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তিনি তা খড়কুটায় পরিণত করেন। এতে অবশ্য বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য উপদেশ রয়েছে।" (সূরা যুমার আয়াত ২১)।

আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য বুঝার জন্য তিনি এই পৃথিবীকে পূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডারে বিকশিত করেছেন। পবিত্র আল্লাহর নিদর্শন অনুধাবন করার জন্য কোরআনে তিনি বলেছেন, "আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে তোমাদের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য বায়ু প্রেরণ করেন এবং যাতে তাঁর বিধানে জলযানগুলি বিচরণ করে। তোমরা যাতে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও সেজন্য তিনি বায়ু প্রেরণ করেন। 'আল্লাহ বায়ু প্রেরণ করেন ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। তুমি দেখতে পাও তা থেকে বারিধারা নির্গত হয়।" (সূরা রুম, আয়াত- ৪৬-৪৮)।

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদ্যাশিক্ষার জন্য সর্ব প্রথম সাফা পর্বতের পাদদেশে যায়েদ বিন আকরাম (রাঃ) এর বাড়ীতে

www.amarboi.org

আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের জন্য একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তখন যে সকল ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতো তাদের প্রত্যেকেই এই মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হোত। নবীজী মদিনায় হিজরত করার পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় যায়েদ বিন আকরাম (রাঃ) এর বাসস্থানটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, যায়েদ প্রমুখ সাহাবাগণ এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্র হিসাবে শিক্ষাগ্রহণ করতেন।

শিক্ষার আদেশ আমাদের ওপর ফরজ নাজিল হওয়ার পরবর্তী সময়ে নবীজী মিরাজ থেকে আমাদের জন্য নামাজ এনে উপহার দিলে এই নামাজ আমাদের জন্য ফরজ আদেশ হিসেবে জারী হলো। কিন্তু দেখা গেল এর কিছুকাল পরে বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবী বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন বাদ দিয়ে নামাজের দিকে বেশী করে ঝুঁকে পড়েন। তখন সাহাবীদের এই অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "নাওমুল আলেমা খায়রুম মিন এবাদতি জাহেল।" অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তির ঘুম মূর্খ লোকের নামাজের চেয়ে উত্তম।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আসার পরপরই মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে। নবীজী মদিনায় আসার পর সর্ব প্রথম মসজিদে নববী নির্মাণ করেন। এরপর তিনি মসজিদের একটা অংশ বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। পরবর্তীতে এটাই সুফ্‌ফা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এটাই ছিল ইসলামের প্রথম জামেয়া অর্থাৎ প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। নতুন রাষ্ট্র গঠন করার পর রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুত করার কাজে নবীজী সদা ব্যস্ত থাকার পরও তিনি একটা উল্লেখযোগ্য সময় শিক্ষকতায় ব্যয় করতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দানের জন্য যায়েদ ইবনে সাবেত, উবাই ইবনে কায়াব প্রমুখ এবং আরও অনেককে শিক্ষকতার জন্য নিয়োগ করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পাঠ্যক্রম ছিল তৌহিদ, আখিরাত, ইবদাতের নিয়মকানুন, যাকাতের বিধান, ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি ও স্বাক্ষর আইন, যুদ্ধবিদ্যা, বিচার বিভাগীয় আইন, বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, প্রশাসন, আর্ন্তজাতিক আইন, সমাজ কল্যাণ, অর্থনীতি ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিদ্যা।

www.amarboi.org

এসব বিষয় ছাড়াও ব্যক্তিগত ও সমাজিক শিষ্টাচার, পোষাক পরিচ্ছদ, হারাম হালালের সীমারেখা, মেহমানদারী, রুগীর পরিচর্যা, আচার আচরণ, মানবিক ব্যবাহর ইত্যাদি। এখানে বিদেশী ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করাও ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা ভুক্ত। যায়েদ ইবনে সাবেদ (রাঃ) ফার্সী, হিবরু, রোমান এবং আরবী ভাষায় ছিলেন সুপণ্ডিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সচিব হিসাবে কাজ করতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং শিক্ষা দানের জন্য কেহ কোনরূপ পারিশ্রমিক নিতেন না। ইহা ছিল একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। সকল ছাত্রদের জন্য রাষ্ট্রিয়ভাবে ছিল থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ ইবনে সাবেদ (রাঃ) এর মারফত আরব পণ্ডিতদের হিবরু ভাষা শিক্ষার আদেশ দেন।

অন্যদিকে হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন একজন মহাপণ্ডিত। সংখ্যা বিজ্ঞান, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র এবং সাহিত্যে শিক্ষা দানের জন্য তিনি মদিনার মসজিদে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি এই মহাবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন মহাযোদ্ধা এবং সুসাহিত্যিক ও লেখক। জ্ঞান শিক্ষা ও মুসলিম সভ্যতার বীজ মদিনার মসজিদ থেকে প্রথম সূচনার বিকাশ ঘটে। পরবর্তী সময়ে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এর চার পাশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

মহানবীর জীবদ্দশায় মদিনায় নয়টি মসজিদ নির্মিত হয়। এই মসজিদগুলো সব সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত হোত। হিজরতের দেড়বছর পর বদর যুদ্ধে পরাজিত প্রায় ষাট সত্তর জন শিক্ষিত, মেধাবী ও প্রজ্ঞাশীল অমুসলমানদের বন্দিকরে মদিনায় আনা হলে নবীজী সিদ্ধান্ত দিলেন এই সকল শিক্ষিত অমুসলমান বন্দিগণ মাথা পিছু দশটি করে মুসলিমযুবক নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমে পূর্ণ জ্ঞানদানে শিক্ষিত করলে বিনিময় মুক্তিপনে তাদের মুক্তি দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম শেষ হবার পর ঐ সকল যুদ্ধবন্দিরা মুক্তিলাভ করতো। সুফ্‌ফায় নব্য শিক্ষা প্রাপ্ত যুবকদের নবীজী পুনরায় আরব দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং দেশে দেশে ধর্ম শিক্ষক ও প্রচারক হিসাবে পাঠাতেন। ঐ সকল অঞ্চলের মুসলমানগণ তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে শিক্ষাদান গ্রহণ করতেন। এ সময় ইসলামের আলো সাহারা থেকে সুদানে নিগ্রোদের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

www.amarboi.org

আরব দেশটি ভৌগলিক দিক দিয়ে এমন এক স্থানে অবস্থিত যেখান থেকে বিশ্বের প্রত্যেক কোণে কোণে জ্ঞান শিক্ষা প্রচার সহজ ছিল। বাগদাদ, বোখোরা, দামেশক, কায়রো প্রভৃতি অঞ্চলের হাজার হাজার অমুসলমানেরাও মুসলমানদের কাছে শিক্ষা লাভ করেছে। নবীজীর ইন্তেকালের পর আরব দেশের দার্শনিকগণ স্পেন এবং ইতালীতে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ফলে বিশ্বের আরও অনেক দেশ থেকে জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীরা সমবেত হয়ে আরবীয় দর্শনে জ্ঞান অর্জন করত। অতীতে মুসলিম স্পেনে কলা, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানে যে উন্নতি লাভ করেছিল তা ইউরোপের আর কোথাও এমনটি হয়নি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে কোন মুসলমান অশিক্ষিত থাকতে পারেনি। কারণ ইসলামে শিক্ষাই হচ্ছে সকল কাজের পূর্বশর্ত। নবীজী জানতেন নারীদের জন্যও শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য। মুসলিম সমাজে পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী বিপ্লব সাধন করতে হলে নারী জাতিকেও সুশিক্ষিত হতে হবে। এজন্য নারী পুরুষ উভয়কে সমান ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। তাই তিনি নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদের যে ভাবে শিক্ষার জন্য তালিম দিতেন ঠিক একই ভাবে নারীদেরও তালিম দিতেন। ইসলাম ধর্ম মতে স্ত্রীলোকদিগের লেখাপড়ায় শিক্ষা দেওয়া ফরজ। নবীজী নিজ গৃহে শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করে নারীদের জ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত করতেন। এছাড়া তিনি অন্য নারীদেরও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেছিলেন সুন্দর পরিপাটিরূপে। নবীজী বলতেন জ্ঞানের মহিমা শ্রেষ্ঠতম মহিমা। নিজ নিজ অঞ্চল ভিত্তিক এলাকায় মাতৃ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ অর্থাৎ লেখাপড়া করা ফরজ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের শিক্ষার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় করে দিয়েছিলেন। তিনি মহিলাদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষা দিতেন। ঈদের মাঠে পুরুষদের উদ্দেশ্যে ভাষণ শেষে নবীজী নারীদের সমাবেশে চলে যেতেন এবং সেখানে তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতেন।

নবীজী ধর্মীয় শিক্ষার কাজে মুসলমান জাতির জন্য অপরিসীম অবদান রেখে গেছেন। ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব তিনি জনসম্মুখে সুন্দরভাবে প্রচার

www.amarboi.org

করতেন। তিনি বুঝে ছিলেন মুসলমান জাতি যত রকম অন্ধকারে নিমজ্জিত হোক না কেন, উদ্ধারের একমাত্র নির্ভরযোগ্য পথ কোরআন হাদিসের আলোকে ধর্মশিক্ষা। এ কারণে তিনি নারী পুরুষ উভয়কে ইসলামের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির উদ্দেশ্যে শিক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন।

পরিতাপের ভাবনা নিয়ে যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে ইদানিং কালে তৃতীয় বিশ্বমুসলিম জাতির একটা অংশবিশেষ ধর্মশিক্ষা এবং শিক্ষার অনুশীলন থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে তারা আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামকে হারাতে বসেছে। ফলে হচ্ছে কী? দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের এই বৃহৎ সমাজ পরিসরে ধর্মীয় সংস্কার পরিক্রমায় ইসলামের ভূমিকা পালনে আসছে ব্যর্থতা। ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতিকে খর্ব করে মুসলিম জাতি তাদের ধর্মের মাহাত্ম হারিয়ে নিজেদের অধঃপতন নিজেরাই ডেকে আনছে। তারা ধর্ম পালনের পরিবর্তে কুপ্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে জীবন কাটায়। বড়ই পরিতাপের বিষয় তারা ইসলামের দর্শন এবং ধর্মচর্চা বিসর্জন দিয়ে ইসলামে সৃষ্টি করছে ধর্মপ্রতিকূলতা। এই শ্রেণীর মুসলমানেরা ভালোমন্দ বুঝার চিন্তা করতে পারে না বলে তারা নিজেদের অধঃপতন নিজেরাই ডেকে আনছে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে। জীবদ্দশায় তারা আখেরাতের কথা ভুলে অবিরাম গতিতে মিশে যাচ্ছে পার্থিব জীবন ভোগে। অনেক সময় তারা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সীমা ছাড়িয়ে এমন সব কথা বলে যা ধর্মের ক্ষেত্রে আপত্তিকর। শুধু তাই নয় ক্ষতিকরও বটে। নিঃসন্দেহে ধর্মের আহাকামগুলো তাদের কাছে নিরাপদ নয়। শরীয়তের বিধানকে পাশ কাটিয়ে তাদের গোটা জীবনটা এভাবেই কাটে।

সমাজে দারিদ্র্য এবং নিরক্ষতা থাকলে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং ধর্ম শীতলতায় দেখা দেয় ব্যর্থতা। এরূপ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য ইসলাম ধর্ম, মুসলিম দর্শন এবং জ্ঞান বিজ্ঞান সবেমিলে মুসলমান জাতির মধ্যে থাকতে হবে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং মনোযোগ। মনোযোগ যেমন একাগ্রতার জিনিষ, আগ্রাহও তেমনি সাফল্যের মাপকাঠি। একারণে জাতির প্রয়োজন সত্যিকার শ্রম সাধনা। তবেই ইসলাম ধর্ম মুসলমান সমাজে শক্তি লাভ করবে। মুসলমান জাতির ধর্ম সমৃদ্ধি নির্ভর করে ইসলামের ধর্মশীল দর্শন শক্তি এবং জ্ঞান চর্চার উপর। জ্ঞান বিজ্ঞান এবং দর্শনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যথারীতি মনোনিবেশ থাকলে ইসলামের শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে।

www.amarboi.org

সামাজ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যে সব ত্রুটিগুলো পরিলক্ষিত হয় সেগুলো ধর্মচালিত জ্ঞানশক্তি দ্বারা নিরসন করার জন্য নবীজীর নির্দেশ আছে। ধর্মীয় উদ্দীপনা নিয়ে ঐ সকল করণীয় কাজগুলোকে ত্রুটিমুক্ত করে সাফল্য অর্জন করতে পারলে সেখানে ধর্মীয় জীবন আলোয় আলোকিত হয়ে উঠে। মুসলমান জীবন ব্যবস্থায় ন্যায়ের ভিত দৃঢ়তার সাথে মজবুত করতে হবে যতক্ষণ না ইসলামের সত্যস্বরূপ সাধিত হয়।

ধর্মশিক্ষার প্রকৃত জ্ঞান নিয়ে ইসলামকে হৃদয়ঙ্গম করতে না পারার কারণে নবীজীর ইসলাম এবং আজকের ইসলামের মধ্যে তফাতের ব্যবধানে বেদনার তরঙ্গ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ইসলামের মধ্যে "কিন্তু" শব্দটা রোগ জীবাণুকারে প্রবেশ ঘটিয়ে ইসলামের কর্মকান্ডে সংকটের আক্রমন শুরু হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ইসলামে "কিন্তু" শিক্ষা নাই, সবটুকুই কোরআন হাদিসের পুণ্যজ্ঞান শিক্ষা। আধুনিক বিশ্বে মুসলমান জাতি ক্রমেই ধর্মে পতনোন্মুখ হয়ে পড়ছে। ধর্ম-বিমুখ জাতি ইসলামে ভাইরাস ব্যাধি পীড়িতের ন্যায় জীবন সংকট স্বরূপ। এই "কিন্তু" ধর্মভাইরাস থেকে আশু রোগ মুক্তির জন্য ধর্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ইসলামের কর্মপন্থায় মানসিক শক্তি বৃদ্ধিকরে সমস্যার সমাধান প্রয়োজন এবং সমাধানে সফলতা অর্জিত হলে ইসলামের ধর্মদেহে ফিরে আসবে প্রেমশীতলতা এবং পুণ্যময় জীবন।

মানব দেহের শক্তিকে টিকিয়ে রাখতে হলে দেহে পুষ্টির প্রয়োজন। সুষম খাদ্য শরীর গঠনে যেমন সহায়ক তেমনি শক্তি বৃদ্ধিতেও কার্যকর। স্বাস্থ্যবীদগণ শিশুদের শৈশব অবস্থায় ভিটামিন যুক্ত খাদ্য গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ধর্মস্বাস্থ্যটার দিকে চোখ ফেরালে দেখা যাবে ইসলামের ধর্মস্বাস্থ্যে ক্রমেই ধর্মদুর্বলতা সৃষ্টি হচ্ছে। রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ইসলাম ধর্মবিদ্যায় একজন প্রখ্যাত ধর্মজ্ঞানবীদ চিকিৎসক। ইসলাম ধর্মের পুষ্টি সাধনের জন্য নবীজী ধর্মবীদ চিকিৎসক হিসাবে মুসলমান জাতিকে দিয়ে গেছেন অত্যাবশ্যকীয় ধর্মপুষ্ট ব্যবস্থাপত্র। এই ব্যবস্থাপত্রে মাত্র দুটি দাওয়াই ব্যবহারের নির্দেশ আছে। একটি আল কোরআন অপরটি আল হাদিস। রোগব্যাধি চিকিৎসার জন্য প্রথমে যা দরকার তা হচ্ছে একজন ভালো চিকিৎসক। তিনি রোগ সমস্যা নির্ণয় করে একটি সঠিক ব্যবস্থাপত্র রুগীর হাতে তুলে দেন। তখন ঐ ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী রুগী ওষুধ সেবন করে থাকে। ঐ একই নিয়মে মুসলমান জাতি

www.amarboi.org

ধর্মদুর্বলতা এবং ধর্মান্ধতা ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে প্রয়োজন একজন ধর্ম চিকিৎসক।

আল্লাহ নবীজীকে এই বিশ্বের মাটিতে পাঠিয়েছিলেন চির কল্যাণের ত্রাণকর্তা রূপে, বিশ্বনবী এবং বিশ্বমহানায়ক করে। মুসলমান জাতির জীবনের প্রতিস্তরে ধর্মব্যাধির যেসব সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তার সমাধানের একমাত্র উপায় আল কোরআন এবং অপরটি আল হাদিস। মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করতে হলে এই বিধান পালনের জন্য অন্য কোন বিকল্প পথ নাই। আল কোরআন ও আল হাদিস ধর্মস্বাস্থ্যের একমাত্র সেব্য ওষুধ। কোরআন এবং হাদিস হচ্ছে ইসলামে সুখ শান্তির দিশারী। আল-কোরআনের ভাষায় বিশৃঙ্খলা হত্যার চেয়েও জঘন্য। একজন ঈমানদার মুসলমানের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর "সবার উপর কোরআন সত্য তাহার উপর নাই।" স্থান-কাল পাত্রভেদে আল কোরআন ইসলাম শিক্ষার ক্ষেত্রে সব সময় সব দেশের মানুষের জন্য যেভাবে ব্যাপক এবং সুস্পষ্ট ধারণা দান করেছে তা গোটা সৃষ্টি জগতের জন্য বহু মূল্যবান উপদেশ। মানবদেহ এবং আত্মা, বিবেক এবং সত্যজ্ঞান এগুলির একত্রিত সমন্বয় সাধনই হচ্ছে জীবনসত্ত্বা তেমনি ইহকাল এবং পরকালের কল্যাণ সাধনার পক্ষে আল-কোরআন হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির জন্য একাশ্রয়ে সেতুবন্ধন।

বর্তমান সময়ে ধর্মশিক্ষাহীনতার কারণে মুসলমান জাতির একটা অংশ যখন ইসলামকে তাদের বাপদাদার ধর্মপুঁজি মনে করে অসত্যের পথে ধান্ধাবাজি করে জীবন কাটায় তখন তার মধ্যে মানবিক গুণাবলি বলতে কিছুই থাকেনা। তখন তারা তাদের ধর্মজ্ঞানহীন জীবনে কোন সুফল বয়ে আনতে পারে না। ধর্মের বাইরে জীবন যাপন অর্থ পশুজীবন। তখন তারা ইসলামের নিষিদ্ধ কাজগুলোকে অবলিলা ক্রমে গ্রহণ করে পাপ কর্মের জয়জয়কার নিয়ে বেঁচে থাকে। তারা সব সময় কুফন্দি এঁটে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থের জন্য মেতে থাকে সারাক্ষণ।

ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। এ কারণে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করলে তা কখনও আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। আল্লাহ ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নবী পাঠিয়েছেন এই ধরণীর মাঝে। আল-কোরআনে আল্লাহ বলেন, "হে নবী আমি তোমাকে পাঠিয়েছি স্বাক্ষী রূপে এবং সুসংবাদ দাতা রূপে ও সতর্ককারী রূপে। আল্লাহর অনুমতি ক্রমে

www.amarboi.org

তাঁর দিকে আহবানকারী রূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে (সূরাঃ আহযাব, আয়াত ৪৫-৪৬)।

আল্লাহ্ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই নিখিল বিশ্বে পাঠিয়েছেন মানুষ রূপে মহামানব করে। কোরআন মজিদে আল্লাহ্ ঘোষণা দেন, "আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছি যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদর কাছে পাঠ করে তোমাদের পবিত্র করে এবং জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়" (সূরা বাকারা, আয়াত ১৫১)।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বিশ্বমানব তথা বিশ্বনবী। তিনি ধর্ম প্রবর্তক হিসেবে ছিলেন অতিমানব। তিনি এই পৃথিবীতে ছিলেন নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক মানুষ। দয়ামায়া, স্নেহমমতা এবং করুণায় তাঁর হৃদয় ছিল পূর্ণ। তিনি কেবল বিশ্বনবীই ছিলেন না, ছিলেন বিশ্বনেতা, সকল নেতার শ্রেষ্ঠনেতা। হযরত মুহম্মদকে এক অলৌকিক চরিত্রের নেতা হিসেবে বর্ণনা দিয়ে জনৈক মুসলমান পন্ডিত বলেন ঃ

Muhammmed (be peace upon him) was the elevated leader in every occurrence essential for every land for all people and for all period. In his teaching absolutely for the world was divine knowledge. He was philosopher, reformer, preacher etc. Muhammed was the leader of all nation of the world to swim clear of the horrible sea of ignorence, corruption, immorality, idolatry and disorder that which surrounded him on all side, continuously. Muhammed as a guardian and prophetic leader was so clear minded and possessed such a pure soul and at the same time he also possessed extraordinary power to reform and complete divine programme. He hoisted the flag of victory after glorious achievement of such mission commissioned upon him by the Almighty Allah the one Lord of the universe. His movement to the ultimate success as a world leader was, therefore, an eloquent proof of the supreme truth of his cause of firmness.

www.amarboi.org

মুসলমান জাতি যখন ধর্ম বহির্ভূত হয়ে নিজ খেয়াল খুশির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তখন তাদের পাপ কামের নৈরাজ্যজনক অবস্থা থেকে জাতিকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ্ পাক পৃথিবীতে নবী পাঠান। নবীরা আসেন ধর্মপীড়িত মানুষের ধর্ম চিকিৎসার জন্য। তাঁরা ঐশীর সাবধান বাণী নিয়ে আসেন বিপথগামী মানুষের চরিত্র সংশোধন এবং তাদের সত্যের পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে। ঠিক এমনই এক সময়ে হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দয়ামায়া, করুণা এবং স্নেহ মমতা নিয়ে আরব ভূমিতে এসেছিলেন সত্যের এবং দ্বীনের আহবানে বিপথগামী মানুষের মাঝে।

আল্লাহ্ আসমান জমিনের সকল সৃষ্টির মালিক। তাঁকে আমরা চোখে দেখিনা। আল্লাহর ইবাদতের মধ্য দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। আল্লাহর কোরআন এবং রসূলের হাদিস আনুগত্যের সাথে আমল ও পালনের মাধ্যমে করুণাময় আল্লাহকে জানার ও চেনার একমাত্র উপায়। আল্লাহর কোরআন সকল মানুষের জন্য করুণা স্বরূপ। কোরআন এবং হাদিসের শিক্ষাকে বলা হয় ইসলামী শিক্ষা। নবীজী মানুষের শিক্ষাদানকে অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম বলে বর্ণনা করেছেন। কোরআন এবং হাদিসের বাইরে জীবন ধারণ হয় পাপাচারময় যার অপর নাম জাহালিয়াত জীবন। নবীজী জানতেন ইসলামশিক্ষা লোপ পেলে সেখানে দেখাদেয় স্বার্থপরতা, পাপাচার এবং রক্তারক্তি।

আল্লাহ্ সকল সময় তাঁর বান্দার অতি নিকটে অবস্থান করেন। আল্লাহ বলেন- "আমাকে যে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিই। আমাকে যে স্মরণ করে আমিও তাকে স্মরণ করি" (আল-কোরআন)। সংরক্ষিত কোরআন গ্রন্থে আল্লাহর ধারণাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পৃথিবীর ক্ষণিক জীবনে কোরআন ও হাদিস গোটা মানব জাতির জন্য ছায়াশান্তির একমাত্র আশ্রয় স্থল।

হযরতের জীবনের শেষ হজ্জকে বিদায়ী হজ্জ বলা হয়। নবীজী আরাফাত ময়দানে ৬৩২ খৃষ্টাব্দ ৭ই মার্চ তারিখে হজ্জব্রতী সকল মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে মীনা উপত্যকায় উপস্থিত হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ (খুতবা) দান করে ছিলেন। তাঁর এই ভাষণের সামান্য একটি অংশ এখানে উল্লেখ করা হল। "হে আমার উম্মতগণ, আমি যাহা রাখিয়া যাইতেছি তাহা যদি তোমরা দৃঢ় ভাবে ধারণ করিয়া থাক তবে

www.amarboi.org

কিছুতেই তোমাদের পতন হইবে না। সেই গচ্ছিত সম্পদ আল্লাহর কোরআন এবং তাঁহার রসূলের আদেশ (হাদিস)।"

ইসলামের জীবন বিধানে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নবীজী গভীরভাবে উপলব্ধি করে ছিলেন বলেই তিনি মুসলমান জাতিকে সুনির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলেছিলেন। শিক্ষা মানুষের জীবনীশক্তির সকল কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। শিক্ষার কোন বিকল্প নেই একথা তিনি পরিষ্কার জানতেন। দ্বীন ইসলামকে ধরে রাখতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য নবীজী যে সকল আদেশ ও নির্দেশ দিয়েছেন তারই কয়েকটা হাদিস নিম্নে উল্লেখ করা হল।

* বিদ্যা শিক্ষা প্রত্যেক নরনারীর উপর ফরজ।
* জ্ঞান সাধকের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র।
* একমাত্র অধ্যায়নের মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জন সম্ভব।
* জ্ঞান শিক্ষার জন্য সুদূর চীন দেশে যেতে হলেও যাও।
* যার জ্ঞান নাই তার ঈমান নাই।
* জ্ঞানী ব্যক্তির ঘুম মূর্খের নামাজের চেয়েও উত্তম।
* দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানঅন্বেষণ কর।
* অধিক উপাসনা অপেক্ষা জ্ঞান অর্জন উত্তম।
* জ্ঞানের প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহর নির্দেশ আছে।
* জ্ঞান ন্যায় ও অন্যায়কে পৃথক করে।
* যে জ্ঞানী ব্যক্তিকে সম্মান করে সে আল্লাহকে সম্মান করে।
* রাতে একঘন্টা শিক্ষাদান সারারাতের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।
* যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে দেশ ভ্রমণে বার হন আল্লাহ্ তাঁর জন্য বেহেশতের পথ সুগম করে দেন।
* জ্ঞান অন্বেষণকারীকে বেহেশতের ফেরেশতাগণ অভ্যর্থনা জানায়।
* জ্ঞানী ব্যক্তির কথাশুনা এবং সেই জ্ঞানকে মনের মধ্যে ধরে রাখা ধর্মীয় কাজ এবং একশ ক্রীতদাস মুক্ত করার চেয়েও উত্তম।
* যে জ্ঞান অর্জন করে সে আল্লাহকে ভালবাসে।
* জ্ঞান বেহেশতের পথকে আলোকিত করে।
* যে জ্ঞান অর্জনের কথা বলে সে আল্লাহর প্রশংসা করে।
* জ্ঞান অন্বেষণকারীর সম্মুখে ফেরেশতাগণ মস্তক অবনত করে।

www.amarboi.org

* যে জ্ঞান দান করে সে দরিদ্রকে অর্থ দানের সওয়াব অর্জন করে।
* জীবনে কয়েকটা ভালকাজ করার চেয়েও একজন জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে বাস করা অধিক উত্তম।
* যে ব্যক্তি বিদ্যা অর্জন করেছে পিছনে তার জীবনের গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়।
* আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করেন যিনি তাঁর দাসদাসীদের বিদ্যা শিক্ষা দেন।
* জ্ঞানের উদ্দেশ্যে এক পা অগ্রসর হলে দ্বিতীয় পা ফেলার পূর্বেই তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়।
* যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য বাহির হয় আল্লাহ তার উপর আর্শিবাদ বর্ষণ করেন।
* যে ব্যক্তি বিদ্যা অন্বেষণে পথ চলে আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশতের পথে লইয়া যান। ফেরেশতাগণ আনন্দে তাহাদের পাখা তাহার জন্য বিছাইয়া দেয়। আকাশ ও পৃথিবীবাসীগণ এমন কি পানির মৎস্যসমূহ বিদ্যান ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।

সুতরাং জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করতে আদেশ হয়েছে। ইহজগতে ধনদৌলত বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতে বলা হয়নি। কারণ জ্ঞান মানুষের জন্য অফুরন্ত সম্পদ ও সকল উন্নতির মূল এই জ্ঞান। জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পায় মানুষ ততোই উন্নত হয়। বিশ্বের বুকে জ্ঞানের যেমন নিগূঢ় প্রভাব রয়েছে তেমনি সভ্যতা বিকাশেও জ্ঞানের অবদান আছে। জ্ঞানের দ্বারা মানুষ সকল প্রতিকূল শক্তিকে পরাজিত করে দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। জ্ঞানের প্রভাবে মানব জীবন হয় সুখের এবং এই জ্ঞানের প্রভাবেই মানব জীবনের সমস্যার সমাধান হয় সহজ। যে জাতির মধ্যে জ্ঞান চর্চার অভাব ঘটেছে সেই জাতি বিশ্বের বুকে দরিদ্র জাতি হিসাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। এজন্য ইসলামে জ্ঞান চর্চার বারবার তাগিদ এসেছে জীবনকে অনিবার্য দুঃখ কষ্ট থেকে রক্ষার জন্য।

যাঁরা কোরআন ও হাদিসকে জীবনের মূল্যবান সম্পদ মনে করে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং এরই ধারাবাহিকতার আদর্শে জীবন যাপন করেন তাঁরা কখনও কারো প্রতি ঈর্ষা করেন না, আত্মশ্লাঘা করেন না, গর্ব করেন না, অশিষ্টাচার করেন না, স্বার্থ চেষ্টা করেন না, ক্রোধ ধারন করেন না এবং

www.amarboi.org

কখনও বিপদে অধৈর্য্যও হন না। তাঁদের মাঝে থাকে মহান আল্লাহর মহিমা ও পূর্ণ বিকাশে অফুরন্ত বিশ্বাস। আমাদের নবী ছিলেন সবার উর্ধ্বে, মানবকুল কর্মে তিনি ছিলেন জ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত। আল্লাহ্‌পাক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষার জন্য আল কোরআনে পাঁচবার আহ্বান করে বলেছেনঃ-

"পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।"
সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্ত পিন্ড হতে।
পাঠক, আর তোমার প্রতিপালক অতি দানশীল।
যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।
শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।"
(সূরা আলাক আয়াত ১-৫)।

নবীজী ছিলেন একজন উম্মি অর্থাৎ নিরক্ষর ব্যক্তি। তিনি আদৌ লেখাপড়া জানতেন না। তৎকালিন যুগে আরব দেশে লেখাপড়ার কোন ব্যবস্থা এবং শিক্ষার প্রচলন একেবারেই ছিল না। প্রত্যেকটি মানুষ ছিল নিরক্ষর। আল্লাহ্ এই নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উম্মি অর্থাৎ নিরক্ষর করেই পাঠিয়ে ছিলেন। একমাত্র আল্লাহই নবীজীকে অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে শিক্ষা ও সংস্কারের কাজ করার দায়িত্ব দিয়ে আরব ভূমিতে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানে সুপন্ডিত এবং ধর্ম বিজ্ঞানে ছিলেন সুদার্শনিক। তিনি সকল সময়, সকল দেশের, সকল মানুষের জন্য ছিলেন একজন সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রচারক এবং সমাজ সংস্কারক। তাঁর ধর্মপ্রচারে ছিল মানব সভ্যতার সুন্দর শিষ্টাচার। প্রচারে ছিল না কোন ভুলত্রুটি কিংবা কোন অসংগতি। ছিল শান্তিশৃঙ্খলায় নিরাপত্তা, ছিল নতুন ধর্ম বিকাশে বলিষ্ঠ চিন্তা। তাঁর সকল কর্মে ছিল বলিষ্ঠ সমাজ চেতনাবোধ এবং ইসলামী সভ্যতার আলোকে ছিল তাৎপর্যপূর্ণ গভীর জ্ঞান। তিনি উম্মি পদবি পেয়েও সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে পথ নির্দেশ করেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেছেন "তিনি নিরক্ষরদের একজনকে পাঠিয়েছেন রসূল রূপে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াত, তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা, ইতিপূর্বে তো এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে" (সূরা যুমার, আয়াত-২)।

www.amarboi.org

জ্ঞান গবেষণা আল্লাহর প্রশংসা স্বরূপ। জ্ঞান সন্ধান আল্লাহরই ইবাদত। জ্ঞানদানের শিক্ষক শিক্ষা দানের সওয়াব অর্জনের হকদার এবং এটা আল্লাহর বন্দেগী। জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই পাপপুণ্য নির্ণয়ের প্রকৃত বিচারক, তাই জ্ঞানই বেহেশতে প্রবেশের সঠিক পথ। একজন জ্ঞানী মুমিনকে ফেরেশতাদের উর্দ্ধে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। জ্ঞান আমাদের প্রকৃত বন্ধু, আমাদের রক্ষক, আমাদের জীবনের আবরণ এবং জ্ঞানই আমাদের জীবনের আলো। নবীজী আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জন অবশ্য কর্তব্য অর্থাৎ ফরজ হিসাবে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

কেবল জ্ঞানের জন্যই মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। জ্ঞান মানুষের অফুরন্ত সম্পদ। মানুষের মধ্যে ধার্মিক ব্যক্তিরা শ্রেষ্ঠ। আবার ধার্মিক ব্যক্তিদের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তিরা শ্রেষ্ঠতম। এজন্যে মুমিন ব্যক্তিরা ফেরেশতাদের উর্ধ্বে। যাঁর জ্ঞান আছে কেবল তিনিই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝে নিয়ে সকল কাজে জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে পারেন। আবার স্বল্পজ্ঞানী ব্যক্তি তা প্রয়োগে প্রকৃত জ্ঞানীর মত সফলকাম হতে পারে না। জ্ঞানই শক্তি (Knowledge is power) এবং তলোয়ারের চেয়ে কলমের শক্তি বেশী। (A pen is mighter than sword) এই নীতি অবলম্বন করে সারা বিশ্বে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাজাবাদশা, আমীর ওমরাহগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশের সকল প্রজাবর্গকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে নিজেরা ভোগবিলাস উপভোগ করার জন্য জনগণকে নিরক্ষর করে রাখার স্থায়ী পরিকল্পনার দ্বারা প্রজাদেরকে অত্যাচার করে শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। তাদের খামখেয়ালী এবং বিদ্যাশিক্ষা চর্চায় অমনোযোগীর কারণে পাশ্চাত্য জগতের অমুসলমান জাতি ইসলামের জ্ঞান ভান্ডার লুণ্ঠন করে জ্ঞানরত্নে সম্পদশালী হয়ে আজ তারাই আবার মুসলমানদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমান জাতি আল্লাহর আনুগত্য এবং তাবেদারী থেকে দূরে সরে গেলে আল্লাহর লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করে।

নামাজ হচ্ছে আত্মার একটি উত্তম খোরাক। সুতরাং সকল ইবাদতের মধ্যে নামাজ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ইবাদত। নামাজের দ্বারা নানা উপায়ে নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা লাভ হয়ে থাকে। নামাজ দ্বারা আমাদের যে বহুবিধ শিক্ষা লাভ হয় এ সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্তাকারে দু'চারটে কথা বিবৃত করছি।

www.amarboi.org

সালাত অর্থাৎ নামাজের মারফৎ মুসলমান জাতির নৈতিক, মানসিক এবং আধ্যাতিক উন্নতি প্রবল হয়। নামাজ দ্বারা মানুষের অন্তরের কুপ্রবৃত্তি দমন, রিপুকে সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত করা হয় সহজ। ইহা মানুষকে হিংসা-দ্বেষ, রেষারেষি, কলহ, শঠতা ইত্যাদি খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। নামাজ মানুষের কর্মব্যস্ত জীবনে স্বাস্থের জন্য স্বাভাবিক ব্যায়ামের কাজ করে। সালাতের আর একটা অন্যতম শিক্ষার দিক হচ্ছে মানুষকে কল্যাণকর কাজে এবং সৎচিন্তায় মগ্ন রাখে। মহান আল্লাহ কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন আমার স্মরণার্থে নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর। নবীজী বলেছেন, নিশ্চয় সময় মত নামাজ আদায় করা মুমিনের ওপর ফরজ। নামাজের জন্য যে সময় সীমাটুকু নির্ধারণ করা আছে সেই সময় সীমাটুকু নিশ্চয় ফরজ। নামাজ এবং রোজার সময় নির্ধারণ এবং আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনে চন্দ্র সূর্যের গতিবিধি জানা ও গণনা ইসলামে ধর্মীয় বিধান। কিন্তু এ জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে ভূগোল জ্যোতির্বিজ্ঞানে পূর্ণ জ্ঞান। আবুল বাইয়াত বাগদাদের একজন অন্যতম জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। মনীষী আলহামদানি ছিলেন একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি জ্যোতি বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব ও ভূগোল শাস্ত্রে ছিলেন সুপণ্ডিত। ভূগোল বিষয়টি জ্যোতির্বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিশেষ। মুসলিম সভ্যতার প্রায় সকল বিষয়ে গ্রহনক্ষত্র, চন্দ্রসূর্য থেকে পৃথিবীর মাটি, সাগর, বাতাস, আবহাওয়া জরিপ কোনটাই বাদ যায়নি। অতীতে মুসলমানেরা ভূগোলের গোলক মানচিত্র তৈরী করেন। এমন কি তাঁরা আকাশের তারকাপুঞ্জের জটিল ও নিপুন মানচিত্রও তৈরী করেছেন। অতীতে প্রায় সকল মুসলমান বিজ্ঞানী জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োজনে ভূগোল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। ভূগোল বিজ্ঞানে আরবরা গ্রীকদের চেয়েও ছিল শ্রেষ্ঠ। ইবনুল হায়সাম কেবল উচ্চমানের ভূগোল বিজ্ঞানী ছিলেন তা নয় তিনি ভূগোল বিজ্ঞানের ওপর ছয়টি গ্রন্থও রচনা করেছেন।

বর্তমানে মুসলমান জাতি ধর্মীয় বিধান এবং অনুশাসনকে উপেক্ষা করে বিলাস সম্ভোগে মগ্ন থাকার কারণে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জাতির তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েছে। শিক্ষায় এবং জ্ঞান বিজ্ঞানে দুর্বল জাতি কোন দিন কোন বিষয়ে সফলতা লাভ করতে পারে না। মূর্খজাতি তাদের সমাজে অবিরাম হানাহানির মধ্যে পশু চরিত্র নিয়ে বেঁচে থাকে। তখন তাদের পাশবিক জীবনটা হয়ে পড়ে তাৎপর্যহীন এবং নিন্দনীয় জীবন। অনৈতিক কর্ম তাদের টেনে নেয় দুঃখভোগের পথে যার নাম ধ্বংসের নামান্তর।

www.amarboi.org

আল্লাহ্ এবং আল্লাহর নবী বারবার তাগিদ দিয়ে জ্ঞানশিক্ষার কথা কোরাআন হাদিসের মাধ্যমে অতি গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা দিয়েছেন। ইদানিং অজ্ঞ মুসলমানেরা নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারছে না বলে তারা ধর্মে ক্ষীণমতি অবস্থায় বেঁচে আছে। দুর্বল চিত্ত মুসলমানেরা মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনের কথা চিন্তা না করার কারণে তারা ক্রমেই অমার্জনীয় অপরাধের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে।

জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনায় যে জাতি যতো বেশী সাফল্য অর্জন করে, বিশ্বের অন্যান্য দুর্বল জাতি ঐ পরাক্রমশালী জাতির তত বেশী পিছনে পরে যায়। এককালে মুসলমান জাতি জ্ঞান বিজ্ঞানে যে পরিমাণ অগ্রগতি সাধন করেছিল তা সত্যিই বিস্ময়কর। বর্তমান মুসলমান জাতি নিজেদের বস্তুনিষ্ঠা জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ত্যাগ করে ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে নিশিকালো অন্ধাকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ায় জাতির সমৃদ্ধ জ্ঞানভান্ডার ধীরে ধীরে পাড়ি দিয়ে বিদায়ের পথ ধরে চলে যাচ্ছে পাশ্চাত্য জগতে। ইসলামকে বাদ দিয়ে যেমন মুসলমান হওয়া যায় না তেমনি জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষাসাধনা ত্যাগ করে বলিষ্ঠ জাতি হিসেবে টিকে থাকাটাও খুব কঠিন ব্যাপার। আল্লাহ পাক প্রত্যেক জাতিকে জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনার দ্বারা তাদের উন্নত করেন, তাদের নেতৃত্ব দেন এবং শাসন কর্তৃত্ব দান করেন। মনে রাখতে হবে মুসলমান জাতির জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা স্তব্ধ হয়ে পড়লে কিংবা ইসলামের শক্তি থেকে বিচ্যুতি ঘটলে নানাভাবে তাদের জীবন হয়ে পড়ে সংকাটাপন্ন। এ কারণে ধর্মের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে জীবনে ধর্মসাধনা ছাড়া আত্মার উন্নতি সাধিত হয় না এবং ধর্মসাধনার দ্বারাই জীবনের আত্মশক্তি সঞ্চিত হয়।

আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত হতে হলে প্রয়োজন সাধনায় একাগ্রতা। সাধনা নিষ্ফল হলে ফলাফলের উপকারিতা পাওয়া যায় না। আত্মার সাথে ধর্মের বিরোধ ঘটলে জীবনের মঙ্গলস্বরূপে দেখা দেয় সৃষ্টি ধর্মীয় লাঞ্ছনা। ধর্মে, শিক্ষায় এবং জ্ঞান বিজ্ঞানে জাতি পথভ্রষ্ট হলে তারা আল্লাহর অভিশপ্ত জাতিতে রূপান্তরিত হয়। তাদের পতন ঘটার সম্ভবনায় এসে যায় শোচনীয় পরিবর্তন। তখন গোটা ব্যাপারটা হয় বড়ই কষ্টদায়ক। সুতরাং ধর্মের কাজ হচ্ছে সকল সৎকর্মের প্রবৃত্তি বাড়ানো। এজন্যে প্রত্যেক সৎকর্মে নিজেদের রাখতে হবে অবিচল। সত্যকে পেতে হলে প্রয়োজন ধর্মে, শিক্ষায় এবং জ্ঞান

www.amarboi.org

বিজ্ঞানে কঠোর সাধনা। এগুলি সবই হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী। মানব জীবনে অহর্নিশি সকল কর্মই আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী অর্থাৎ এটাই জীবন সাফল্যের মূল কথা।

আল্লাহপাক সকল জীবকে দু'চোখ বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন। পরম করুণাময় আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন তিনটি চক্ষু যার মধ্যে আছে দুটি দৃষ্টি চক্ষু অপরটি জ্ঞান চক্ষু। দৃষ্টি চক্ষু দিয়ে মানুষ দিবালোকে সকল বস্তু দর্শন করতে পারে কিন্তু জ্ঞান চক্ষু না থাকলে জ্ঞান চিন্তায় তার দূরদর্শিতা থাকেনা এবং সত্য চেতনা বোধও সেখানে কাজ করে না। সত্য কথাটা হচ্ছে শিক্ষা যা মানুষের জ্ঞান চক্ষুর উন্মেষ ঘটায়। নিঃসন্দেহে শিক্ষা দ্বারা মানুষের সবকিছু চমৎকার হয়ে ওঠে। জ্ঞান চক্ষুর আলোকে মানুষের সচেতনশীলতা বৃদ্ধিপায় এবং স্বীয় কায়দায় মস্তিষ্কের ইংগিতে তাকে চিন্তা করার সুযোগ এনে দেয়। জ্ঞান চক্ষু মানুষের ভেতরে চিন্তা শক্তির অনুভূতি হিসেবে কাজ করে। কিন্তু মস্তিষ্ক শক্তির অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির অভাবে মানুষের অনিবার্য পরিণাম হয় সংকটাপন্ন। তখন সে সত্যের সাধনা কিংবা দিব্যভাব উপলব্ধি করতে হয় অক্ষম। তার হীন প্রবৃত্তিগুলোকে জ্ঞানপ্রজ্ঞার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতেও হয় ব্যর্থ। চোখের দৃষ্টি শক্তি থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান চক্ষুর অর্থাৎ অন্তদৃষ্টির অভাবে আত্মিক কল্যাণের বিষয়গুলো সে তার চিন্তার নাগালে আনতে হয় ব্যর্থ। এ কারণে তারা জগৎ সংসার আবর্তে সারাক্ষণ ঘুমন্ত জীবন যাপন করে। শিক্ষা লাভের অভাবে তারা সারাটা জীবন বেঁচে থাকে অবচেতন মন নিয়ে। এ ক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখি, শিক্ষা মানুষের মনের চেতনা শক্তিকে সব সময় জীবিত রাখে।

মানুষের জ্ঞানের পরিধি এই বিশাল পৃথিবীর মত যেমন প্রশস্ত তেমনি এর গভীরতাও সমুদ্রের মত গভীর। জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তিরা কখনও সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কারণ তাদের বিচারবোধ যেমন সুতীক্ষ্ণ তেমনি উপলব্ধি বোধও উচ্চতর। মানুষ তার মেধা এবং বুৎপত্তিকে কাজে লাগাতে পারলে বুঝতে হবে জ্ঞান সেখানে কাজ করছে। জ্ঞান সব সময় বুদ্ধির বিশুদ্ধতা নিয়ে কাজ করে। বলা যায় জ্ঞান হচ্ছে শিক্ষার তরবারী যা শক্তি হিসেবে মানুষের মাঝে কাজ করে। জাগতিক সকল বিষয়ে জ্ঞান মানুষের মহাশক্তি যা মহান আল্লাহর পরম করুণার দান। জ্ঞান পেতে হলে সব সময় জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জ্ঞানসাধনা করতে হয়। তবেই জীবনের

www.amarboi.org

পরম সম্পদটি লাভ করা যায়। মানুষ বুদ্ধি সম্পন্ন হবে, সুশিক্ষিত হবে, সুচিন্তিত হবে এটাই সৃষ্টি জীবের শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষ আত্মস্বচেতন হয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করবে জ্ঞানরত্ন আহরণের জন্য, শক্তি সাধনা দ্বারা মানুষ তার জ্ঞান ভান্ডার পূর্ণ করবে, জ্ঞানবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্বে মানুষ মহীয়ান হবে এটাই বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাশা। জ্ঞান মানুষের তীক্ষ্ণবোধ শক্তি যারদ্বারা সে মর্যাদার অধিকারী হয়ে সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে।

মানব জীবনের অন্যান্য আকাঙ্ক্ষার পিপাসা একনিষ্ঠ চেষ্টায় নিবারণ করা সম্ভব হলেও জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির পক্ষে তার জ্ঞানের পিপাসা নিবারণ করা একটা দুরূহ ব্যাপার। তাদের জ্ঞান পিপাসার আকাঙ্ক্ষা অল্পে পরিতৃপ্ত হয় না কারণ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা একটি আদর্শ পিপাসা। ইহা মানুষের সর্ববৃহৎ এবং সর্বোৎকৃষ্ট আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞানের পিপাসা সব সময় জ্ঞানের জন্য তাদের ব্যাকুল করে রাখে। তারা জ্ঞানের জন্য ক্রমাগত জ্ঞানের পথেই হাটতে থাকে।

ইসলাম মনে করে শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষা অর্থাৎ কারিগড়ি শিক্ষার উপর ইসলামে সমভাবে গুরুত্বারোপ করার নির্দেশ আছে। একারণে মন দিয়ে কারিগড়ি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। প্রসন্ন মনে কারিগড়ি শিক্ষাকে আঁকড়িয়ে ধরতে পারলে বাঁচার জীবনে মেরুদণ্ড শক্ত হবে। মুসলমান সমাজের কারিগড়ি শিক্ষার দিকে হাত বাড়ানোটা হবে আল্লাহর নির্দেশ পালন। আল্লাহর বিধানে কারিগড়ি শিক্ষা একটি জ্ঞান সাধনার কাজ। ইসলাম মানুষকে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা এবং গবেষণা কাজে মনোনিবেশ করতে তাগিদ দিয়েছে। জ্ঞান অর্জনে পারদর্শী হতে না পারলে সত্যের স্বরূপ উদঘাটন সম্ভব হয় না। এ কারণে মানুষের ধর্ম অনুশীলন এবং জ্ঞানপন্থা অবলম্বন অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। ইসলাম ঘোষণা দেয় আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে এক ঘন্টা পর্যালোচনা করা সত্তর বছর ইবাদতের সমান। ইসলামী শিক্ষা সংস্কার ব্যবস্থায় মানুষকে যেমন নৈতিক জ্ঞান সমৃদ্ধ করে তোলে তেমনি অপর দিকে তাকে বস্তুবাদী জ্ঞান বিজ্ঞানেও প্রসিদ্ধ লাভে সহায়তা করে। আন্তরিক ভাবে জ্ঞানকে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত করতে পারলে আল্লাহর মর্যাদা রক্ষিত হয়। বুঝতে হবে ইসলামধর্ম এবং জ্ঞান দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।

www.amarboi.org

প্রাচীনকালে মিশরে হযরত ইউসুফ (রাঃ) এর শাসন আমলে হজরত ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সেখানে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন। কালক্রমে তাঁদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার হতে লাগলো। এরাই বনি ইসরাঈল নামে পরিচিত। তৎকালীন সময়ে মিশরের আদি বাসীদের কিতবি বলা হোত। এই কিতবি বাসীরা বনি ইসরাইলদের ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখতো। কারণ তারা ছিল বহিরাগত অধিবাসী। বনি ইসরাইলগণ কিতবিদের সাহায্য সহযোগিতা থেকে ক্রমান্বয়ে বঞ্চিত হতে থাকায় তারা সকল ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিতবিরা ধনেমানে সমাজে অনেক খ্যাতি লাভ করেছিল। এ কারণ কিতবি বাসীরা বনি ইসরাইলদের গোলাম হিসেবে সমাজে নিম্ন শ্রেণীর কাজ করতো।

মিশরের কিতবি গোত্রের এক চাষীপুত্র দ্বিতীয় রামসিস ছিল অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন এবং চালাক চতুর প্রকৃতির যুবক। হামান নামে এক বালক ছিল রামসিসের পরম বন্ধু। সেও ছিল রামসিসের মত অতি বুদ্ধিমান। কোন এক সময়ে রামসিস ও তার বন্ধু বুদ্ধি নিপুনতার গুণে মিশরের রাজ দরবারে সরকারী চাকরি সংগ্রহ করে নেয়। সম্রাটের মৃত্যুর পর রামসিস নিজ ক্ষমতা বলে মিশরের সিংহাসন দখল করে নিজেকে শাহানশাহ ফেরাউন হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বন্ধু হামানকে করে তার প্রধান মন্ত্রী। প্রাচীন কালে মিশরের রাজাকে বলা হোত "ফার" এই ফার শব্দ থেকে ফেরাউন নামটি এসেছে। এই চাষীপুত্র ফেরাউন উপাধি নিয়ে মিশরের ভাগ্যকুলে রাজকীয় ক্ষমতা গ্রহণ করে হয়ে পড়ে মিশরের দণ্ডমূলের প্রতাপশালী মালিক। তখন তার আশা আকাঙ্ক্ষা হয়ে পড়ে আকাশচুম্বী। এই কামনায় সে একদিন নিজেকে খোদা হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে বসে। চতুর মন্ত্রী হামান মনে করে এখনও এই শুভ চিন্তার সঠিক সময় হয়নি। ফেরাউনের খোদায়ী দাবী করার উত্তম সময় এখন নয় বলে মন্ত্রী তাকে উপদেশ দেয়। মন্ত্রীর মতে প্রথমে দেশে সকল প্রকার বিদ্যাশিক্ষা, শাস্ত্রচর্চা এবং যে কোন বিষয়ে আলাপ আলোচনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে। ফলে দেশের সকল মানুষগুলো ক্রমে ক্রমে হয়ে পড়বে একেবারে গণ্ডমূর্খ। তখন ফেরাউনের খোদায়ী দাবীর প্রচার হবে উপযুক্ত সময়। এমতাবস্থায় দেশবাসী রামসিস ফেরাউনকে খোদারূপে পূজা করতে আরম্ভ করবে। এরূপ সিদ্ধান্তের আলোকে দেশের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা নিষেধ ঘোষণা দেওয়া হোল। ঘোষণায় বলা হোল এই

www.amarboi.org

রাজ আদেশ অমান্যকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ঘোষণা দেওয়ার পরপর সকল মক্তব মাদ্রাসা চিরতরে নস্যাৎ করে চলমান শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে দেশটাকে করা হলো অন্ধকারাচ্ছন্ন। ফলে দেশটি এসে গেল মূর্খের যুগে। আরম্ভ হলো দেশবাসীর দুঃখ কষ্টের জীবন। তখন থেকে দেশে কোথাও করুণা এবং ন্যায়পরায়ণতার লেশ থাকলো না। ফেরাউনের নিষ্ঠুর আদেশ দেশবাসী বাধ্য হয়ে তা মেনে নেয়।

দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে দেশের জনগণ হয়ে পড়ে নিরেট মূর্খ। ক্রমে তারা পৌঁছে যায় একেবারে পশু পর্যায়ে। অত্যাচারী ফেরাউন এভাবে দেশে বড় রকম আলোড়ন সৃষ্টি করে প্রজাদের কাছে ঘোষণা দেয় তারা যেন রাজা ফেরাউনের প্রতিমূর্তি তৈরী করে নিয়মিত পূজা অর্চনা করে। তখন থেকে রাজাদেশ অনুযায়ী দেশে তাই হতে থাকলো। দেশবাসী ফেরাউনব্রতী হয়ে পূজা করার কাজটা গ্রহণ করে নেয়। এতে ফেরাউনের ইচ্ছা পূরণ হয়, পূরণ হয় তার জীবনের দাবী।

ধনকুবের ফেরাউন ছিল তার দেশের একজন অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর শাসনকর্তা। আপন প্রভাবে সে ছিল একজন অতি ক্ষমতাশালী নৃপতি। তার দর্প অহংকার ছিল অতি মাত্রায়। সে ছিল একজন পিশাচ ও পাপাচারী দেশশাসক। আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয় ফেরাউন দেশে পরাক্রমশালী ও ন্যায় লংঘনকারী ছিল" (সূরা ইউনুস, আয়াত-৮৩)।

হযরত মুসা (আঃ) নানাবিধ সমস্যার কারণে বুঝতে পারলেন মিশরের অত্যাচারী ফেরাউনের অত্যাচারে বনি ইসরাইলগণ নিদারুণ কষ্ট পীড়িত অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছে। তখন সবকিছুর সীমা ছাড়িয়ে যায়। দেশে ধর্মকর্ম বলতে আর কিছুই থাকলো না। ফেরাউনত্বের কারণে দেশ ও জাতি বিলীন হতে আর বেশী দেরী নেই। তখন মুসা (আঃ) তাঁর সাথি সঙ্গীদের সাঙ্গে নিয়ে মিশর ত্যাগের পরিকল্পনা করে আল্লাহ্র অনুমতি কামনা করে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত মুসা (আঃ) বনি ইসরাইল গোত্রের সকল লোকজন সাথে নিয়ে গোপনে গভীর অন্ধকার রাতে যাত্রাশুরু করেন। পথিমধ্যে প্রাতঃকালের আলো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু হলো। ততক্ষণে বনি ইসরাইলদের মিশর ত্যাগ করে পলায়নের সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ায় ফেরাউন কাল বিলম্ব না করে সকল অস্ত্র সজ্জিত রণসৈন্য

www.amarboi.org

সম্ভার নিয়ে বনি ইসরাইলদের হত্যার উদ্দেশ্যে দ্রুত গতিতে অশ্ব ছুটিয়ে চলেছে। বনি ইসরাইলগণ পথ চলতে চলতে দেখতে পায় সম্মুখে লোহিত সাগর। সামনে সাগর পিছনে ধুলিরাশি বাতাসে উড়িয়ে ছুটে আসছে ফেরাউনের সৈন্যসামন্ত। বনি ইসরাইলগণের নারী শিশুরা বিপদের ভয়ে ক্রন্দন করতে থাকে। তখন অনেকে মুসা (আঃ)কে বলতে থাকে, "মিশরে কবর নেই বলে তুমি কি আমাদের এখানে নিয়ে আসলে? আমরা কি এই মরুভূমিতে মরবো? কেন আমাদের মিশর থেকে বের করলে"? মুসা (আঃ) এর সঙ্গীরা তাঁর সাথে এ ভাবে বচসা করতে থাকে। তখন মুসা (আঃ) তাঁর লোকেদের বললেন, ভয় করোনা, সকলে স্থির হয়ে দাঁড়াও। তোমরা কেবল নীরব থাক"। তখন আল্লাহ মাবুদ মুসাকে বললেন, "হে মুসা তোমরা ক্রন্দন করো না"। এমন সময় ঐশী আওয়াজ এলো "হে মুসা, তোমার হাতের লাঠি দ্বারা সমুদ্রের পানির ওপর আঘাত কর। সমুদ্রের পানি দু-ভাগ হয়ে তোমাদের পথ করে দেবে। তখন তোমরা সেই পথ দিয়ে পার হয়ে যাও।" হযরত মুসা (আঃ) তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের পানির ওপর হাতের লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের পানি দু-ভাগ হয়ে পথ করে দিল। সমুদ্রের পানি ডানে বামে প্রচীরস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। হযরত মুসা (আঃ) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সমুদ্রের শুষ্ক পথে চলতে লাগলো। দেখতে দেখতে ফেরাউন স্বসৈন্যে সাগরতীরে পৌঁছে গেল। মুসা (আঃ) বনি ইসলাইলদের সাথে নিয়ে সমুদ্রের অপর পারে গিয়ে পৌঁছালে ফেরাউন তার সৈন্যদল নিয়ে ঐ পথে অশ্ব চালনা করলো। ফেরাউনের সকল সৈন্য সমুদ্রের মাঝামাঝি স্থানে হাজির হতেই সমুদ্র স্রোত পুনরায় চলতে আরম্ভ করলে প্রবল স্রোতের টানে ফেরাউন ও তার সহস্র সহস্র সৈন্য কোথায় ভেসে গেলে তার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। আল্লাহপাক এভাবে মিশরীয়দের হাত থেকে বনি ইসরাইলকে উদ্ধার করলেন। আল্লাহ সকল অত্যাচারের শেষ পরিণতি ঘটিয়ে জালিমের শাস্তি এভাবেই দিয়ে থাকেন।

ফেরাউনকে ধবংস করার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক কি বলছেন দেখুন ঃ "ফেরাউনের বংশধরগণ ও তাদের পূর্ববর্তীগণের মত আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছিল ফলে আল্লাহ তাদের পাপের জন্য তাদের শাস্তি দান করেছিলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ দণ্ড দানে অত্যন্ত কঠোর" (সূরা আল ইমরান-আয়াত-১১)।

www.amarboi.org

আল্লাহ পাক প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অন্যায়ের বাড়াবাড়ির জন্য পৃথিবীতেই দণ্ড প্রদান করেছেন কঠিনভাবে। পবিত্র কোরআনে আরও উল্লেখ আছে "তিনি আদ সম্পদায়কে ধ্বংস করেছেন এবং সামুদ সম্প্রদায়কেও। কাউকেও তিনি অব্যাহতি দেননি এবং ধবংস করেছেন এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে। ওরা ছিল অতিশয় সীমা লঙ্ঘনকারী এবং অবাধ্য। তিনি লুত সম্প্রদায়ের আবাসভূমি শূন্যে উত্তোলন করে নিক্ষেপ করে ছিলেন ভূমিতে। সর্বগ্রাসী ওকে আচ্ছাদন করলো। আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ এমন কান্ড ঘটাতে সক্ষম নয়।" (সূরা নাজম, আয়াত-৫০-৫৪ ও ৫৮) সুতরাং আমি তাদের প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তাদের অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি। কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করত এবং এ সম্বন্ধে তারা ছিল অনবধান। এবং যে সম্প্রায়কে দুর্বল গণ্য করা হোত তাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের উত্তরাধিকারী করি, এবং ইসরাইলী সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্যে পরিণত হলো যেহেতু তারা ধৈর্য্য ধারণ করেছিল, আর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যে সব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা ধবংস করেছি এবং ইসরাইল সম্প্রদায়কে সমুদ্র পার করিয়েছি।" (সূরা আ'রাফ, আয়াত- ১৩৬, ১৩৭ ও ১৩৮)। পবিত্র কোরআনে অন্য আর একটি সূরায় আল্লাহ বলেন, "আদ ও সামুদ সম্প্রদায় মহাপ্রলয় অস্বীকার করে ছিল। সামুদ সম্প্রদায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ুতে যা তিনি ওদের ওপর প্রবাহিত করে ছিলেন সাত রাত এবং আট দিন বিরামহীন ভাবে" (সূরা হাক্কাকাহ আয়াত- ৫-৭)।

"আমি বনি ইস্রাইলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী বিদ্বেষ পরবশ হয়ে ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করে তাদের পশ্চাৎ ধাবন করল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জিত হোল তখন সে (ফেরাউন) বলল,আমি বিশ্বাস করলাম যে বনি ইস্রাইল যাতে বিশ্বাস করে তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং আমিও আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এখন! ইতিপূর্বে তুমি তো অমান্য করেছো, তুমি অশান্তি সৃষ্টকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। আজ আমি তোমার দেহ চড়াভূমিতে রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে অনবধান (সূরা ইউনুস, আয়াত ৯০-৯২)।"

www.amarboi.org

আল্লাহর পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ তাঁর এবাদত করবে। সাধারণ মুসলমান মনে করে নামাজ আদায়, কোরআন হাদিস পাঠ, রোজা ব্রত পালন এসবই হচ্ছে এবাদতের অঙ্গ। বাস্তবে এবাদতের পরিধি খুবই ব্যাপক ও প্রশস্ত। আল্লাহ এবং তাঁর নবীর নির্দেশিত সকল ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের নামই হচ্ছে এবাদত। একজন ব্যবসায়ী আল্লাহ এবং রসূল (সাঃ)-এর হুকুম অনুযায়ী ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করবে, কৃষক ইসলামের বিধান মতে কৃষিকাজ করবে, একজন চাকরিজীবি অনুরূপ আচরণে চাকরি করে হালাল জীবিকা উপার্জন করবে এবং ঘর সংসারের সকল কাজকর্ম আল্লাহ ও রসূলের বিধানে পালিত হওয়া সবই এবাদতের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের একটি মুহূর্ত এবাদতের বাইরে নেই। এবাদতের জন্যই সবকিছু। সৃষ্টির সকল প্রাণী, বৃক্ষরাজি তারাও নিজ নিজ পদ্ধতিতে আল্লাহর গুণগান, প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে আসছে আদি অনন্ত কাল থেকে অথচ মানুষ আল্লাহর মহিমা ভুলে পৃথিবীর বুকে জ্ঞানান্ধ হয়ে পথ চলে। জ্ঞানহীন মানুষ পশু অপেক্ষা আরও নিকৃষ্ট। মোহলালসার বশবর্তী হয়ে তারা ভোগবিলাসে হয়ে পড়ে উন্মাদ। প্রবল স্বার্থ তাদের করে দেয় নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী। ঠিক এমনি একটা অবস্থা ছিল ফেরাউনের। সে রাজ্যের অধিকারী হয়েও লিপ্সা উন্মাদনায় ছিল না ক্ষ্যান্ত। দোর্দণ্ড প্রতাপে সে রাজ্য পরিচালনা করতো এবং অহংকার ও গর্বের দাপটে মিশরবাসীকে আতঙ্কে কাঁপিয়ে রাখতো সারাক্ষণ। কি না ছিল তার রাজকোষে। মণিমুক্তা, হীরা জহরত, সোনাদানা, চুন্নিপান্নার ছিল স্তূপ। তার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার শেষ ছিল না। যার ফলে সে নিজেকে খোদা হওয়ার ইচ্ছা দাবী করে বসে এক সময়। এজন্য দেশের সকল শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ধবংস করে নিজেকে আল্লাহ দাবী করে। যে শিক্ষাকে আল্লাহ ফরজ বিধান করে দিয়েছেন ফেরাউন ঐ শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বমূলে নির্মূল করে দেয় এবং আল্লাহ দ্রোহিতার জন্যে পরিশেষে সে নিজে ধ্বংসে নিমজ্জিত হয়। আল্লাহ অত্যাচার ও অন্যায়ের দণ্ডদানে বড়ই কঠোর। পবিত্র কোরআন মজিদে আল্লাহ এরশাদ করেনঃ “বল ওদের কথামত যদি তার সঙ্গে আরও উপাস্য থাকতো তবে তারা আরশ অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় অন্বেষণ করতো। সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নাই যা আল্লাহর প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা

www.amarboi.org

করে না। কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না। নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল ও ক্ষমা পরায়ন।" (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত-৪৪)

পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন রাজা বাদশাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের লোমহর্ষক কাহিনী সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে ইতিহাস ধারণ করে রেখেছে মুসলিম জাহানে। অন্যদিকে ধরিত্রীর সমগ্র মানবকুল শিক্ষা, জ্ঞান, বিবেক, দয়ামায়া, মানবতা, স্নেহ ভালবাসা এবং মানব জাতির চির কল্যাণের জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীব।

পৃথিবী এবং আকাশমন্ডলী সবকিছু মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। সৃষ্টির মাঝে মানুষ যদি তার নিজের কাছে প্রশ্ন করে কে তাকে সৃষ্টি করেছে? উত্তরে বলবে "আল্লাহ"। তাকে কে জীবন দান করেছে? তখনও সে উত্তর দেবে; মহান আল্লাহ। এই ধরণীর বুকে মনোরম সৌন্দর্য উপভোগের জন্য পৃথিবীতে তাকে কে পাঠিয়েছে? উত্তরে বলবে "আল্লাহ" এবং এই পৃথিবীতে কে তাকে আহার বিহার দান করে বাঁচিয়ে রেখেছে? তখনও সেই একই উত্তর উচ্চারিত হবে যিনি সকল জীবের রেজেক দাতা সেই মহান আল্লাহ। কোরআনে আল্লাহ্ বলেন "যদি তুমি ওদের জিজ্ঞাসা কর কে ওদের সৃষ্টি করেছে? ওরা অবশ্যই বলবে আল্লাহ্। তবুও ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?" (সূরা যুখরোখ, আয়াত ৮৭)। কোরআনের অন্য আর একটি সূরায় আল্লাহ বলেন, "কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি কার কতৃত্বধীন, কে মৃত হতে জীবিত নির্গত করে এবং সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত করে? তখন তারা বলবে আল্লাহ্। "তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না" (সূরা ইউনুস, আয়াত-৩১)? মানব সৃষ্টি, মানব জীবন দান এবং পৃথিবীতে মানব প্রেরণের সাথে তাদের বাঁচার জন্যে খাদ্য সরবরাহ্ সবই আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্তিযোগ কিন্তু এর বিনিময়ে মানুষ আল্লাহকে কি দিচ্ছে? মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে সব কিছুই গ্রহণ করে নিচ্ছে। আল্লাহ চির অভাবমুক্ত। তিনি চান মানুষ তাঁর ইবাদত করুক। মানুষের কাছে আল্লাহর একটাই প্রত্যাশা তা হচ্ছে তাঁর ইবাদত করা। আল্লাহ্ সর্ব শক্তিমান, সর্ব প্রজ্ঞাময় ও সর্বদয়ালু। তিনি চিরসুন্দর এবং অতি পবিত্র। ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহকে জানা, এবং তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এই সুন্দর পৃথিবী। মানব সৃষ্টি আল্লাহর এক সৃষ্টি রহস্য। নমরুদ এবং ফেরাউনের মত যারা পথভ্রষ্ট, নিষ্ঠুর অত্যাচারী এবং সীমা লঙ্ঘনকারী

www.amarboi.org

আল্লাহ্ তাদের সমূলে ধ্বংস করেন কারণ তিনি চিরসত্য এবং ন্যায় বিচারক।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যাতে বেদনার সঞ্চার না ঘটে এজন্য মুসলমান জাতির মনন দৃষ্টিভঙ্গি এবং সৃষ্টি ধর্মীয় আদর্শ বিকাশে নবীজী শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নবীজী জানতেন শিক্ষা মানুষের জীবনকালের কল্যাণ অকল্যাণের প্রাণশক্তি। সেজন্য জ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি প্রতিষ্ঠিত শক্তি। ইসলাম দর্শন এবং তত্ত্বজ্ঞানের জন্য নবীজী শিক্ষাকে বিজয়ের বুনিয়াদ মনে করতেন। এই চিন্তা চেতনার দ্বারা জ্ঞানী লোকেরা জ্ঞান আহরণের জন্য আল্লাহর রাস্তায় জীবন বিলিয়ে দিতেন। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান অনুসন্ধান করার অর্থ জ্ঞান আহরণ। বিদ্যাশিক্ষা ইসলামে ফরজ এজন্যে অশিক্ষা হচ্ছে মহাপাপ। মুক্তজ্ঞানের প্রসার ঘটাতে হলে বিদ্যার্জন অপরিহার্য। কিন্তু শিক্ষার অভাবে মানুষ আত্মবিকাশে বড়ই দুর্বল। ফলে ইসলামের মাহাত্ম্য দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে কেবল শিক্ষাহীনতার কারণে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানহীনতা এবং ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করে যুগধর্মের মাধ্যমে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। মুক্ত জ্ঞানের নির্দেশনা আল কোরআনে বহু জায়গায় বিবৃত হয়েছে। সূরা বাকারায় আল্লাহ্ পাক আমাদের প্রতি এক হাজার বার আদেশ দিয়েছেন, উপদেশ দিয়েছেন এক হাজার বার, ইসলামে শান্তিকামী মানুষের জন্য আল্লাহ্ পাক সতর্ক করে মন্দ কাজের নিষেধ করেছেন এক হাজার বার, হেকমতের (জ্ঞান বিজ্ঞানের) কথাও বলেছেন এক হাজার বার এবং নানান সংবাদ এবং অনেক কাহিনীর কথাও উল্লেখ করেছেন এক হাজার বার। শিক্ষার জন্য আল্লাহ্ পাক কোরআনে আরও বলেছেন "আমি তো মানুষের জন্য এ কোরআনে সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়েছি। (সূরা রুম, আয়াত-৫৮)। কোরআন পাকে আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ "উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, কে আছ উপদেশ গ্রহণের জন্য" (সূরা ক্বামার, আয়াত ১৭)? পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন, "আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত এমন এক গ্রন্থ যাতে একই কথা নানা ভাবে বার বার বলা হয়েছে। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়" (সূরা যুমার, আয়াত- ২৩)।

www.amarboi.org

একজন ইমানদার মুসলমান যখন দোজখের শাস্তির ভয়ে ভীত হয় তখনই তার দেহমন ভীতিতে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। আল্লাহর নিকট পরকালের শাস্তি অতি কঠিন এবং তিনি শাস্তি দানে বড়ই কঠোর। এই শাস্তির কথা একজন ধর্মভীরু মুসলমানের মনে আঘাত করলে দোজখের ভয়ে তার শরীর কেঁপে ওঠে।

এ কারণে ইসলামের নীতিমালা এবং রসূলের বাণী মুসলিম জাহানে বিশ্বনন্দিত। জ্ঞানশিক্ষার জন্য বিশ্বের প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) আল্লাহর কাছ থেকে সকল বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ইমাম রাজী (রহঃ) তফসিরে উল্লেখ আছে আল্লাহ হযরত আদম (আঃ) কে বেহেশতের সমস্ত জিনিষের নাম সংক্রান্ত ইলেম শিক্ষা দিয়ে ছিলেন, এজন্য তিনি বেহেশতের ফেরশতাগণের সম্মান সূচক সেজদা লাভের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি পূর্ণজ্ঞান লাভ করেই এই দুনিয়াতে এসেছিলেন আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। পূর্ণজ্ঞান লাভ ছাড়া আল্লাহর খেলাফতী প্রতিষ্ঠা করা বিন্দুমাত্র সম্ভব ছিল না।

শিক্ষার আলোকে বলতে হয়, শিক্ষা হচ্ছে সুদূর প্রসারিত জ্ঞান চর্চার প্রক্রিয়া। হযরত আদম (আঃ) এর শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রস্থল ছিল স্বর্গরাজ্য থেকে মর্ত পর্যন্ত। পূর্ণ জ্ঞান অর্জন দ্বারা হযরত আদম (আঃ) বহু বিষয়ে বিশ্বধারণায় পূর্ণতা লাভ করে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটিয়েছেন নব মানব সমাজে। প্রয়োজনের দিকে তাকালে বুঝা যায় শিক্ষা মানুষের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সম্পদ। হযরত আদম (আঃ) নতুন বিশ্বকে আলোকিত করার জন্যে জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের সাথে জগতের মিলন ঘটিয়েছেন এবং তিনিই এই পৃথিবীতে সর্ব প্রথম জ্ঞানের আলো ফুটিয়েছেন। সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ পর্যন্ত শিক্ষার কার্যক্রম চলে আসছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত জ্ঞান শোভায় ভরে থাকবে।

আল্লাহ বলেন শয়তান পৃথিবীতে ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু। সেই শয়তান তার বাল্য জীবন থেকে প্রাপ্ত বয়স পর্যন্ত প্রথম আসমান থেকে সপ্তম আসমান অর্থাৎ স্বর্গরাজ্যের সকল বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেও পরবর্তীতে আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় তার উপর আল্লাহর লানত পরে। সেই অভিশপ্ত শয়তান সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক ঘটনার প্রেক্ষাপট এখানে অবতারনা করছি।

www.amarboi.org

পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহাপাক জ্বীন জাতি সৃষ্টি করেন। মানব জাতির আদি পিতা হচ্ছেন হযরত আদম (আঃ)। তেমনি জ্বীন জাতির আদি পিতার নাম ক্ষুমা। তার উপাধি ছিল জান্না। প্রথম অবস্থায় মহাপাপ কার্যকলাপের জন্য কোটি কোটি জ্বীন আল্লাহর অভিশাপে ধবংস হয়ে প্রাণ হারায়। এরপর আল্লাহ্পাক পলিশ নামে অন্য আর একজন জ্বীনকে তাদের বাদশা ও পয়গম্বর হিসেবে নিযুক্ত করেন। ক্রমবর্ধমান সময়ের গতিধারায় তারাও হাজার বছর ধরে পৃথিবীকে আবারও পাপাচারের জোয়ারে ভরিয়ে তোলে। তখন পৃথিবী ধ্বংসের স্রোতগতিতে ধাবিত হতে থাকে। তখন ঐ সকল অঞ্চলে আল্লাহর হুকুমে তাদের প্রতি প্রচণ্ড বেগে আঘাত আসলে তারা ধ্বংসে নিপাতিত হয়। আল্লাহ্পাক জ্বীন সম্প্রদায় থেকে বিলিকা ও হামুছ নামে পুনরায় আরও দুজন জ্বীনকে তাদের বাদশা ও পয়গম্বর হিসেবে নিযুক্ত করলেন। কালক্রমে তারাও পাপের প্রতিযোগিতায় উম্মাদ হয়ে পড়ে। অতীত দৃষ্টান্ত থেকে তাদের চরম পাপের জন্য কোন সংশোধন না আসায় আল্লাহ্পাক আবারও তাদের ধ্বংস করলেন কঠিন ভাবে। কেবলমাত্র একটি প্রলেপেই সব শেষ অর্থাৎ মুহূর্তে সবকিছু মৃত্যুতে লয় হয়ে যায়।

পৃথিবীতে জ্বীন এবং মানব জাতি যখনই সীমানা অতিক্রম করেছে আল্লাহ্পাক তখনই তাদের উপর ধ্বংস পাঠিয়ে পৃথিবীর পবিত্রতা রক্ষা করে দৃষ্টান্ত রেখেছেন পরবর্তীদের সাবধান হওয়ার জন্যে। এই সব ঐশী ঘটনা চিন্তার বিষয়বস্তু বলে আজও আমাদের দেহমন স্বীয় চিন্তায় শিহরিয়া ওঠে। আল্লাহর শাস্তি অর্পিত হলে তা প্রতিহত করার ক্ষমতা কারো নেই। তখন তাদের পালাবারও কোন পথ থাকে না।

সৃষ্টির আদিকালে পৃথিবীতে জ্বীন ও মানব জাতির অনেক মহা ঘটনায় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। জ্বীন এবং মানব জাতি যখনই পাপের রসাতলে নিমজ্জিত হয়েছে তখনই অনিবার্য ধ্বংস তাদের নিঃচিহ্ন করেছে। যখনই তারা চরম অভ্যাস দোষে আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রচনা করে পাপের ফুর্তিতে উন্মত্ত হয়েছে তখনই ভূমণ্ডলের সেই স্থানে ঐশী শক্তির কোপানলে তাদের সব কিছু ধবংস হয়ে ছারখার হয়ে গেছে। এমন কি সেখানে দৃষ্টিপাত করার মত তখনকার কোন চিহ্নও বিদ্যমান থাকেনি।

www.amarboi.org

সৃষ্টির আদিকালে কোন এক সময় সীমা লঙ্ঘনকারী জ্বীন জাতিকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্ পাক পৃথিবীতে ফেরেশতা পাঠালেন তাদের সমুচিত শাস্তি দানের জন্য। ধ্বংস কার্যক্রম আরম্ভের পূর্বে সেখানে এক হাজার বছর বয়সের একটি সুন্দর ফুটফুটে জ্বীন বালকের প্রতি ফেরেশতাগণের নজর পড়ে। কী সুন্দর রূপ তার! তার প্রতি ফেরেশতাদের দৃষ্টি গোচর হওয়ায় তাঁরা বালকটির প্রতি স্নেহ মমতায় বিগলিত হয়ে পড়ে। দীব্যদর্শন কিশোর বালকটির মায়ায় তাকে ধবংস করতে না পেরে আল্লাহ পাকের অনুমতি ক্রমে লালন পালনের জন্য ফেরেশতাগণ তাকে প্রথম আসমানে নিয়ে যায়। সেখানে হাজার হাজার বছর ধরে চলতে থাকে তার আসমানী ইলেম শিক্ষা। জ্ঞানশিক্ষার সাথে আদব কায়দা, শিষ্টাচার, ইবাদতের নিয়ম বিধান সবই শিখানো হলো জ্বীন বালকটিকে। এই জ্বীন বালকটির নাম ইবলিস। তার পিতার নাম খবিচ এবং মাতার নাম নীলবিচ। ইবলিসের মেধাশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। প্রথম আসমানে ধর্মীয় বিদ্যাশিক্ষা শেষে দ্বিতীয় আসমানে শিক্ষা সমাপ্তির পর তৃতীয় আসমান থেকে পর্যায়ক্রমে আধ্যাতিক জ্ঞানলাভ করতে করতে সপ্তম আসমান পর্যন্ত বহু ইবাদত বন্দেগী ও জ্ঞান সাধনায় চরম উৎকর্ষ সাধন করার পর তাকে আরশে মুয়াল্লায় তুলে দেওয়া হয়। সেখানে ইয়াকুত পাথরে নির্মিত সুউচ্চ মিম্বরে বসে ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতো সারাক্ষণ এবং ফেরেশতাগণদের সর্বপ্রকার অমূল্য ওয়াজ নছীয়ত শুনাতো এই জ্বীন ইবলিস। এ সময় তার নাম হয় মালাকুত অর্থাৎ ফেরেশতাদের শিক্ষক। ইবলিসের ইবাদতের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। সে সমগ্র পৃথিবী, সাত জমিন এবং সাত আসমানে সিজাদায় রত থাকতো।

আল্লাহ্ কোন এক সময় আদম সৃষ্টির জন্য আজরাইল (আঃ)কে মাটি আনার হুকুম দিলেন। আজরাইল ফেরেশতা মাটি এনে আল্লাহর দরবারে হাজির হলেন। আল্লাহ্ মাটি দ্বারা আদম সৃষ্টি করলেন। অতঃপর আল্লাহ পাক আদমের কাঁচা শরীর আরশের নীচে কোন এক জায়গায় শুইয়ে রাখেন। আল্লাহ্পাক আদমের শরীরের গঠন দেখার জন্য ইবলিসকে আদেশ দিলেন। আদমের কর্দম নির্মিত বৃহৎকায় দেহ পিঞ্জরটি আপাদমস্তক পরিদর্শন করে ইবলিস ক্ষোভে বিক্ষোপ করতে থাকে। সে অবজ্ঞা এবং উপেক্ষা ভরে কঠোর মন্তব্যে মেতে ওঠে। তখন তার মনের সংকীর্ণতা আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

www.amarboi.org

আল্লাহ পাক আসমান রাজ্যে আদমের কাঁচাদেহে রুহ মোবারক দান করলেন। রুহ দেখার বস্তু নয়। রুহ হচ্ছে আত্মা যাকে আমরা জীবন বলি। রুহ আসার সঙ্গে সঙ্গে আদম (আঃ) এর দেহে জীবন সঞ্চালন হয়ে উঠে অর্থাৎ তিনি জীবন্ত মানুষ হয়ে ওঠেন। তিনি হয়ে ওঠেন ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানবুদ্ধির মানুষ। হযরত আদম (আঃ) জীবন্ত হয়ে উঠার পর মহান আল্লাহ আসমানের সকল ফেরেশতাদের আদম (আঃ) কে সেজদা দিতে আদেশ দিলেন। ফেরেশতাগণ মহান আল্লাহর নিকট থেকে সেজদার আদেশ পেয়ে একযোগে সকল ফেরেশতারা আদম (আঃ)কে সম্মান প্রদর্শনের জন্য সেজদা কররেন। কিন্তু ইবলিস আদম (আঃ)কে সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে অন্য দিকে বিমুখ প্রদর্শন করে অর্থাৎ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে বিরূপ মন্তব্য করতে থাকে। সে নত হলো না। ইবলিসের এরূপ দুঃসাহসিকতার কারণে আল্লাহ পাক তার উপর ক্ষুব্ধ এবং রুষ্ট হন। সে আল্লাহর কাছে অভিশাপ্ত হয়। আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করায় তার উপর আল্লাহর ঘৃণিত লানত পড়ে। তখন থেকে ইবলিসের সর্বোচ্চ আসমানি শিক্ষা, গভীর জ্ঞান, আল্লাহর প্রতি নিগূঢ় ইবাদত এবং ধ্যানমগ্ন সাধনা সবকিছু থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর বিরাগ ভাজন হয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছ থেকে স্বীকৃতি পায় ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে। আল্লাহর কাছে ইবলিসের মত্ত অহংকার, ক্রুদ্ধ আচরণ, আত্মগর্ব এবং বিষগর্ভ চক্রান্তের কলঙ্কময় কাহিনী সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ- "আমি তোমাদের সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের রূপদান (মানব আকারে) করি এবং তারপর ফেরেশতাদের আদমের নিকট নত হতে বলি। ইবলিস ব্যতীত সকলেই নত হ'ল। যারা নত হল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হল না। তিনি বলেন আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কে তোমাকে নিবৃত্ত করল যে তুমি নত হলে না? সে বলল আমি তার (আদম) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে কর্দম দ্বারা।

টীকা ঃ (ক) আল্লাহর বিধানে সকল মানুষ হজরত আদম (আঃ) এর সন্তান। এজন্য হজরত আদম (আঃ) সকল মানব জাতির পিতা। (খ) পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের চারটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দ্বারা আহবান করেছেন-হে আদম সন্তান, হে বনি ইসরাইল, কখনও হে মানব সন্তান এবং হে বিশ্বাসীগণ।

www.amarboi.org

তিনি বললেন এ স্থান হতে নেমে যাও, এখান থেকে অহংকার করবে, এ হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি অধমের অন্তর্ভুক্ত। সে বলল পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও। তিনি বললেন যাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে। সে বলল যাদের উপলক্ষ্য করে তুমি আমার সর্বনাশ করলে এজন্য আমিও তোমার সরল পথের মানুষের জন্য নিশ্চয় ওৎ পেতে থাকব। অতঃপর আমি তাদের সম্মুখ পশ্চাৎ, দক্ষিণ বাম দিক হতে তাদের নিকট আসবই এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না। তিনি বললেন এ স্থান হতে বিকৃত ও বিতারিত অবস্থায় বের হয়ে যাও। মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে নিশ্চয়ই আমি তাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই। এবং বললাম, হে আদম, তুমি ও তোমার সঙ্গিনী স্বর্গে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না, হলে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান যা গোপন রাখা হয়েছিল তা প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদের নিষেধ করেছেন। সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খীদের একজন। এভাবে সে তাদের প্রবঞ্চিত করল। অতঃপর যখন তারা সেই বৃক্ষফলের আস্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা উদ্যানের পত্র দ্বারা নিজেদের আবৃত করতে লাগলো। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের সম্বোধন করে বললেন, আমি কি তোমাদের এ বৃক্ষ সম্বন্ধে সাবধান করিনি এবং শয়তান যে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু আমি কি তা তোমাদের বলি নি? তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না কর তবে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। তিনি বললেন তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে নেমে যাও, এবং সেখানে তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল। তিনি বললেন, সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান হতেই তোমাদের বের করে আনা হবে।" (সূরা আরাফ, আয়াত ১১-২৫)।

www.amarboi.org

শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে আরও বলেন ঃ "হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদের কিছুতেই প্রলোভিত না করে, যেভাবে তোমাদের পিতামাতাকে সে বেহেশত হতে বহিষ্কৃত করেছিল। তাদের লজ্জাস্থান তাদের দেখার জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে নিজে এবং তার দলবল তোমাদের এমনভাবে দেখে যে তোমরা তাদের দেখতে পাওনা, যারা বিশ্বাস করে না শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি।" (সূরা আরাফ আয়াত-২৭)।

পবিত্র কোরআন এবং ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী ইবলিসের জীবন কাহিনী এখানে বর্ণীত হলো। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি হুশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে সাবধান থাকার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন আল কোরআনে এবং যারা বিপথগামী তাদেরকে করেছেন শয়তানের অভিভাবক। এ কথা কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যাতে সতর্ক হতে পারি।

এখানে ইবলিসের চারিত্রিক আচরণ রূপায়ণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার মহাপাতক ঘটনাচক্রের কার্যকলাপ পাঠকবর্গের কাছে উপস্থাপন করা। ইবলিসের সকল বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও উচ্চ শিক্ষা সম্পদ থাকা সত্ত্বেও অবশেষে সে আল্লাহর কাছে ঘৃণিত শয়তান নামে আখ্যায়িত হয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন মানুষকে যেমন করে তোলে জ্ঞানবান তেমনি জ্বীনকেও দিয়ে থাকেন মহত্ত্বের গৌরব। কিন্তু ইবলিসের গর্ব অহংকারই ছিল তার সর্বনাশের মূলকারণ। সে স্বর্গরাজ্যে থাকা অবস্থায় জ্ঞানসম্পদের প্রাচুর্য লাভ করেও পরিশেষে ধ্বংসের আবর্ত্তচক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

আসমানী শিক্ষা হচ্ছে অতি পূতপবিত্র এবং শান্তিময় জীবন যাপন যার মধ্যে বিরাজ করে উদার প্রেমভালবাসা। ইবলিস আসমানী শিক্ষায় মহাজ্ঞান অর্জন করে "মুআল্লিমুল মালাকুত" অর্থাৎ ফেরেশতাদের শিক্ষক, এতোখানি মহাসম্মানে নন্দিত হয়েও অহংকার নীতির দাপটে আল্লাহ দ্রোহী হয়ে পড়ে। সুতরাং আদম সৃষ্টির পিছনে ইবলিসের সবকিছু ধ্বংসের মূল কারণ। অতঃপর সে ঈর্ষা বিদ্বেষীত হয়ে বিশ্বের মানব গোষ্ঠীকে পাপের পথে আকর্ষণ করার মহাশক্তি অর্জন করে এবং তখন থেকে এই পৃথিবীর বুকে ইবলিসের মত অনাচারীর আর কোন জুড়ি নাই।

www.amarboi.org

মুসলিম জাহানে মুসলমান জাতির ইসলাম শিক্ষা ন্যায়ানুগত একটা পবিত্র দায়িত্ব। মুসলমান জাতিকে সুনির্দিষ্ট আদর্শে শিক্ষত হতে হলে প্রয়োজন হৃদয় বিকাশের চেতনাবোধ। একারণে একজন মুসলমানকে আল্লাহর কাছে হতে হবে আত্মসম্পর্পনকারী। আত্মসমর্পনকারী মুসলমান সব সময় আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত বান্দা। আসমান রাজ্যে ইবলিস অগাধ জ্ঞানবিদ্যার অধিকারী হয়েও শেষ পর্যন্ত একমন দুধে এক ফোঁটা গো চোনার মত তার দু'লক্ষ বছরের সকল শ্রম ও শিক্ষা সাধনা পন্ড হয়ে আল্লাহর কাছে চিরবঞ্চিত হয়ে অভিশপ্ত শয়তান নামে পরিচিতি লাভ করে।

মুসলিম জাহানে অনেক নামধারী মুসলমানের শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও ইহকাল ও পরকালের জীবন এ দুয়ের মাঝে অর্থাৎ এ দু'অন্ত্যের মধ্যবর্তী স্থানে ইবলিসী ফরমূলায় শয়তানের অনুসারী হয়ে জীবনের কষ্টার্জিত বিদ্যাশিক্ষা এবং ঈমানী ভূষণ বিনষ্ট করে হয়ে পড়ে শয়তানের অনুচর। ফলে তাদের কাছে ইসলামধর্মের ন্যায়নীতির প্রভাব কখনও বিশুদ্ধ থাকে না। তখন ইসলাম তাদের কাছে হয়ে পড়ে নেহায়েত অস্তিত্বহীন ধারণা। বস্তুতঃ মানব শয়তান এবং ইবলিস শয়তান এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল শরীর গঠনে। মানব শয়তান বাইরের আকৃতিতে মানুষ ভেতরে তার শয়তানী সম্পদে ভরপুর। ধর্মের বিশুদ্ধতা নষ্ট করা উভয়ের কাজ। তারা উভয়েই আল্লাহর কোপানলে হয় ভস্মীভূত। এ কারণে তাদের কাছে আল্লাহর কোন করুণা থাকে না। তারা আল্লাহর অপমানভারে হয় ধ্বংস। একথা ঠিক, তাদের কাছে ধর্ম জিজ্ঞাসা থাকলে তারা সত্য বিরোধী কাজের জন্য আল্লাহর কাছে নিজেদের অভিযুক্ত করে তুলতো না। তারা ইসলাম ধর্মদর্শন নিয়ে করে তর্ক বিতর্ক এবং ধর্ম মতবাদে হানে আঘাতের পর আঘাত। মৃত্যুর পর দোজখ হবে তাদের আশ্রয় স্থল। চলতে থাকবে শাস্তির পর শাস্তি। সেখানে তারা মরবেও না, বাঁচবেও না।

পৃথিবীতে বাঁচতে যেয়ে সমাজে দেখা দেয় নানা সমস্যা। সমাজে টিকে থাকতে হলে প্রথমে যে হাতিয়ারটি দরকার তা হচ্ছে আদর্শ শিক্ষা লাভের সাথে ধর্মশিক্ষা। পক্ষান্তরে শিক্ষার অভাবে মানুষ হয়ে পড়ে নির্বোধ। সমাজে শিক্ষাহীনতার কারণে মানব চেতনা বিকাশের পথ হয় অবরুদ্ধ। তখন নানা সমস্যা তাদের সমাজ জীবনকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। সুতরাং মুক্তির উপায় হিসেবে প্রয়োজন শিক্ষার আলোকে নিজের মধ্যে

www.amarboi.org

যোগ্যতা অর্জন। সমাজে ধর্মবিভ্রান্তির কলেবর যতই বৃদ্ধিপাক পার্থিব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন এবং কোরআন হাদীসের উপর বীক্ষণ ক্ষমতা থাকলে সকল সমস্যা দূরীকরণের পথ হয় সহজ।

ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী মুসলমান জাতি শিক্ষা দীক্ষায় সুশিক্ষিত হলে সমাজবিপ্লব সম্ভব। সমাজকে রক্ষা করতে হলে বিবেকের নির্দেশে জাতিকে মানব হিতৈষী কাজে ভূমিকা পালন করতে হয়। এই মহতী কাজের জন্য প্রয়োজন মহৎ আদর্শ। এখানেও প্রয়োজন জ্ঞানের উদ্দেশ্যে আদর্শ শিক্ষা এবং ধর্মের উপর উজ্জ্বল চেতনা বোধ। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান বিকাশের মাধ্যমে সুন্দর চরিত্র গঠন। একজন মুসলমান আদর্শ শিক্ষার মাধ্যমে তার চরিত্রের উন্নতি এবং জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে পারলে সেখানে ধর্মান্ধতা, হীনমন্যতা এবং কুসংস্কারের প্রভাব থাকেনা। তখন বিচ্ছিন্নতাবাদী তাসলিমা নাসরিনের মত একজন মুসলমানের ঈমান হারাবার আর ভয় থাকে না।

শিক্ষা মানুষের চৈতন্য বোধের বিকাশ ঘটায় যা একটা অসাধারণ শক্তি। শিক্ষা যখন মানুষের ব্যাকরণিক চরিত্র গড়ে তোলে তখন সব কিছুতে নৈতিক মূল্যবোধ বেড়ে যায়। নদী যেমন তার উৎস স্থল থেকে প্রচুর পরিমাণ জলরাশি নিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলতে চলতে তার নিজের অঢেল জলরাশি মহাসমুদ্রে ঢেলে দেয় তেমনি একজন মুসলমান তার ইসলাম ধর্মের উৎস স্থল কোরআন হাদিস থেকে প্রচুর পরিমাণ কল্যাণ বারিধারা নিয়ে দ্বীনের পথে চলতে চলতে স্রোত প্রবাহিত ধারায় চিরশান্তির বেহেশত নিকেতনে মিলিত হয়।

ধীরে ধীরে পথ হাঁটলে এক সময় যেমন লক্ষ্যে পৌছানো যায় তদ্রূপ একজন মুসলমান ধর্ম বিধানের পথ ধরে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকলে এক কালে সে জান্নাতের দ্বার প্রান্তে পৌছে যায়। সুতরাং ধর্ম পালন এবং তার সঠিক চর্চা ব্যতীত পরকালের শান্তি লাভ সম্ভব নয়। ইসলাম হচ্ছে একটি অফুরন্ত ধর্মসমৃদ্ধ ভাণ্ডার। ইসলামধর্ম পালন মানেই হচ্ছে বেহেশতী সুখ ভোগ। যিনি ধর্ম সাধনায় সিদ্ধিকাম হয়ে নাফসীন প্রবৃত্তিগুলো দমন করে আল্লাহ এবং রসূলের নিষেধ কাজগুলো বর্জন করতে সক্ষম হবেন তিনি জান্নাতী সুখের অধিকারী হতে পারবেন।

www.amarboi.org

জান্নাতী সুখ মহান আল্লাহর নিকট কিরূপ রক্ষিত আছে মানুষ তাহা কল্পনাও করতে পারে না। করুণাময় আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন, "আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু কখনও দেখে নাই, কোন কান কখনও শুনে নাই, কোন মন কখনও কল্পনাও করে নাই।" কোন ব্যক্তি জানে না যে তাহার নয়ন তৃপ্তি কর, কি কি বস্তু আল্লাহ পাক তাঁহার বান্দার জন্য লুকাইয়া রাখিয়াছেন। (আবু হুরাইয়া -বোখারী শরিফ)

www.amarboi.org

ইসলাম ও সংস্কৃতি

ইসলাম কী? ইসলাম একটি ধর্মের নাম। ইহা একটি ধর্ম পরিচয়। ইসলাম কোন পণ্ডিতের আবিষ্কার নয়। ইসলাম হচ্ছে মুসলমানের পক্ষে আল্লাহর ধর্ম পরিচয়। ইসলাম বিশ্বমাঝে মহামঙ্গলময় ধর্ম। ইহা আল্লাহর মনোনীত শান্তির ধর্ম। আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে লক্ষ্য করে বলেন, "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম" (সূরা মায়েদা, আয়াত-৩)। আল্লাহ এবং রসূলের (সাঃ) আহবানে সত্যের পথে জীবন অতিবাহিত করার নাম ইসলাম। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন "নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর একমাত্র ধর্ম" (সূরা আল ইমরান, আয়াত-১৯)। আল্লাহ পাক কোরআনে আরও বলেন- "এবং কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। (সূরা আল ইমরান, আয়াত-৮৫) অর্থাৎ ইসলাম একটি প্রচারমূলক ধর্ম। সত্য প্রচারে ইসলাম মুসলমানের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইসলাম মুসলমানের ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের পূর্ণতা, বিকাশ ও ধর্মঅনুশীলন। মানব জীবনে একজন মুসলমান কোরআন এবং হাদিসের আলোকে নিজেকে সংশোধন এবং সব কিছুর মিমাংসার জন্য মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করার নাম ইসলাম। ইসলাম সম্পর্কে আরও কিছু বলতে গেলে, ইসলামের দুটো দিক আছে। একটা দিক ঈমান আর একটা দিক আমল। ঈমান ইসলামের একটি অংশ। ঈমান অর্থ বিশ্বাস এবং ইসলাম অর্থ শান্তি। ইসলাম আধ্যাতিক এবং বৈষয়িক জীবনের জন্য সুষ্ঠু ও সুন্দর মিলন সাধন।

ইসলাম সম্পর্কে জনৈক মুসলিম পন্ডিত বলেনঃ

In the world every religion has been named either after the name of its founder or after the community and nation in which that religion took its birth. As such Islam is the latest religion in the world. Islam as a matter of fact is an attributive title. It is a religion of peace and tranquility for

www.amarboi.org

the good of humanity to serve humanity. Islam connotes submission, surrender and obedience to Allah-The Almighty alone and that is why it is called ISLAM. Islam signifies nothing but complete obedience and submission bowing down head before Almighty Allah in gratitude. Islam adopts the right way of obedience and loyalty to one Allah the creator of the Universe. So Islam is a religion which stands for complete and unflinching faith in the oracle of God and in the teaching of prophet that is the prophethood of Muhammed (be peace upon him). The man who directly follows the prophet and claims to follow and belief (i) in One God (ii) in God's Angels (iii) in God's Books and the latest book The Holy Qur'an (iv) in God's Prophets (v) in Doom's day and in life after death is called Muslim.

সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় সংস্কৃতি বলতে কি বুঝায় অর্থাৎ সংস্কৃতি কী? সংস্কৃতি হচ্ছে মানব জীবনের সার্বিক অনুশীলন এবং সভ্যতার চেতনা। সংস্কৃতি মানব আদর্শে লক্ষ্যভূমির পথে অগ্রসরমান সভ্যতা এবং দর্শন। ইহা মানব মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য নৈতিকবোধ। সংস্কৃতি মানব মূল্যবোধে রুচির আদর্শ এবং সভ্যতার যোগান। সংস্কৃতি আত্মশক্তি লাভে প্রেরণা যোগায় এবং সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা এবং সংস্কারকে জোরদার করে। সংস্কৃতি শিক্ষার আলোকে আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার কর্মধারা।

ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব আবুল হাশিম তাঁর The Creed of Islam or The Revolutionary Character of Kalima নামক গ্রন্থে কালচারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেনঃ

"Culture is the development of the faculties of man both external and internal, and is its manifestation in his behavior and in his immediate material environment. Culture of a society is, therefore, found in the everyday

www.amarboi.org

business of life and actual living condition of its people. So the culture revolution of the Kalima is seen in the Pristine Muslim Arab Society of Medina"

সংস্কৃতি সমাজ পরিসরের একটা অংশ বিশেষ। কার্যক্ষেত্রে সংস্কৃতি মানব সমাজের উন্নয়নগামী তৎপরতায় কার্যধারা যা আদর্শ সমাজ উন্নয়নে প্রতিফলন ঘটায়। ইহা সমাজ শোভার দৃষ্টিতে অলংকার স্বরূপ।

ইসলামী সংস্কৃতি কি? মুসলমান জাতির জীবন ব্যবস্থায় সংস্কারমুক্ত ধর্ম অনুশীলনকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানী জীবনে ধর্মীয় উপকরণগুলোর সৌন্দর্য বর্ধন করা। সামগ্রিক মানব জীবনকে সুন্দর ও মহিমাময় করে তোলা ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য। ইসলামী সংস্কৃতি সমগ্র মুসলিম জাতির অগ্রগতি এবং ধর্মীয় উৎকর্ষ সাধন। ইসলামী সংস্কৃতি বললে বুঝতে হবে সমগ্র মসুলিম জাতির ধর্মীয় লেনদেন যা জীবন যাপন পদ্ধতিতে পরলোকের সাফল্য অর্জনের জন্য অন্যতম লক্ষ্য।

অপর পক্ষে বলা যায় অন্যান্য সংস্কৃতির সাথে ইসলামী সংস্কৃতির একটা পার্থক্য আছে। ইসলামী সংস্কৃতির মাঝে ইসলামী মূল্যবোধের আদর্শ এবং মুসলমানী জীবনে ঐ আদর্শের প্রতিফলন থাকতে হবে। ইসলামী সংস্কৃতি কোরআন হাদিসের আলোকে মুসলমানের জীবন ধারার সকল কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে।

ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে জনৈক মুসলিম পন্ডিত ও লেখক বলেন ঃ

Allah has granted us with certain amount of freedom of will and virtuous action during lifetime. This freedom lies with our real knowledge and upright wisdom. The moral life of Muslim people is always filled with piety, righteousness and truthfulness as a whole. Muslims cannot lead their social life without code of life. Muslim cannot enjoy carefree life without ratification of Islamic code. To lead a life of righteousness and goodness has the influence of Islamic culture contributing to Muslim civilization. In

www.amarboi.org

Mohammed world the Mohammed (be peace upon him) has a brilliant culture which constitutes a distinctive force in Muslim world. Thus love for reality and the balance of Islam liking are the spiritual side of Muslim life. Islamic culture consists of religious mission between its spiritual and the material value religiously with the significant knowledge and mankind action. In Muslim culture and civilization all good deeds have the real aspects of social development in the light of the Quranic and Hadith because Islam is based on rational approach. So the better social achievement is the name of civilization and refined culture under Islamic aspect acted upon the teaching of prophet, Muhammed (be peace upon him).

মানুষ তার সমাজ জীবন যাপনে আত্মোন্নয়নের রীতিনীতি নির্ধারণ করে ইসলামী দর্শন মতবাদের বিকাশ ঘটাতে পারলে সংস্কৃতির প্রকৃত রূপ ফুটে উঠে। একটি উন্নত সমাজের অর্থ মানবিক মূল্যবোধের চেতনায় সভ্যতা এবং ধর্মীয় দর্শনের সম্মিলিত সাফল্য। প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া সমাজে আদর্শ সৃষ্টি সম্ভব নয়। সংস্কৃতি মানুষের মূল্যবোধের জাগরণ যা তার চারিত্রিক চালচলনে প্রতিফলন ঘটায়। এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই, সমাজ জীবনে মানুষের উন্নত চিন্তাই হচ্ছে সভ্যতার মূলমন্ত্র। মানবহিতের জন্য সমাজ সংস্কৃতির সাথে নতুনত্বে আধুনিক এবং গুণগত উন্নতির নাম সভ্যতা। সভ্যতা এবং সংস্কৃতি মানব জীবনের একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা। সভ্যতা এক দেশ থেকে অন্য আর এক দেশে স্থানান্তরিত হয় কিন্তু সংস্কৃতি এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয় না। কারণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংস্কৃতি হয় ভিন্ন ভিন্ন।

পৃথিবীর ইতিহাস রচয়িতাগণ লিখে গেছেন প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী। মিশর, সিরিয়া, গ্রীস, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশে বিরাট বিরাট সভ্যতার জন্ম হয়েছে। তাঁরা লিখে গেছেন মানব সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কীত মূলমান মতবাদ। কালে কালে এসব সভ্যতা সংস্কতির অনেক কিছুর বিলুপ্তি ঘটেছে কিন্তু ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি জন্ম লাভ করেছে মাত্র ১৫ শো বছর

www.amarboi.org

থেকে। তখন থেকে ইসলামী সভ্যতা দুনিয়া ব্যাপি শক্তিশালী হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বমুসলিম সমাজে। কারণ এর উৎস আল্লাহর নবী যাঁর মাধ্যমে মুসলিম সভ্যতা এবং ইসলামী সংস্কৃতি দুনিয়া জুড়ে কর্মে পরিণত হওয়ার কেন্দ্র বিন্দু। এ কারণে ইসলামে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মুসলিম সভ্যতায় ব্যাপক রূপ নিয়েছে।

বিশ্বে এক এক জাতি তার নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে আছে। কোন এক জাতির সংস্কৃতির সাথে অন্য আর এক জাতির সংস্কৃতির মিল নেই। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতি সারা বিশ্বে সকল মুসলমান জাতির অভিন্ন একক সংস্কৃতি। ইহা ইসলামী জীবন বোধের আদর্শিক পরিপোষক। মুসলমান সমাজে ধর্মচর্চার প্রসার ঘটাতে পারলে ইসলামী সংস্কৃতি টিকে থাকবে বিশ্ব উম্মার মাঝে। ইসলাম থেকে যে সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে তার অবদান মুসলমানদের কাছে অনেক সমাদৃত। কারণ ইসলামী সংস্কৃতির সৌন্দর্য মানুষকে আকৃষ্ট করে ধর্মকর্ম প্রবৃত্তির পথে।

সমাজে ধর্ম অবহেলিত হলে, শিক্ষা এবং ধর্মচর্চার মাধ্যমে সমাজকে ধর্মের পথে ফিরিয়ে আনতে হয়। ইসলামের আদর্শ যতই শক্তিলাভ করে ইসলামী সংস্কৃতি ততই উপযোগী হয়ে উঠে। মুসলিম সমাজে সংস্কৃতি যদি কোনরূপ বেমানান হয় কিংবা এর সত্তা বিকাশে মঙ্গল না থাকে তখন ধর্ম ঐ সমাজে হাবুডুবু খায়। দেহ এবং আত্মা উভয়ে জীবন যাপনের জন্য যেমন মিলনগ্রন্থি অনুরূপভাবে ধর্ম এবং সংস্কৃতি একে অন্যের সদস্য হিসেবে পদমর্যাদা লাভ করে। সমাজ সংস্কৃতি এবং ইসলাম ধর্ম উভয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। সমাজ পরিবেশের ভেতরে কোন সময় কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হলে দূরীকরণের উপায় হিসেবে ইসলামী সংস্কৃতির আলোকে উহা পরিশুদ্ধ করে নিতে হয়। ইসলামী সংস্কৃতির কাজ হচ্ছে ন্যায়বোধের আদর্শকে সমানে রেখে সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। ধর্মের ভেতরে যে সত্যটা রয়েছে সেটাই সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামের আশীর্বাদ। ঐহিক এবং পারত্রিক বিষয়ের সকল দিকগুলো শক্তিশালী হলে ইসলামী সংস্কৃতির পথ সুগম হয়। ইসলাম বিহীন সংস্কৃতি অনেক সময় সমাজে অভিশাপ বয়ে আনে। এ কারণে সমাজচাহিদা পূরণের জন্যে সমন্বয়ের মাঝে সমন্বয় সৃষ্টি করতে হয়। দেহকে ছেড়ে আমরা যেমন আত্মা

www.amarboi.org

পেতে পারি না তেমনি ধর্ম ছাড়া ইসলামী সংস্কৃতি হয় না। উভয়ের সম্পর্ক আঙ্গিক। একটার অবর্তমানে অন্যটা হয় দুর্বল। এ কারণে উভয় দিকে আত্মনিবেশ প্রয়োজন। ধর্মশক্তিতে আছে আত্মার মুক্তি এবং মানব মনের ইচ্ছা শক্তিতে আছে সংস্কৃতির উন্নতি। তারা উভয়ে ন্যায়ের এবং সত্যের পথে চলাচল করে। ধর্মের সাথে ইসলামী সংস্কৃতি যতটুকু কাজে লাগে এবং মুসলমান সমাজে ইসলামী সংস্কৃতি যতটুকু প্রয়োজন তার উন্মেষ ঘটাতে হবে সুবিবেচনায় যাতে এ দুয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি না হয়। ধর্মের সাথে সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়ে জীবনে যে সুবিধাটুকু পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে ইসলামের সত্যরূপ। একজন মুসলমান ইসলামী সংস্কৃতির কার্যকলাপকে গ্রহণ করে সঠিক পথে চলতে পারলে সেটাই হবে তার প্রাণ বিচরণের ধর্মীয় আদর্শ।

সামগ্রিক ভাবে মানব জীবনে ইসলামের আদর্শকে মহিমাময় করে তোলাই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য। মানব জীবনের অনাবিল আচার-আচরণ ইসলামী সংস্কৃতির আওতাভুক্ত হলে ইসলামের মূল্যবোধে পাওয়া যায় সত্যের সন্ধান, তখন জীবন হয়ে ওঠে মহত্ত্বের অধিকারী। ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে মানব জীবনের কল্যাণ সাধন। ইসলামী সংস্কৃতি ধর্মস্বীকৃত সংস্কৃতি এবং এর মাঝে নিহিত আছে আত্মবোধের কতকগুলো সুস্পষ্ট দিক। ইসলামী সংস্কৃতি ইহলোক এবং পরলোকে সাফল্য লাভের প্রতিশ্রুতি দান করে। এই সাফল্য অর্জনের জন্য কোরআন এবং হাদিসের আলোয় জীবন যাপনে মুসলমানের মধ্যে থাকতে হবে ধর্ম সাধনা। আল্লাহপাক এরশাদ করেন, "হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের কর্ম ব্যর্থ করো না। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্থ।"

ইসলাম যেকোন বিষয়ে সীমা লঙ্ঘন করাকে জুলুম মনে করে, এজন্য স্বার্থপর ব্যক্তিরা ইসলামের দৃষ্টিতে সংস্কৃতিবান হতে পারে না। একজন মুসলমানের উচিত তার নিজের বিবেচনা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মীয় আদর্শে জীবন গড়ে তোলা। মনের মাঝে মূল্যবোধের বীজ বপন করতে না পারলে পরকালে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হয়। সমাজে মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় আদর্শ থাকলে সেই সমাজে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি বিরাজ করতে পারে না। ইহাকাল এবং পরকাল দু'কালের জন্যে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রয়োজন রয়েছে।

www.amarboi.org

আল কোরআনের জীবন বিধান অনুসারে একজন মুসলমান আল্লাহর কাছে আত্মসর্ম্পণ করে। আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের জন্য আত্মসর্ম্পণকারী ব্যক্তি তার জীবনকে ইসলামের শান্তিময় পথে বিকশিত করার জন্যে নিজেকে পরিশোধিত করে নেয়। আল্লাহর কাছে আত্মসর্ম্পণকারী ব্যক্তি সর্বাধিক খোদাভীরু এবং অধিক সম্মানিত বান্দা। একজন মুসলমান ইহকাল এবং পরকালের পুরস্কারের প্রত্যাশায় সে তার সৃষ্টিকর্তাকে ভালবেসেই তাঁর কাছে আত্মসর্ম্পণ করে। এ কারণে ইসলামে মুসলমানের অস্তিত্ব এতো বড়। একজন খোদাপ্রীতি মুসলমানের কর্মকঠোরজনিত আনন্দ হচ্ছে আধ্যাত্মিক আনন্দ যা তার কাছে অন্য কিছু হতে পারে না। তখন সে আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদন করে ক্ষমা ভিক্ষা চায়। সে নিজের সতর্কতা নিয়ে দুনিয়াতে জীবন যাপন করে আল্লাহকে ভালবাসে। একজন ধর্মভীরু মুসলমান আল্লাহর কাছে আত্মসর্ম্পণ করলে আল্লাহই হয় তার রক্ষাকর্তা। কারণ সে নিজের ভালবাসা দিয়ে আল্লাহকে ভালবাসে।

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার কাছে রেজেক, ধন-সম্পদ, বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই চায় না। আল্লাহর কাছে তারাই আল্লাহর বান্দা যারা এক আল্লাহর বন্দেগী করে। সুতরাং তিনি চান তাঁর বান্দার ভালবাসার মধ্য দিয়ে আত্মসর্ম্পণ। আল্লাহ পাক ইনশান সৃষ্টি করেছেন কেবল তাঁর ইবাদতের জন্য, তাঁর বন্দেগীর জন্য। তিনি সকল বিষয়ে অভাব মুক্ত। আল্লাহর নিকট থেকে ইবাদতের বিধান এসেছে আমাদের মঙ্গলের জন্য। মানুষ আল্লাহর ইবাদত করলে তাঁর কোন মঙ্গল হয় না বরং মানুষ আল্লাহর ইবাদত করলে সে নিজেই মঙ্গল সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। একজন মুসলমান কোরআন হাদিসের আলোকে জীবন যাপন করে আল্লাহর কাছে আত্মসর্ম্পণ করবে এটাই আল্লাহর প্রত্যাশা। ধর্মকর্মের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায় আল্লাহ প্রেরিত ইসলাম ততই সমৃদ্ধি লাভ করে আপন সত্ত্বায়। আল্লাহ মানব জাতিকে খিদমত ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য সৃষ্টি করেন নি। সুতরাং আমাদের উচিত নিজেকে খিদমত ক্ষম করে তোলা। এরূপ অবস্থায় ধর্ম ধারণাকে সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট করতে প্রয়োজন ইসলাম ধর্মের উপর সঠিক জ্ঞান অর্জন।

ইসলামী মনন শক্তির সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলে মুসলমানী জীবন প্রবাহে ধর্মের পবিত্রতা রক্ষিত হয়। তখন ধর্ম দর্শনে কোন মলিনতা থাকে না এবং এর বাইরে অন্য কিছু চিন্তার অবকাশ নাই। ইসলামী

www.amarboi.org

সংস্কৃতি চর্চা হচ্ছে ধর্মের পুষ্টি সাধন। বস্তুতঃ এর প্রভাবেই মুসলমানের জীবনধারা প্রতিষ্ঠিত। ধর্মের সাথে সংস্কৃতির আকর্ষণ হচ্ছে পরকালের ঐক্য বন্ধন। ইসলামী সংস্কৃতির আদর্শে ধর্মের সাথে কর্মের মিলন ঘটাতে পারলে ধর্ম সমৃদ্ধিলাভ করে আল্লাহর বিধান মতে।

ইসলামী সংস্কৃতি ধর্মীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে অন্য কোন মতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলাম অবশ্যই আপত্তি তুলবে এর সকল ভ্রান্ত কার্য পরিক্রমায়। তবে মানব সংস্কৃতির ব্যবহার ইসলাম অবজ্ঞার চোখে দেখে না। আধুনিক সমাজে মানবজাতির নৈতিক চরিত্রের অগ্রগতির কর্মফলই হচ্ছে মানব সংস্কৃতি। মানব সংস্কৃতি হচ্ছে একাধিক ব্যক্তি জীবনে পরিমার্জিত রীতিনীতি এবং আচরণ যা সমাজ প্রতিভার বিকাশ ঘটায়।

জীবনবোধে সংস্কৃতির ফরমূলায় আর একটা দিক হচ্ছে মানসিক বিশৃঙ্খলা যার নাম অপসংস্কৃতি। যদি প্রশ্ন উঠে অপসংস্কৃতি কী? সংস্কৃতির নামে ইসলাম বিরোধী রীতিনীতি এবং ধর্মবিরুদ্ধ সামাজিক কার্যকলাপকে অপসংস্কৃতি বলা যায়। অপসংস্কৃতির সাথে ধর্ম এবং নীতিবোধের কোন সম্পর্ক থাকেনা। ইহা সব সময় ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ ও মুসলিম কলঙ্ক বিষগর্ভ। ইহা সমাজকে রুচিহীন করে নোংরামীতে ভরে তোলে। অপসংস্কৃতিতে বিবেক সৃষ্টি করার মতো কিছুই থাকে না। ইহা একটি অশ্লীল এবং অনিষ্টকর সমাজ পরিবেশ। অপসংস্কৃতির পরিবেশে মানুষ কখনও সুস্থ্য মনে বেড়ে উঠতে পারে না। অপসংস্কৃতির যাবতীয় রীতিনীতিগুলি পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতিয় জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অকল্যাণ বয়ে আনে। সমাজের বিভিন্ন পরিবেশে অপসংস্কৃতি লালন কিংবা অনুস্মরণ করা মারাত্মক ক্ষতিকর। ইহা মূলতঃ বিজাতীয় ভাবধারায় আকৃষ্ট প্রবণ। অপসংস্কৃতি বা অনৈতিক সংস্কৃতি সমাজে বহু লোকের ক্ষতি সাধন করে ধ্বংস বয়ে আনে। ইহা লালন এবং অনুস্মরণ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কোরআন হাদিসে যা বৈধ ঘোষণা করা হয়নি সে সব কাজ আমরা সংস্কৃতি হিসেবে মনে করতে পারি না। অপসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমাজ, দেশ ও জাতিকে নৈতিক অবনৈতিকতার দিকে এগিয়ে নেওয়া। ইহা মানব সংস্কৃতির বিকৃত রূপ। অপসংস্কৃতি গড়ে ওঠে অন্যায় আচার অনুষ্ঠানের পথ ধরে। অমার্জিত রীতিনীতির বিশৃঙ্খলা থেকে অপসংস্কৃতির জন্মলাভ ঘটে।

www.amarboi.org

অপর পক্ষে ইসলাম একটি পবিত্র ও সত্য ধর্ম। এই সত্য থেকে সত্যের মাঝে নিহিত আছে আল্লাহর বিধান। ইসলামী সংস্কৃতির মাঝে বিরাজ করে ইসলামী আদর্শ যা কালভেদ ছাড়িয়ে সংস্কৃতির সাথে ধর্মের মিলন ঘটায়।

সমাজে অন্যায় অবিচার বিদ্যমান থাকলে ধর্মীয় দর্শনে দেখা দেয় সংঘাত, ঘটে অনিষ্ট। ব্যক্তির এমন কোন অপছন্দনীয় কাজ করা কখনও উচিত নয় যা সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। মানুষের প্রত্যেকটি কাজে কোরআন হাদিসের অনুমোদন না থাকলে বুঝতে হবে এগুলো ইসলাম বহির্ভূত কার্যকলাপ। ধর্মের আলোকে সকল কার্য পালন হচ্ছে কল্যাণময় জীবন। হীন মূল্যবোধ থেকে সৃষ্টি হয় সমাজ উন্নয়নে অশুভ শক্তি, ফলে সমাজের উন্নয়ন হয় বাধাপ্রাপ্ত। অজ্ঞতা এবং ধর্মান্ধতা থেকে সৃষ্টি হয় সীমালঙ্ঘন প্রবৃত্তি। সীমালঙ্ঘন আল্লাহ্ কখনও পছন্দ করেন না। কোরআনে আল্লাহ্ এরশাদ করেনঃ "সীমা লঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ্ মোটেই ভালবাসেন না।" (সূরা মায়েদা, আয়াত-৮৭)।

জীবনের গতিশীলতার সাথে রয়েছে বাঁচার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনুপম প্রেরণা এবং এই প্রেরণা দ্বারা জীবন দর্শনের ছাপে গড়ে উঠেছে উন্নত সমাজ ব্যবস্থা। জীবনের ধর্মপুত গতিময় শক্তিই হচ্ছে মানুষের আত্মিক মূল্যবোধ। মানব জীবনে বেঁচে থাকার মাঝে অনেকগুলো উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে। আমরা যা করি, যা বলি, যা চিন্তা করি অথবা তার অস্তিত্ব সমর্থন করি এসবের মাঝে থাকতে হবে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সকল সম্ভাবনাময় দিক। আল্লাহর মানব সৃষ্টি একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। ইসলামী সংস্কৃতির দুগ্ধ স্তনদানে মানব জীবনের সকল সম্ভাবনাময় দিকগুলো লালিত পালিত হলে সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, রাজনীতি, শিল্পনীতি ও অর্থনীতি সবকিছুর অঙ্গনে কোরআন হাদিসের প্রতিফলনে বিকাশ ঘটে।

আল কোরআন মুসলমান জাতির কেবল ধর্মগ্রন্থই নয় বরং উহা মানব জীবনের উজ্জ্বলতম সাহিত্য ও সংস্কৃতি। ইসলাম ধর্মের পরিমণ্ডলে একজন মুসলমান তার জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একমাত্র খোলাপথ আল কোরআন ও হাদিস। আল্লাহর বিধান মতে প্রত্যেকটি সৎকর্ম সম্পাদনই হচ্ছে মানুষের ধর্ম পালন। কর্মের পরিমাপ দ্বারা কল্যাণের পরিমাণ মেপে

www.amarboi.org

আল্লাহ্ তাকে তার পালনকৃত কর্মের ফলাফল দান করেন। একজন মুসলমান আল্লাহর বিধান অনুসারে ইবাদত পালন করলে পরকালে সে বেহেশতের নিশ্চয়তা পায়। এটাই তার কর্ম পরিমাপের কর্মফল। একজন পুণ্যবানের অর্জিত পুন্য অনুযায়ী আল্লাহর কাছে সে তার পুরস্কার এভাবেই পেয়ে থাকে।

ধর্মের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসই হচ্ছে জীবনের সম্পদ। মুসলমানী জীবনাচরণে এই বিশ্বাস সম্পদটিকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন ধর্ম পালন। ধর্ম পালনে আছে শান্তি, আছে সুখ এবং আনন্দ। এতে মনে আনে সাধনাশক্তি এবং ইমানকে করে দেয় আলোক উজ্জ্বল যা বাঁচার জন্য সঠিক ও সত্যের পথ দেখায়। ইমানীশক্তি ছাড়া যেমন কোন ভালকাজ সম্পাদন সম্ভব নয় তেমনি জ্ঞান চর্চায় উদ্যম প্রচেষ্টা না থাকলে কোন কঠিনকে সহজ করাও সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ্ মানুষকে জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর শক্তি দান করে সমগ্র পৃথিবীটা তার অধীন করে দিয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় বলেছেনঃ "দেখব এবার জগৎটাকে, কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।" সুতরাং জ্ঞানের পুঁজি যার যত বেশী সে তত অজানা শক্তির পেছনে সৈনিক তেজে ছুটে চলে। উদ্যোগী মানুষ মাত্র জীবনের কঠিন কাজের জটিল সমস্যা অতিক্রম করতে পারে কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হলে।

সমাজ জীবনে যে সব লোকেদের ধর্মজ্ঞান লোপ পায় তারা প্রত্যেকেই অবচেতন মন নিয়ে অন্ধের মত পথ চলে এবং দুনিয়াদারির মোহে বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। সমাজে ব্যর্থ লোকদের মধ্যে এরাই তারা যাদের চরিত্রে মানবিক গুণাবলি বলতে কিছুই নেই। তারা কখনও ভ্রম থেকে সত্যের পথে আসে না। দোষদর্শী জীবনে তারা কোন সময় আল্লাহর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনা বলে তাদের মনের গভীরে সৃষ্টি হয় হাজারো পাপবোধ। তাদের দৈনন্দিন জীবনে হঠাৎ করে কোন বিপদ অথবা ভারী সমস্যা এলে ক্ষণিকের জন্য হলেও তারা ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাদের কাছে ভীতির আকর্ষণ যখন আরও ভয়ানক হয়ে ওঠে তখন তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় মগ্ন হয় কেবল বিপদ মুক্তির জন্য। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ মানুষকে যখন দুঃখকষ্ট স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠ ভাবে

www.amarboi.org

তার প্রতিপালককে ডাকে, পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে তাঁকে বিস্মৃত হয়ে যায়। (সূরা যুমার, আয়ত ঃ ৩৮)

এই শ্রেণীর বিভ্রান্ত মুসলমানেরা ধর্মজ্ঞানে অন্ধ হয়েও যখন কোন ক্ষতিকর সমস্যায় পড়ে তখন আল্লাহর স্মরণাপন্ন হয়। তার বিশ্বাস এই প্রার্থনায় তার বিপদ কেটে যাবে অথবা বিপদের বোঝা হাল্কা হয়ে পড়বে। বিপদ এলে তার মনের ভেতর জেঁকে বসে দুশ্চিন্তা। তখন তার না থাকে ক্ষুধা, চোখে না আসে ঘুম। সমস্যা সমাধানের জন্য তখন মনে পড়ে তার সৃষ্টিকর্তাকে। মহান আল্লাহ এই শ্রেণীর মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ "এবং মানুষকে যখন দুঃখ দৈন্য সম্পর্শ করে তখন সে শুয়ে বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে। অতঃপর যখন আমি তার দুঃখদৈন্য দূরীভূত করি, সে তার আগের পথ অবলম্বন করে যেন তাকে যে দুঃখদৈন্য স্পর্শ করে ছিল তার জন্য সে আমাকে ডাকেই নি" (সূরা ইউনুস, আয়াত-১২)। ধর্মে দুর্বল থাকা সত্ত্বেও সব কিছুর পরেও বিপদের সময় সে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পরে। আল্লাহ বলেন, "এরা তারা যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ জানেন," (সূরা নিসা, আয়াত-৬৩)।

মানুষের জ্ঞানশক্তি এবং সৎকর্ম দ্বারা গড়ে ওঠে সমাজ চেতনার অনুরক্ত আদর্শ। ব্যক্তিচরিত্র সুন্দর হলে জীবনের জন্য জীবন পথে দরদী প্রাণের অধিকারী হয়ে জীবন জীবিকায় পুণ্য অর্জন হয় সহজ। মহান আল্লাহ কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন, "তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্যে যা কিছু পূর্বাহ্নে সঞ্চয় করবে তোমরা তা আল্লাহর নিকট উৎকৃষ্টতা রূপে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিত পরিমাণে পাবে।" (সূরা মোজ্জামেল-আয়াত-২০) সুতরাং এই আয়াতের ধারাবাহিকতায় বলা যায় কোরআন এবং হাদীস ইসলামের একমাত্র পরিশুদ্ধ উপাদেয়।

পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন মানব জাতি তাদের অনুভূতি, জ্ঞান, বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে থাকে। তাদের বাঁচার পথে এই শক্তিগুলোকে কর্মের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে না পারলে জীবনে দেখা দেয় ক্ষতি। আর এই ক্ষতিই হচ্ছে ব্যক্তির জন্য জুলুম এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা। এই ক্ষতি পূরণের উপায় হচ্ছে জ্ঞান অর্জন। মানুষ যে পর্যন্ত সৎকর্ম করার ইচ্ছা না করে সে পর্যন্ত সে ক্ষতির মধ্যেই অবস্থান করে।

www.amarboi.org

আল্লাহ পাক এ বিষয়ে সময়কে সাক্ষী হিসেবে পেশ করেছেন। সময়ের গতি প্রবাহের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যে সব কর্ম, ঘটনা, দুর্ঘটনা এবং নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে ও পাচ্ছে তার সবই সময়ের কার্য ধারা হিসেবে আখ্যা দান করা হয়েছে। কোরআন মজিদে আল্লাপাক বলেছেন "সময়ের শপথ, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ। তবে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করছে তারা ছাড়া।"

সুতরাং মানুষের উত্থান পতনের কারণ হচ্ছে নিজের প্রতি জুলুম, কর্ম বিমুখ ও মূর্খতা। তবে যারা ঈমান নিয়ে সৎকর্ম করে তাদের কথা ভিন্ন। তাদের জীবন সব সময় নৈরাশ্য ও হতাশার পথ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথেই চলে। এরা সাফল্য অর্জনে সক্ষম। তারা সাবধান হয়ে পথ চলার কারণে বিপদগামী হয় না। তারা সত্য ও ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি রেখে জীবন যাপন করে।

বর্তমান কালে মুসলমান জাতির একটা বিশেষ অংশ অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় ইসলাম প্রেমিক মুসলমানেরা যুগধর্মী মূল্যবোধের চেতনায় ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়ের অভিশাপে জর্জরিত হয়ে পড়ছে। মুসলমান সমাজে তাদের দ্বারা ধর্মের উপর যাতে কোন বিরূপ আঘাত না আসে সে দিকে ইসলাম প্রেমিকদের সবিশেষ নজর রাখতে হবে সবক্ষেত্রে, সব কাজে এবং সব অবস্থায়। সমাজে অশিক্ষিত মুসলমানেরা তাদের ধর্ম বোধটাকে বাদ দিয়ে জীবনকালীন সময়ে পার্থিব নেশার ঘোরে থাকে মত্ত। একারণে ধর্ম পালন তাদের কাছে একটা জটিল বিষয়। ধর্মটা তাদের কাছে একপেশে হওয়ার কারণে জীবনের ব্যয়ীত সময়টুকু মানসিক বিশৃঙ্খল অবস্থায় কেটে যায়। ধর্মটাকে ভাল না লাগায় তারা মধুময় ইসলাম ধর্মের স্বাদ গ্রহণে হয় ব্যর্থ। এ কারণে তারা ধর্মচর্চা দেয় ছেড়ে। ফলে পাপ চেতনায় তাদের জীবন থাকে আচ্ছন্ন।

সত্যের পথে নির্মল জীবন সকল অবস্থায় কল্যাণ সাধন বিকাশে প্রেরণা যোগায়। অপর পক্ষে ধর্মবুদ্ধিহীন জীবন মানে একটা জরাজীর্ণ জীবনাবস্থা যা অকেজো বীজের মতো কোন দিন অঙ্কুরিত হয় না। বিষয়টা আর একভাবে বলা যায়, ধর্ম অর্থাৎ শরিয়ত জীবনে সাফল্য অর্জনের বিধিব্যবস্থা যা পালন করলে মানুষের কল্যাণ হয়, না করলে অকল্যাণ। সত্য প্রেরণার মাধ্যমে জীবনের শরিয়ত হচ্ছে পদ্ধতির ছকে সাফল্য মণ্ডিত করতে

www.amarboi.org

পারলে নতুনের সন্ধান পাওয়া যায়। কারণ ইসলাম আত্মিক আদর্শ পালনের ধর্ম। একারণে মুসলমানী জীবন ব্যবস্থায় যাবতীয় সৎকাজ ইসলামের বিধিব্যবস্থা দ্বারা পরিবেষ্ঠিত।

আমরা পৃথিবীতে বাঁচার তাগিদে মজুরীর মানদণ্ডে কাজ করে প্রাপ্য মজুরীর সঙ্গে কর্মফলের বিনিময় যাচাই করে থাকি। কাজ সাঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপভোগের জন্যে আমারা কাজের প্রাপ্য পেতে চাই। আল্লাহর বিধানে মঙ্গলময় কাজের প্রাপ্য যেমন আনন্দের তেমনি নিন্দনীয় কাজের প্রাপ্য হয় বড়ই দুঃখের। কোরআনে আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ "প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে" (সূরা যুমার, আয়াত ৭০)। পরিশ্রমের মাধ্যমে আমরা যা কিছু অর্জন করি তা সাময়িক হলেও এর ফলাফল ইহকাল এবং পরকালের প্রাপ্য হিসেবে মহান আল্লাহর কাছে জমা থাকে। ইসলাম ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি কাজ একজন মুসলমানকে পরকালের মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। ইসলামী সংস্কৃতিচর্চা দ্বারা আমাদের ইবাদতের ফলাফল যা মজুরীর মানদণ্ডের মতো নেকী সমৃদ্ধ আমলনামা অর্থাৎ কার্যলিপি। একজন প্রকৃত মুসলমানের আমলনামা মহাকালের জীবন বিধানে চিরসত্য এবং ঐশী শান্তি লাভের জন্য প্রমাণ পত্র। আমলনামা কার্যফল অর্জনের জন্য আল্লাহ পাক ইসলামধর্মকে ভারী বোঝা কিংবা জুলুম হিসেবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেননি। আমরা যতটুকু আত্মসম্পর্ণ করতে পারি ঠিক সেই অনুপাতে ধর্মপালনে আল্লাহর নির্দেশ আছে। আমরা যতটুকু আত্মসম্পর্ণ করতে সক্ষম বুঝতে হবে আমরা ঠিক ঐ পরিমাপের মুসলমান। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ এরশাদ করেন, "আমি কাকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। এবং আমার নিকট এক গ্রন্থ আছে যা প্রকৃত স্বাক্ষ দেয় এবং ওদের প্রতি জুলুম করা হবে না" (সূরা মোজ্জামেল, আয়াত-৬২)।

অনেক অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু অশিক্ষিত এবং ধর্মরুগ্ন মুসলমান তাদের ধর্মবোধ চেতনাটাকে নিজেদের মধ্যে উজ্জীবিত করতে পারে না। যার ফলে সৃষ্টিধর্মী সত্যকে উপলব্ধি করার মতো কিছুই কুল কিনারাও করতে পারে না। ধর্মীয় দৃষ্টিতে ধর্ম জিনিষটা জীবনের সর্ব সত্য ঐশী বিধান। ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান আল্লাহ এবং রসূলের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শ্রেণীর মুসলমানদের ধর্মের প্রতি আকর্ষণ না থাকার কারণে

www.amarboi.org

তাদের জীবন চক্রের বহু কিছু বিনষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং একটা জাতি গোষ্ঠি যখন নিজ ধর্মকে ভুলতে বসে অথবা অবহেলায় ধর্ম চর্চার অভ্যাস ছেড়ে দেয় তখন তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির কথা এসে যায়। এমতাবস্থায় তাদের পরকালের মুক্তির পথও হয় রুদ্ধ। ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের অভাবে তাদের ধর্মভক্তি এবং বিশ্বাসের ভবিষ্যতে তা হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষা এবং নৈতিক আদর্শ একটা ন্যায় সঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু কারণ ইসলামী জীবনাদর্শ ব্যতীত আল্লাহর রহমত লাভ করা সম্ভব নয়। ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতির সমাহার মাঝে নিহিত আছে মুসলমান জাতির ধর্মকর্ম এবং জ্ঞান বৈশিষ্ট্যের নিখুঁত জীবন ব্যবস্থা। একারণে শিক্ষা সকল সময়ে সংস্কৃতির এবং জ্ঞানের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত।

মানুষ সামাজিক জীব। লক্ষ লক্ষ বছর থেকে মানুষ সমাজ গঠন করে একত্রে বাস করে আসছে। সমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে সমাজকর্ম, সমাজনীতি, সমাজতন্ত্র, সমাজবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, সমাজবিধি এরকম অনেক সমাজ কল্যাণ সংস্কার ও সমাজ শাসন ব্যবস্থা। তাই ব্যক্তির কাছে আধুনিক সমাজের এতো সমাদর। কালক্রমে সমাজ ব্যবস্থার পথ ধরে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সামাজিক শিষ্টাচার।

সমাজে বাঁচার জন্যে মানুষের সমাজ আওতায় জীবন ধারণের প্রথম চাহিদা অর্থ। সমাজের প্রতি স্তরে জীবন জীবিকায় চাহিদার জন্য টাকাকড়ির গুরুত্ব সকলেই বোঝেন। মরুঅঞ্চল, বনাঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চল, সমুদ্র ও নদীপ্রান্তিক অঞ্চল থেকে সমভূমি অঞ্চলের মানুষ যেখানেই বসবাস করুক সকল ক্ষেত্রে এবং সকল সময়ে জীবিকা নির্বাহের জন্যে অর্থের প্রয়োজন। উপার্জন না থাকলে জীবন সংগ্রামের সকল গতি একদিন ফুরিয়ে যেত।

ভৌগোলিকতার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন। সেই সাথে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য আয় ব্যয়েরও একটা সুনির্দিষ্ট পার্থক্য আছে। মরু অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থায় অর্থের চাহিদা এবং সমভূমিতে বসবাসকারীদের অর্থাঙ্কের প্রয়োজন সমান নয়। সমভূমি অঞ্চলে বসবাসকারীদের দু'পর্যায় শ্রেণীবিন্যাশ করা যায়। নগর অর্থ ব্যবস্থা ও পল্লী অর্থ ব্যবস্থা। শহুরে জীবন ব্যবস্থা অপেক্ষা পল্লী সমাজ জীবন ব্যবস্থায় মানুষের আর্থিক অবস্থা বড়ই করুণ। তারা দরিদ্র,

www.amarboi.org

অসহায় এবং সেখানে বেশীর ভাগ মানুষ অশিক্ষিত। পল্লী অঞ্চলে গরিবী দুঃখকষ্ট সব সময় তাদের বেদনা ভারাক্রান্ত দেহমনে হানে আঘাত এবং দারিদ্র আক্রমনের কামড় তাদের জন্য বড়ই যন্ত্রণাদায়ক।

সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য নতুন কিছু নয়। এটা হাজার হাজার বছর পূর্বের সমাজ দুষ্ট ব্যবস্থা। এই অসম অর্থ ব্যবস্থার জন্য ধনী গরীবের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিভেদ ও ভেদাভেদ। সমাজে এক শ্রেণী মানুষ আছে যারা ভোগবিলাসে বিভোর হয়ে ঘর সংসারে শ্রীবৃদ্ধির আনন্দে সুখী জীবন যাপন করে। তারা সুখের স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতায় থাকে মত্ত। আনন্দে মেতে থাকাটাই যেন তাদের সুখ সাধনার জীবন। সুখের আনন্দ, সম্পদের আকাঙ্ক্ষা এবং ভোগের তৃপ্তি এগুলো তাদের জীবনকে বিভোর করে রাখে সারাক্ষণ। ধনীদের বৈচিত্র্যময় সুখী জীবনের পাশে আর এক শ্রেণীর দুস্থসমাজে গরীব দুঃখীরা ভাতকাপড়ের অভাব অনটন দূরীকরণের জন্যে শ্বাসরুদ্ধ যন্ত্রণা ভোগ করে সারাটা জীবন। তারা সব সময় পেটের চিন্তায় থাকে উদ্বিগ্ন। সমাজে আর এক শ্রেণীর ধনী ব্যক্তি আছে যারা বহু ভঙ্গিমায় ভোগলালসায় চর্বচোষ্যে উদর পূর্ণ করে তখন সমাজের দুঃখীদরিদ্র প্রতিবেশীরা ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রচেষ্টায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও দুমুটো অন্ন সংস্থানের কষ্টে হিমশিম খায়।

মানুষে মানুষে বিভেদ, মানুষে মানুষে বৈষম্য, মানুষে মানুষে ধনী গরীব সবই সমাজ ব্যবস্থায় অর্থশক্তির কুপ্রভাব। ইসলাম সমাজ বৈষম্য আধিক্যের দূরত্বকে কখনও স্থান দেয় না। এটাই হলো বর্তমান সমাজে ধনীর ভোগবিলাস এবং দরিদ্রের ক্ষুধা কষ্ট ব্যথার সুস্পষ্ট বৈষম্যমূলক চিত্র। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আছে ন্যায় ভিত্তিক জীবনদর্শন, আছে ধনী গরীবের ন্যায় নীতিতে সাম্যের অনুশাসন।

সমাজ থেকে সমাজ ব্যাধি দূরীকরণের জন্য আল্লাহ পাক আমাদের মাঝে দিয়েছেন আল কোরআন যা ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সকল সমস্যা সমাধানের একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল জীবন বিধান।

অর্থবান এবং অর্থহীন সমাজ ব্যবস্থায় ধনী গরীবের বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্যে আল্লাহ পাক যাকাত এবং দান খয়রাতের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ ধনীর যাকাতকে করেছেন ফরজ এবং দান খয়রাতকে করেছেন

www.amarboi.org

সমাজ কল্যাণে পুণ্য লাভে কর্তব্যপালন। আল্লাহ পাক দুঃখী মানুষকে ধনীর অর্থের যাকাত এবং দানকে হকদারী সত্ত্ব প্রদানের অধিকার দিয়েছেন। গরীবের ব্যথা বেদনায় সমব্যথী হওয়ার জন্য দান খয়রাতকে আল্লাহ পুণ্য লাভের পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছেন। যাকাত ধনীর কাছ থেকে আদায় করতে হয় এবং তা গরীবদের মধ্যে বন্টনে আল্লাহর কঠোর নির্দেশ আছে। স্বচ্ছল ব্যক্তির আয়ের একটা অংশ দুঃস্থ দুঃখী, দরিদ্র ভিখারী, অন্ধআতুর, কষ্টপীড়িত, আয় রোজগারে অক্ষম অথবা অতি নিম্ন আয়ের মানুষকে দান আকারে ব্যয় করা ইসলাম পুণ্য লাভের মর্যাদা দিয়েছে।

ইসলামে যাকাত ধনী মুসলমানের জন্যে ফরজ করা হয়েছে, যাকাত প্রদান ধনীর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি বরঞ্চ ইহা আল্লাহর আইন দ্বারা বেষ্টিত করা হয়েছে। এজন্য এর গুরুত্বও সর্বাধিক। যাকাত ইসলামে শ্রেষ্ঠ দান। যাকাত ধনী ব্যক্তির জন্য ফরজ। ধনীব্যক্তি যাকাত দেওয়া থেকে বিরত থাকলে সে কখনও বেহেশত লাভের আশা করতে পারে না। ধনীর উদ্বৃত ধনের নির্দিষ্ট অংশ যাকাত প্রদানে আল্লাহ ফরজ করেছেন। যাকাত প্রদানে সীমালঙ্ঘনকারীর জন্য আল্লাহ কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা নির্ধারণ করে রেখেছেন যেমন নামাজের ক্ষেত্রে এ কথা বলা হয়েছে। নামাজ যেমন নামাজীর শারীরিক ইবাদত তেমনি যাকাতও হচ্ছে ধনীর জন্য অর্থসম্পদের ইবাদত।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় সামাজ সংস্কৃতির অন্যতম দিক হচ্ছে অর্থনীতিতে একটা ভারসাম্য ধরে রাখা। সাম্যের আঙ্গিকে ইসলামী অর্থনীতিতে অসমতার কোন সুযোগ নেই। ইসলাম সমাজ বৈষম্যনীতি স্বীকার করে না বলেই মানব কল্যাণ বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম সুন্দরের মাঝে সমন্বয়ের ধর্ম। এই সমন্বয়ের জন্য ইসলামকে বলা হয় শান্তির ধর্ম। এটাই ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ এবং সকল নৈতিক কাজের লক্ষ্য বস্তু।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ দান সম্পর্কে তাঁর বান্দাদের প্রতি কর্তব্য পালনে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ "যারা আল্লাহর পথে আপন ধন ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না এবং (ঐ দানের বদলে কাউকে) কষ্টও দেয় না তাদের পুরস্কার তাদের

www.amarboi.org

প্রতিপালকের কাছে আছে। তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" (সূরা বাকারা, আয়াত-২৬২)।

"হে বিশ্বাসীগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট কর না ঐ লোকের মত যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে না।" (সূরা আল বাকারা, আয়াত-২৬৪)।

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি জমি হতে তোমদের জন্য যা উৎপাদন করে দিই, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা দান কর। মন্দ জিনিষ দান করার সংকল্প করো না-যেহেতু তোমরা উহা গ্রহণ কর না, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক এবং জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।" (সূরা আল বাকারা, আয়াত-২৬৭)।

মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উদ্দেশ্য করে বলেন-"তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে প্রজ্ঞা প্রদান করা হয় তাকে নিশ্চয় প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুতঃ শুধু জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। যা তোমরা দান কর অথবা যা কিছু তোমরা নজর মানত কর, আল্লাহ্ তা অবশ্যই জানেন। এবং অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নাই" (সূরা আল বাকারা, আয়াত-২৭০)।

"তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে উহা ভাল, আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাব গ্রস্তকে দাও তবে তা তোমার জন্য আরও ভাল। এবং এতে তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করবেন, বস্তুতঃ তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা অবহিত" (সূরা আল বাকারা, আয়াত-২৭১)।

"দান অভাবগ্রস্ত লোকেদের প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে জীবিকার সন্ধানে ঘোরাফেরা করতে পারেনা, কিছু চায় না বলে অবিবেচক লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা লোকের কাছে নাছোড় হয়ে যাচঞা করে না। তোমরা যা কিছু দান কর, আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত" (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৭৩)।

"যে সকল লোক রাতদিন গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন দান করে,

www.amarboi.org

তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। সুতরাং তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা কোন দুঃখ পাবে না" (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৭৪)।

ইসলামে সম্পদ গচ্ছিত রাখা ঘৃণ্য অপরাধ। একজন মুসলমান তার সম্পদ নিজ অধিকারে গচ্ছিত রেখে মালিক হিসাবে সমগ্র সম্পদ অথবা ঐ সম্পদ থেকে আহৃত আয় কেবল নিজের সুখ সুবিধায় ভোগ করবে অথচ আল্লাহ্‌র পথে তা ব্যয়ে কার্পণ্য করবে যা ইসলামী জীবন বিধানে গুরুতর অপরাধ। এই ব্যয় কার্পণ্যের দহন জ্বালার কথা আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন ঃ "যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না, ওদের মর্মদন্তু শাস্তির সংবাদ দাও। যে দিন নরকের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে চিহ্ন দেওয়া হবে (সেদিন বলা হবে) এটিই তোমরা নিজের জন্য পুঞ্জীভূত করেছিলে সুতরাং যা তোমরা পুঞ্জীভূত করতে তার আস্বাদ গ্রহণ কর" (সূরা তওবা, আয়াত-৩৪-৩৫)।

সূরা তওবায় আল্লাহ্ আর এক পর্যায় দান খয়রাতের অংশীদারিত্ব ও প্রাপ্য সম্পর্কে বলেন "দান খয়রাত তো কেবল নিঃস্ব অভাবগ্রস্ত ও দান খয়রাতের কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য যাদের মনকে (ইসলামের প্রতি) অনুরাগী করা আবশ্যক তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণে ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী ও পর্যটকদের জন্য। এ আল্লাহ্‌র বিধান" (সূরা তওবা, আয়াত-৬০)।

ইসলামে দান খয়রাত ব্যয়ের সীমা অতিক্রম করাকেও নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কারণ ব্যয়াধিক্য অন্যের দ্বারস্থ করে দেয়। এরূপ দান আল্লাহ্ ভালবাসেন না। দান খয়রাত ধর্ম নির্বিশেষ সকল দুঃস্থ গরীব ও অসহায় মানুষের প্রাপ্য। কিন্তু ইসলামী রীতিসিদ্ধ অনুযায়ী যাকাত কেবল মাত্র ধনী মুসলমানের নিকট হতে গরীব এবং দুঃস্থ অসহায় মুসলমানের প্রাপ্য। যাকাতের অর্থ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেদের জন্য দান করা ইসলামের বিধি অনুসারে নিষিদ্ধ। যাকাতের অর্থ যাকে দিলে ইসলামের হিত সাধন হয় এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া উত্তম। যাকাত হচ্ছে মুসলিম সমাজের আর্থিক কল্যাণের স্তম্ভ যা সমাজ বৈষম্যের পথকে রোধ করে।'

www.amarboi.org

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ যাকাত এবং দান খয়রাত সম্পর্কে যে সকল নির্দেশ এবং বাণী দিয়েছেন তা মুসলমান সমাজে দুঃখী গরীবদের কষ্ট লাঘবের একটি সুন্দর অর্থকারী ধর্ম ব্যবস্থা। আগেই বলেছি সকল দানের মধ্যে যাকাত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ দান। ধনীর পবিত্র টাকাকড়ির একটা অংশ যাকাত অথবা দান আকারে দুঃস্থ গরীব সমাজে অসহায় মানুষের গৃহে প্রবেশ ঘটলে তা একদিকে যেমন গরীবী কষ্ট মোচন করে তাদের বেঁচে থাকার শক্তি এবং অনুপ্রেরণা জোগায়, তেমনি দানকারীর আত্মার সাথে তার অবশিষ্ট গচ্ছিত সম্পদকে করে দেয় পূতপবিত্র। দানকারী ব্যক্তি ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত মোমনে হিসেবে তার সৎ কাজের পুরস্কার বহুগুণে আল্লাহর নিকট থেকে বর্ধিত আকারে পুণ্য লাভ করে থাকে।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় সাম্য একটি মূল নীতি। এ কারণে ইসলাম সাম্যকে সবার জন্য ফরজ করে দিয়েছে। মুসলমান সমাজে সাম্য এবং মানবিক অধিকার একটি মহৎ আদর্শ। এই আদর্শের বিকাশ পথে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ধনী গরীবের মাঝে সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে উঠেছে। ইসলামের নিয়মকানুনগুলো সমাজ জীবন ব্যবস্থায় প্রতিফলন ঘটলে সমাজে ফিরে আসে শান্তি এবং স্থিতিশীলতা। ইসলামের প্রতিটি চিন্তায়, প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি আচরণে, এক কথায় সৎ জীবন যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মিশে আছে কল্যাণ, শান্তি এবং ভালো কাজের প্রেরণা। শান্তিময় সকল কল্যাণ কাজে নিহিত আছে সত্য পথের জীবনাদর্শ যার অপর নাম ইসলামে প্রেম এবং ভক্তি বরঞ্চ আরও অনেক কিছু। মানব জীবনের প্রত্যেকটি ভালো কাজ সুগন্ধময় এবং এর সর্বাঙ্গে মিশে থাকে পবিত্রতার গন্ধ অর্থাৎ Every Good Deed Is The Perfume in Life.

আল্লাহ পাক কোরআনে এরশাদ করেন ঃ "যে সৎকাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দকাজ করলে তার প্রতিফল সেই ভোগ করবে" (সূরা হামীম সিজদা, আয়াত ৪৬)।

মানুষের দুঃখদৈন্য অপসারণের জন্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় দারিদ্রের অধোগামী রোধে যাকাত এবং দান খয়রাত একটি গুণগৌরবময় কার্যব্যবস্থা। ব্যক্তিমালিকানায় ব্যক্তি তার ধনসম্পদ খেয়ালখুশী মত উজার করলে এবং সবটুকু নিজে ভোগ করলে ইসলাম ধর্মে উহা অপরাধ এবং

www.amarboi.org

ইসলামের কাঠামোয় হীনমনা অভ্যাস। ইসলামের আদর্শে ধনীর অর্জিত অর্থ সৎপথে ব্যয়িত হলে দরিদ্র মুসলিম পরিবারগুলোর মাঝে বাঁচার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তখন সমাজ সংস্কৃতির বন্ধনে ইসলামী অর্থনীতি ব্যবস্থা জোরদার হয়। একারণে যাকাত সামাজিক কল্যাণের রক্ষক এবং রাষ্ট্রীয় উন্নতির পরিপোষক। মানব জাতির আর্থিক উন্নতি এবং ক্রমবিকাশ ঘটানোর দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই। দেশের সুশাসক কর্তৃক যাকাতের অর্থ গরীবদের জন্য ব্যয়িত হলে দেশের অর্থনীতিতে একটা পরিবর্তন সাধিত হয়।

পার্থিব প্রয়োজনে গরীবের দুঃখকষ্ট মোচনের জন্যে ধনীর ধনদৌলত আল্লাহর একটি শ্রেষ্ঠ দান। আল্লাহর বিধান মতে ধনীর ধন সঠিক পথে ব্যয়িত হলে গরীবের জীবনে সুখ সুবিধা অঙ্কের উত্তর মেলে। ইসলামে যাকাত এবং দান খয়রাত গরীব দুঃস্থদের অর্থনৈতিক কষ্ট দূরীকরণে একটি ধর্মসংস্কৃতি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন ধনী মুসলমান ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে তার আর্থিক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্ব সবই ইসলামে প্রগতিশীল জীবন ব্যবস্থা। একারণে ইসলামী সংস্কৃতি একটা প্রগতিমুখী অনুশাসন।

ইসলামী সমাজ জীবন ব্যবস্থায় কোরআন এবং হাদিস মানুষকে সকল অন্যায়, অবিচার এবং অনৈতিকতা থেকে উদ্ধার করে আলোর পথ দেখায়। মহান আল্লাহ প্রথমতঃ মানুষকে যা দান করেছেন তা হলো বিবেকলব্ধ জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি, এজন্য মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। জ্ঞান কেবল মানুষের জন্য যে কারণে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতিনিয়ত নবনব জ্ঞানে জন্ম লাভ করে। সুতরাং মহৎ আদর্শের অনুশীলনই হচ্ছে বিবেকের সদব্যবহার।

এখন কালচারের কয়েকটা রূপরেখার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। আগেই বলেছি কালচার হচ্ছে মানব সমাজে অগ্রগতির উৎকর্ষ সাধন বা অনুশীলন। কালচারের ভিন্নভিন্ন অনুশীলনগুলো আপন বৈশিষ্ট্যে বিকাশমন্ডিত হলে ধর্মীয় প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তখন মানব জীবনে ধর্মের সাথে কর্মের ঐক্য সাধন ঘটে। ধর্ম এবং সংস্কৃতি এ দুয়ের সাথে মানব জাতির একটা সম্পর্ক বিজড়িত আছে। একারণে ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে একইভাবে গড়ে নিতে হয়। ধর্মীয় আদর্শে মুসলিম সমাজে সভ্যতার বিকাশ ঘটানোই হচ্ছে ইসলামী কালচারের

www.amarboi.org

কার্যক্রম ব্যবস্থা। একারণে ইসলামে বিভিন্ন কালচারের বৈশিষ্ট্যসমূহ একান্ত ধর্মনির্ভরশীল। ধর্ম এবং কর্ম হচ্ছে মানুষের আদর্শিক লক্ষ্যবস্তু যা আত্মিক ও পারলৌকিক মুক্তি সাধনায় শান্তিময় জীবন। একারণে কালচার একটি স্বনির্ভরশীল সমাজ ব্যবস্থা।

মানব সমাজে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উন্নতি নির্ভর করে জোরালো আলোর মতো বিদ্যাশিক্ষার উপর এবং সূর্যরশ্মির মতো জ্ঞান অনুশীলন দ্বারা। সংস্কৃতি অর্থাৎ কালচার একটা শব্দ মাত্র, একটা প্রকাশ। এই শব্দটির ভেতরে নিহিত আছে সমাজ সৃষ্টির বিকাশ। কালচার একটি সুনির্দিষ্ট উন্নত সমাজ প্রক্রিয়া। ইহা সমাজ জীবনকে সৃষ্টি বিকাশে সুন্দর করে গড়ে তোলে। কালচার সমাজের অপরিণত রুচি বোধকে পরিণত মনন গঠনে সাহায্য করে। সার্বিক সত্তা বিকাশে ভিন্নভিন্ন কালচারগুলো হচ্ছে সামাজিক কালচার, নৈতিক কালচার, বুদ্ধিবৃত্তি ও রাজনৈতিক কালচার এবং আধ্যাত্মিক (ইসলামী) কালচার। শিক্ষা এবং কালচার কোন ভিন্ন অস্তিত্বের রূপ নয়। শিক্ষা হচ্ছে কালচারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এরা একত্রে সমাজ প্রগতির মূল ধারায় বেড়ে ও বয়ে চলে।

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি একই তালে, একই সময়ে, একই ভাবে মানুষের জ্ঞান চেতনার অনভূতিতে সমাজ সংস্কারের বিকাশ ঘটায়। এক এক দেশে এক এক নিয়ম। প্রত্যেক মানব জাতির শিক্ষা এবং সংস্কৃতি এক, সমার্থকও এক, বিকিরণ এবং উন্নয়ন একই গতিতে বেগমান। কিন্তু ভাষা এবং সংস্কৃতি কখনও এক নয়। ভাষা এবং সংস্কৃতির আবর্তন ও পরিবর্তন একতালে চলে না। একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীলও নয়। সুতরাং ভাষা এক হলেই সংস্কৃতি এক হবে তেমন কোন সমর্থন আছে বলে মনে হয় না।

সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটলে কালচারেরও প্রসার ঘটে। কালচারের কাজ হচ্ছে মানব মনের ঐহিক মনোবৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ ঘটানো। মানুষ সামাজিক জীব। পশুজীবে কোন সমাজ সংস্কৃতি নাই। মানব জীবনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে সমাজগত দ্বন্দ্বের পরিবর্তন সাধন। এই পরিবর্তন সাধিত হলে সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতিনীতি এগুলি সমাজ আদর্শ রূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

সমাজে কালচারের উন্নতিকে নিশ্চিত করার জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে জাতির শিক্ষার দিকে মনোযোগ সৃষ্টি এবং চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন।

www.amarboi.org

জাতিকে উন্নতি, প্রগতি এবং বিকাশের দিকে এগিয়ে নিতে হলে দরকার আদর্শ শিক্ষা সংস্কৃতি।

যে সমাজে দুঃখ দারিদ্রের অভিশাপ সমাজ জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করে রাখে সেই সমাজে শিক্ষা সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে সৃষ্টি হয় চরম দুর্ভোগ জ্বালা। তখন ঐ সমাজ হয়ে পড়ে ঘুনে ধরা দুর্বল সমাজ। সমাজে শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটলে জাতির সৌভাগ্য নির্মিত হয়। অপরদিকে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রসার লাভ না হলে সমাজের নিচু তলার বাসিন্দা হিসেবে তাদের বৈষম্যের অগ্নিদগ্ধ জ্বালায় জীবন যাপন করতে হয়।

শিক্ষা সংস্কৃতি একটি জাতির টিকে থাকার শক্তিস্তম্ভ। এই শক্তিস্তম্ভ যত মজবুত হবে মানব সভ্যতা এবং কালচারের অস্তিত্বও হবে ততো হিমালয় বেষ্টিত। শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাব জাতিকে বৃহত্তে রূপান্তর ঘটিয়ে সমাজ বিপ্লব বিকাশে শোভিত করে।

সামাজিক কালচারের দিকে আলোকপাত করলে বুঝা যায় সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদীর ভাব ধারায় জীবনের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়। মানুষ সমাজ গণ্ডীর মধ্যে বসবাস করে বলে কলুষমুক্ত সুন্দর সমাজ প্রত্যেক সংস্কৃতিমনা ব্যক্তির কাম্য। সমাজ সভ্যতায় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটলে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ হয় সহজ। জাতি তার নিজস্ব সংস্কৃতির উপকরণ দিয়ে সমাজকে সুসামঞ্জস্যভাবে সাজাতে পারলে সমাজ সংস্কৃতির অগ্রগতি হয় ত্বরান্বিত। সর্বোপরি সামাজিক পরিবেশে মানুষের ব্যবহারিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সভ্য সমাজগতির সারমর্ম।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে মানুষ জন্ম নেয়, বড় হয়, চলাফেরা করে এবং বসবাস করে জীবন কাটায় এই সমাজ অভ্যন্তর গর্ভে। তাই এই সমাজকে নিয়ে মানুষের বহু সমস্যা, আছে বহু আশা আকাঙ্ক্ষা এবং অনেক কল্যাণ অকল্যাণ। এ জন্যে সমাজের কর্মভার ব্যবস্থায় জ্ঞানী লোকেদের থাকে মুক্ত দৃষ্টি। এটাই তাদের মূল্যবোধের পরিচয়। একারণে মানুষের সকল কর্মক্ষেত্রে সফলকাম হওয়ার জন্য প্রয়োজন ইসলামী শক্তিতে আত্মবিশ্বাস। আল্লাহর অশেষ করুণায় মানব জীবনটা প্রচুর সম্পদে ভরপুর। আত্মবিশ্বাস, আত্মজ্ঞানশক্তি, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্মসম্মান এই চারটি সত্তা ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদাপূর্ণ কার্যবিধি যা নৈতিক চরিত্রে

www.amarboi.org

অন্তর্ভুক্ত। এই সত্তাগুলির উপর নির্ভর করে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে কাজ আরম্ভ করলে আল্লাহ তার জন্য হয় সাহায্যকারী। আল্লাহ মোমেন ব্যক্তির জন্য ক্ষমাশীল এবং কৃপাময়। চাই ইসলাম মানব সমাজের বাইরে কোন পৃথক বস্তুসত্ত্বা নয়। সমাজের ভেতর মানুষের অর্থনীত, রাজনীতি, শিক্ষানীতি এবং সর্বোপরি ধর্মনীতি অর্থাৎ কোরআনি নীতি সবই মুসলমানী জীবনে শান্তি স্থাপনের মানদণ্ড।

সমাজে আছে পাপপুণ্যি, আছে ভোগলালসা এবং ধর্মচেতনার বিকাশ, আছে মানব প্রেমপ্রীতির ভালবাসা। এগুলোকে জীবনসাথি করে মানুষ সমাজ গড়ে বেঁচে অছে আশা আকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বল উদ্দীপনা নিয়ে। আবার এই সমাজেই বিরাজ করছে হতাশা, নিস্পেষণ, নিপীড়ন এবং দুশ্চিন্তাময় জীবন। মানুষ যখন স্নায়ুবিক বিকারে ভোগে তখন তার মধ্যে উদ্রেক হয় ভয়ভীতি। তখন তার জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কোন কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কৌশলে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। ব্যক্তি জীবনে দুশ্চিন্তা ভয়ানক আকার ধারণ করলে অনেক সময় এর অবসান হয় জীবনের মৃত্যু ঘটিয়ে।

কোন কোন সময় মারাত্মক দুশ্চিন্তা এবং মনোস্তাত্মিক জটিলতায় ব্যক্তিমৃত্যুর সাধারণ কারণ হলেও হতাশায় ধৈর্য্য হারিয়ে কারো কারো জীবনে আত্মগ্লানির মৃত্যু ঘটে যায়। এই আত্মগ্লানির আত্মহত্যা ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মশূন্য অর্থাৎ ঈমানহীন মৃত্যু যার পরিণতি নরক রাজ্যে শাস্তির চির অবস্থান। সমাজ মানুষের সুখ দুঃখের ধারক এবং বাহক। সমাজ জীবনের সাথে ইসলামী সংস্কৃতির মিলন না ঘটলে ব্যক্তি জীবন ব্যবস্থায় দেখা দেয় অনেক জটিলতা। তখন জীবনে ডেকে আনে দুর্যোগ এবং দুর্ভোগ। জ্ঞানহীনতার কারণে তখন তার সমস্যাগুলো মননসংকট সৃষ্টির মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জগতে যারা সাধারণের মাঝে জন্মগ্রহণ করে এবং ঐ সাধারণদের মাঝে বেড়ে উঠে, তাদের জীবন সংগ্রামে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা থাকলে ধ্বংসের পথে পা বাড়াতে হয় না। ইসলামের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে সমাজ জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করার অর্থ সমাজ সংস্কৃতির বিলোপ সাধন। একজন মুসলমান যদি তার নিজের মধ্যে ইসলামী বোধশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে তাহলে সে শান্তিময় জীবনের সন্ধান পায়। এ জন্যে দারকার ইসলামী দর্শনে

www.amarboi.org

আত্মপ্রত্যয় এবং মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন।

ইসলাম মুসলমানের জন্য সহজ, সরল ও সঠিক ধর্মপথ। মুসলমানী জীবন চরিত্র গঠনের জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত নিয়মনীতির দিকগুলো সুস্পস্ট ভাবে নির্দেশিত হয়েছে আল কোরআনে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আইন মেনে চললে কোথাও কোন সমস্যা এবং জটিলতা থাকতে পারে না। সমাজ তথা সংসার জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ থাকলে ব্যক্তিজীবন হয়ে ওঠে নির্মল। সংসার জীবনে মেলামেশায় সকল ক্ষেত্রে একজন মুসলমানের উচিত পানিতে পদ্মপাতার মত সকল সুখেদুঃখে এবং আশা নিরাশার মধ্য দিয়ে এমনভাবে দুনিয়াদারী করে জীবন যাপন করবে যাতে দুনিয়ার কোন কুপ্রভাব তাকে পদ্মপাতার পানির মত স্পর্শ না করে। মুসলমানের ইহ্‌কালের জীবন পদ্মপাতার পানির মত যেন স্বচ্ছ ভাবে পালিত হলে তার দৈনন্দিন জীবনে কোন বিফলতা সৃষ্টি হয় না।

আধ্যাত্মিক কালচার ইসলামের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামের ধর্ম বিধান হচ্ছে সাম্যের বিধান। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যতগুলো আইনী বিধান নাজিল হয়েছে তার মধ্যে সাম্য একটি অন্যতম বিধান। ইসলামে এই বিধান অনুস্মরণ করা কর্তব্য বলা হয়েছে। এই নীতি নিয়মে সমাজে শোষণ কার্য পরিত্যাজ্য। এ কারণে খলিফা ও কৃতদাস উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্যের সমতা আজও টিকে আছে। আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্যে ধনী গরীবের মসজিদ পৃথকভাবে তৈরী হয়নি। আজও বিত্তবান বিত্তহীন, সুলতান ভিখারী, রাজা প্রজা, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল মুসলমান কাঁধে কাঁধ রেখে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এক আল্লাহ্‌র কাছে মাথা নত করে সেজদা দেয়। ইসলামে অনাড়ম্বর সাদাসিধা জীবন যাপন সব সময় সকল সমালোচনার উর্ধ্বে। অধিক সম্পদ জীবনকে করে তোলে বিপন্ন, সেজন্যে ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলিম সমাজের রূপান্তর ঘটানোর আদর্শে হযরত আবু বক্কর (রাঃ) প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েও তার সমস্ত সম্পদ দ্বীনের পথে ব্যয় করে দ্বীনহীনভাবে জীবন যাপন করেছেন। আধ্যাত্মিক জীবন ব্যবস্থায় ইসলাম একজন মুসলমানকে ন্যায় ও সত্যের পথে পথ চলার নির্দেশ দেয়। এটা ইসলামের আত্মিক কালচার। শিক্ষামানের মানদন্ডে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারলে আত্মিক মুক্তির পথ হয় সুগম।

www.amarboi.org

আরব বিশ্বে অনেক মুসলিম শাসক তাঁদের সিংহাসন ও জাঁকজমক প্রাসাদ ছেড়ে মদিনা দর্শনে এসে মদিনায় খলিফাদের কুঁড়ে ঘরে বসে ইসলামের "কালিমার" দাওয়াত গ্রহণ করেছেন। এই সকল আমির বাদশারা কোন সময় দেমাগ অহংকার বোধ করেনি বলে তাঁরা পেয়ে ছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনে আত্মিক আলোক পথ। ইসলামে কালচারের গুরুত্ব হচ্ছে জীবন প্রণালীর সাথে ধর্ম মিলন। মুসলমান সমাজে ইসলামের কালচার পবিত্র দাম্পত্য জীবনের মত সুন্দর মিলন শোভায় প্রেমভক্তি। কালচার মানব সমাজে রুচি বোধের খোরাক যা নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গের মত মানব জীবনের জাগরণ।

নৈতিক কালচার মানুষের কতকগুলো আইনী অনুশাসন যা মার্জিত আচার আচরণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ধর্মীয় মূল্য বোধের অধীনে নৈতিক ধারণা সৃষ্টি হলে সে তার বৈষয়িক জীবন ব্যবস্থায় নিজের সম্বন্ধে ভালমন্দ অনুধাবন করতে শেখে।

আত্মা এবং বিবেকের কাজ দুনিয়া এবং পরকালের সমন্বয় সাধন ঘটানো। ইসলামের স্বাধীন চেতনাবোধ নৈতিক আদর্শের সম্ভাবনাময় পথকে উন্মুক্ত করে দেয়। এ জন্য নামাজের সময় কোন ভিখারী যদি মসজিদে বাদশার সম্মুখের কাতারে দাঁড়ায় বাদশা ঐ ভিখারীকে তার পিছনের কাতারে যেতে বলবে না। বাদশা একজন ভিখিরীর পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে অতি সাধারণ মানুষ বিবেচনা করে নিজেকে ছোট মনে করেন। তিনি যে একজন রাষ্ট্র নায়ক একথা ভুলে বিনয়ের সাথে মহান আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদন করেন। এরূপ ক্ষেত্রে বাদশা ঐ ভিখারীর পিছনের কাতারে নামাজ আদায় করবে। এটাই ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ। নৈতিক কালচারে আছে প্রেম, আছে আত্মপরিচয়ের সুযোগ সৃষ্টি। আল্লাহর ঘর মসজিদে বাদশা ভিখারী উভয়ে একজন আর একজনের সাথে সমান সমান। ইসলামী জীবনধারায় এই সুন্দর আদর্শ অন্য কোন ধর্মে নেই। ইসলামের এই দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণ আর কোন ধর্মে দেখতে পাওয়া যায়নি আজও। ইসলাম পৃথিবীতে এমন একটি ধর্মীয় মতবাদ যেখানে গণতান্ত্রিক এবং সামাজিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটেছে। ইসলাম নিশ্চয় একটি গণতন্ত্রমুখী ধর্মব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যেমন একটি সাংবিধানিক আইন থাকে তেমনি ইসলামীগণতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য

www.amarboi.org

থাকে একটি সংবিধান যার নাম আল কোরআন। এই আল কোরআনই হচ্ছে ইসলামী গণতন্ত্রের একমাত্র সংবিধান। ইসলামী সংবিধানের অপর নাম ইসলামী গণতন্ত্র। একারণে রাষ্ট্র এবং ধর্ম একটি অবিচ্ছেদ অঙ্গ।

অনেকে মনে করেন গণতন্ত্রের আদি পিতা আব্রাহাম লিংকন। ইসলামের দৃষ্টিতে আমরা তা মনে করতে পারিনা। কারণ এই মতবাদের বহু আগে রসুলে করিম (সঃ) ইসলামী গণতন্ত্রের মূল ভিত প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তখন থেকে মুসলমানেরা গণতন্ত্র ব্যবস্থাকে ইসলামের মূল সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআন মজিদে এরশাদ করেন "তোমরা তোমাদের সমাজে ইসলাম কায়েম কর। আর এ ব্যাপারে তোমরা মতভেদে লিপ্ত হয়োনা, (সূরা শূরা, আয়াত ১৩)। আল্লাহ্ পাকের এই আয়াত দ্বারা মুসলিম সমাজে ইসলাম কায়েম করার কথাই বলা হয়েছে। ইসলাম কায়েম করার অর্থ ধর্ম এবং গণতন্ত্র দুটোর সংমিশ্রণ ঘটানো। ইসলাম ধর্মের সাথে গণতন্ত্রের মিল রয়েছে বলে ইসলাম এবং গণতন্ত্র একই ধারায় প্রবাহিত। ইসলামী গণতন্ত্রবিধানে কোথাও কোন নৈরাজ্য থাকতে পারে না। ইসলামী গণতন্ত্রের আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালিত হলে রাষ্ট্র নায়কের উপর থাকে আল্লাহর সতর্ক বাণী এবং সঙ্গে থাকে ত্রিশ পারা কোরআন। ফলে সমাজে বিরাজ করে কল্যাণ এবং সমৃদ্ধি।

নবীজীর এবং তাঁর পরবর্তী সময়েও আরব ভূমিতে কখনও অন্যায় অথবা কোন সমাজ বিরুদ্ধচরণ কাজের প্রশ্রয় ছিলনা। সে যুগে ইসলামী কালচারের আওতায় সত্যকে গ্রহণ এবং সমাজে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে কখনও কোন বিলম্ব হয়নি। ওয়াদা খেলাপ ছিল চরম অপরাধ। ন্যায় বিচারে ছিল আল্লাহর হুকুম পালন।

মানব জীবনে জ্ঞানের পরিধি সংকুচিত হলে আল্লাহ্ ভীতির পরিবর্তে সেখানে সৃষ্টি হয় ব্যক্তি স্বার্থপরতা এবং ক্রমেই সেটা মনের গভীরে প্রাধান্য বিস্তার লাভ করতে থাকে। স্বার্থ ও কুপ্রবৃত্তি মানুষকে মুনাফেক বানায়। তখন এই মুনাফেকরা ইসলামকে আড়ালে রেখে তার কুপ্রবৃত্তিগুলোকে অনুস্মরণ করতে থাকে। মানুষের প্রত্যেকটি কাজেকর্মে এবং আচার আচরণে তার চরিত্রের সাথে একটা আকর্ষণ আছে। একটা মন্দকাজ আর একটা মন্দ কাজকে চম্বুকের মত আকর্ষণ করে। একটা ভাল কাজ অন্য আর

www.amarboi.org

একটা ভাল কাজকেও আকর্ষণ করে থাকে। নৈতিক কালচারের অবর্তমানে মানুষ একটা খারাপ সম্পদ থেকে আর একটা খারাপ সম্পদকে টেনে আনে। তখন ঐ সব খারাপ সম্পদ ব্যক্তি জীবনে অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় তার নৈতিকতা চলে যায় শূন্যের কোঠায়। এ ক্ষেত্রে একমাত্র ইসলামই দিতে পারে মানুষের জন্যে সার্বিক কল্যাণ।

মুসলমান সমাজে কালচার প্রবেশ পথটি খোলা রাখতে পারলে ইসলামী সম্ভারের অনুপ্রবেশ ঘটে দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণময় বিষয়গুলো শান্তির আদর্শে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। কালচারবিহীন সমাজ পুষ্পহীন উদ্যানের মত নিরানন্দ সমাজ জীবন। কোরআন ও সুন্নার শ্রোত ধারায় ইসলামী কালচার প্রবাহিত হলে সেখানে স্বর্গীয় অনুভূতির স্বাদ পাওয়া যায়। যারা শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী কেবল তারাই ইসলামী সংস্কৃতিকে ভালবেসেছে। জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সব সময় পরকাল তত্ত্বদর্শী এবং সেখান থেকে তাদের ইসলামী আদর্শের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে সুন্দর জীবন ব্যবস্থায়। মুসলিম জীবন যাত্রা ব্যবস্থায় প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আত্মার কল্যাণ সাধন যা ইহকাল এবং পরকালের জন্য সুখের অবস্থান। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইহা একটি অন্যতম ধর্মানুশীলন। এ কারণে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সার্বজনীন। ইসলাম আমাদের এই ধারণাই দিয়েছে।

ইসলাম এমনই একটি ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থা যার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে কোরআন হাদিসের বাণী, আছে ধর্মজ্ঞানের অভাব পূরণের ব্যবস্থা। কার্যতঃ ইসলাম মানুষকে ধর্মনীতির উপদেশ দেয়, ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ দেয়, দুষ্ট স্বভাব ও কুকাজ ত্যাগের উপদেশ দেয়, ঘৃণা বিদ্বেষ পরিহার করার উপদেশ দেয়। একারণে জ্ঞান এবং শিক্ষার কথা সকল মানুষের কাছে উত্তম উপদেশ। বস্তুতঃ রসূল (সঃ)কে অনুস্মরণ করে চললে এগুলি সবই পরকালের পুরস্কার হিসেবে পাওয়া যায়। জ্ঞান এবং ধর্ম দুটোই ইহকাল এবং পরকালের জন্য সমম্বয়পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।

শিক্ষার কার্যক্রম শক্তিকে সবল রাখার গতিধারা নির্ভর করে মূলতঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপর। শিক্ষার ওজন কম হলে সেখানে ধর্মের ওজনও হয় হালকা। তখন নৈতিক শক্তির ঘটে অবক্ষয়। সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দেখা দেয় নানা অন্তরায়। সমাজ জীবন ধারায় সৃষ্টি হয় দুঃখ ভোগ এবং

www.amarboi.org

সম্ভাবনার অগ্রগতি হয় রুদ্ধ। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য জাতির কল্যাণের জন্য শিক্ষার অনুকূলে শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় ইসলামী বিধি বিধান পালনের যে সব নির্দেশ আছে তা সবই মানব কল্যাণের জন্য উৎকৃষ্ট দিক। একারণে ইসলামে রাজনীতির গুরুত্ব অনেক বেশী কারণ ইসলাম একটি বিপ্লবী আদর্শ। দেশের জনগণের সার্বিক সত্তা বিকাশ এবং আদর্শ জীবন যাপনের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব।

জনগণের শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধির দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হয়। তেমনি ব্যক্তি প্রতিভা দ্বারা জ্ঞানী মানুষ গড়ে তোলা রাষ্ট্রেরই কাজ। একারণে নবীজীর সময় কোন মুসলমান অশিক্ষিত থাকতে পারেনি। ইসলামের আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সৎ নেতৃত্ব। বুদ্ধি প্রসূত কালচারের গুরুত্ব হচ্ছে ধর্ম মিলন। ধর্ম হচ্ছে আল্লাহর জন্য আর রাষ্ট্র হচ্ছে মানুষের জন্যে। ধর্ম মানুষের নৈতিক কার্যধারার পরিসরকে আওতাভুক্ত করে। রাষ্ট্রে থাকে মানুষ আর মানুষের মাঝে ধর্ম। রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় যা দরকার তা হচ্ছে একজন রাষ্ট্র নেতা। নবীজী ছিলেন একজন মহান রাষ্ট্র নেতা। তিনি ছিলেন বিশ্বনেতা, সকল নেতার উর্ধ্বে শ্রেষ্ঠ নেতা। নবী করিম (সঃ) বলেছেন জ্ঞানী লোকের কলমের কালি শহিদের রক্তের চেয়েও অধিক মূল্যবান। ইসলামের স্বর্ণযুগে এই বাক্যটি সাহাবিরা গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করে ছিলেন বলে তাঁরা রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী শাসন পরিচালনার জন্য সবকিছু নিষ্ঠার সাথে পালন করে গেছেন।

ইসলামের মৌলিক গুণগুলোর বিকাশ এবং উৎকর্ষ সাধন সবই কোরআন হাদিসের বিধি ব্যবস্থার মধ্যে পরিবেষ্ঠিত। সামগ্রিকভাবে মানব জীবনকে সুন্দর ও মহিমাময় করে তোলার জন্য প্রয়োজন একজন ধর্ম নেতার অধীনে রাষ্ট্র পরিচালনা। ইসলামে রাজনীতি ব্যবস্থায় থাকবে একজন মুসলিম শাসক অর্থাৎ একজন ভাল মুসলমান যার চরিত্রে থাকবে ইসলামের আদর্শ, ন্যায়নীতি এবং মানব জাতির জন্য থাকবে রাষ্ট্রীয় কল্যাণ।

ইসলামে রাজনীতির আশ্রয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় সংশয় এবং শৈথিল্য দেখা দিলে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী হয়ে পরে ভোগবাদী। একারণে হজরত আলী (রাঃ) রাষ্ট্র পরিচালনায় তৌহিদবাদ লুপ্ত আশংকায় আক্ষেপ করে

www.amarboi.org

পাঁচটি মূল্যবান বাণী উচ্চারণ করেছেন। তা হচ্ছে ঃ

(ক) দেশের নেতৃবৃন্দ ঐশ্বর্যের পিছনে ছুটলে সাধারণ মানুষ কাকে অনুস্মরণ করবে?

(খ) দেশের ব্যবসায়ীগণ অসাধু হলে মানুষ কাকে বিশ্বাস করবে?

(গ) দেশের সৈন্যদল দেখার শোভা হলে কে দেশ রক্ষা করবে?

(ঘ) দেশের প্রশাসন বিভাগীয় রাজ কর্মচারীগণ এবং ন্যায় দণ্ডধারী বিচারক মণ্ডলী দায়িত্বহীন হলে কে নিপীড়িত জনগণকে রক্ষা করবে?

(ঙ) দেশের বিদ্বান ব্যক্তিগণ লোভী হলে কে দেশের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করবে?

আল্লাহর কসম এই পাঁচ করণেই কোন দেশ বা জাতির ধ্বংস অনিবার্য।

ইসলামধর্ম হচ্ছে মুসলমানের নিত্য দিনের আলো। একারণে ইসলাম ধর্মীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মীয় এবং নৈতিক আদর্শ ছাড়া ইসলামী সংস্কৃতি অন্য কোন মতবাদের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত নয়। ইসলাম মুসলমান জাতির ধর্মতন্ত্রের এবং আদর্শবাদ ভূমিকার উপর বিদ্যমান। রাষ্ট্রে অন্যায় অবিচার বিদ্যমান থাকলে সেখানে ইসলামের বৈশিষ্ট্যগুলো সাফল্যের ফলশ্রুতি হতে পারে না। ইসলামের শেষ নেতা হচ্ছেন মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর পথ নির্দেশনা হচ্ছে আল কোরআন এবং আল হাদিস। সুতরাং ইসলামে প্রত্যেকটি কাজই হচ্ছে আল্লাহর কাজ। এ কারণে প্রত্যেকটি কাজ কোরআন এবং হাদিসের আলোকে সম্পাদন করার নির্দেশ এসেছে মুসলমান জাতির কাছে। একজন মুসলমানের দৈনন্দিন, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল কর্মপন্থা ইসলাম ধর্মে বিধিভুক্ত হয়েছে। আল্লাহর বিধান ন্যায়সঙ্গত বিধান। সুতরাং এই ধর্মবিধান হচ্ছে আল্লাহর বিধান।

নবীজীর সময় মসজিদ ছিল রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্র বিন্দু। এখান থেকে চলতো রাষ্ট্র পরিচালনা। নবীজীর পরবর্তী সময়েও সাহাবিগণ মসজিদকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। তাঁদের অন্তরে ছিল শ্বাশত সত্য নিষ্ঠা এবং মানব জাতির কল্যাণ সাধনের অদম্য বাসনা। এর সবটুকুই ছিল শান্তি স্থাপনের মূলমন্ত্র। হজরত আলী (রাঃ) আক্ষেপ করে বলেছেন, ইসলামী রাষ্ট্র রচনায় মুক্তি সংগ্রাম না আসলে সমাজকে স্বাবলম্বী করা সম্ভব নয়। সকল কালচারের সমন্বয় সাধন হচ্ছে রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবনে মানব

www.amarboi.org

কল্যাণ সাধান। ইসলামী কালচারকে বাদ দিয়ে কিছু বলতে গেলে সেটা হবে আপেক্ষিক বিষয়। সুতরাং রাষ্ট্র এবং সমাজ হচ্ছে পরস্পরে সম্মিলিত রূপ। ইসলামের আদর্শে পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, নাগরিক জীবন থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সবই ইসলামী কালচারের পীঠস্থান। জ্ঞানে, পুণ্যে, সংযমে এবং ন্যায়নিষ্ঠার সাথে দেশ তথা রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিশ্রুতি হচ্ছে সকল কালচারের আত্মপ্রকাশ। যেহেতু ইসলাম একটি সামগ্রিক মানব সমাজ ব্যবস্থা সেকারণে আধ্যাত্মিক কালচারকে সামনে রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করা কর্তব্যসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআন গ্রন্থে সকল জীবের প্রতি কর্তব্য পালনের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের যৌক্তিকতায় সকল জীবের বাঁচার অধিকার আছে। যারা প্রাণীকুলের প্রতি দয়া করে তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত থাকে। ইসলামী জ্ঞান দর্শনে জীবে দয়া এটাও আল্লাহর আরাধনা। কর্তব্য পালন মানব জীবনের মহৎ আদর্শ যা মানুষের জ্ঞান চেতনার উপর নির্ভশীল। দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য অবহেলা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করেন না। সুতরাং ইসলামী আদর্শে বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করার অর্থ মহান আল্লাহর কর্তব্য পালন। পবিত্র কোরআন এবং হাদিসে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বহু নির্দেশ দেওয়া আছে। সুতরাং কোরআন সুন্নার আলোকে অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় রাষ্ট্র পরিচালনা একটা ফরজ এবাদত। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাজনীতির সাথে নৈতিকতার যেমন নিবিড় সম্পর্ক আছে তেমনি রাজনীতিতে ধর্মের প্রয়োজনও অপরিহার্য।

www.amarboi.org

মসজিদ ভিত্তিক ইসলাম শিক্ষা

ধূলির ধরণীতে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর একমাত্র ঘর কাবা শরীফ। ইহা সমগ্র মানব জাতির পরম ধ্যান ও করুণা লাভের মহান মিলন ভূমি। জাগতিক এবং আধ্যাতিক প্রেরণা লাভের কেন্দ্রস্থল এই কাবাঘর। দেহের সাথে আত্মার যে সম্পর্ক ইসলামের সাথে কাবার ঠিক একই সম্বন্ধ। কাবা শরীফ আল কোরআনের মসজিদুল হারাম। এই কাবাঘর হচ্ছে বেশেতের পবিত্র আরাধ্য স্থান। কাবা বা "বায়তুল্লা" কোরআনে আল্লাহ এই ঘরকে দুনিয়ার প্রথম এবং সর্বপ্রাচীন ঘর বলে উল্লেখ করেছেন। "নিশ্চয়ই মানুষের জন্য প্রথম স্থাপিত গৃহ বাক্কার গৃহ (কাবা) যাহা আশীর্বাদপ্রাপ্ত এবং জাতিসমূহের পথ প্রদর্শক"। আল্লাহ পাক আরও বলেন, "নিঃসন্দেহে সর্ব প্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে তা হলো কাবা ঘর মক্কায় অবস্থিত এবং বিশ্বমানবের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়" (সূরা- আল ইমরান, আয়াত- ৯৬)। এই কাবা ঘর সম্পর্কে আল্লাহ আমাদের অনেক মর্যদা দান করেছেন।

এই কাবাঘর হচ্ছে আমাদের কেবলা। আল্লাহর নিকট থেকে নবীজীর কাছে কাবাকে কেবলা করার নির্দেশ আসার পর থেকে আমরা কাবা ঘরকে সম্মুখে রেখে নামাজ পড়ি। কোরআন মজিদে আল্লাহ বলেন "এবং প্রত্যেকের একটি নির্দিষ্ট দিক আছে যার দিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করো। এবং তুমি যেখান হতেই বেড় হও না কেন মসজিদুল হারামের (কাবা) দিকে মুখ ফেরাবে" (সূরা বাকারা, আয়াত ১৪৮-১৪৯)। ইসলামের অনুভূতিতে কথাটা খবুই সত্য যে কাবার দিকে মুখ ফেরালে প্রকৃতপক্ষে সেই আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দিকেই মুখ ফেরানো হয়। এ কারণে দুনিয়ার সকল মুসলমান যেখানেই থাকুক নামাজের সময় ঠিক কাবার দিকে মুখ রেখে নামাজ পড়ে আসছে।

মক্কায় অবস্থিত এই কাবাঘর ইবাদতের প্রথম ঘর। এই স্থানে হযরত আদম (আঃ) আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা লাভ করে ধন্য হয়েছেন। এই গুণের কারণে কোন মুসলমান কাবাঘরে এসে তার জীবনের গোনাহ মাফের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে আল্লাহ পাক তাঁর প্রার্থনা কবুল করেন।

www.amarboi.org

বিশ্বের বুকে কাবাঘর একটি নিরাপদ স্থান। এই কাবাঘর কোন দিন ধ্বংস কিংবা বিলুপ্ত হবে না। রোজ কিয়ামত পর্যন্ত এই কাবাঘর আরব ভূমিতে কায়েম অবস্থায় থাকবে। পুণ্যময় কাবাঘরের কারণে আল্লাহপাক মক্কা বাসীদের জন্য বিপুল বরকতময় জীবিকা দান করেছেন। এ কারণে মক্কাবাসীদের কোন দিন ভোগের অভাব অথবা সংকট দেখা দেবেনা।

আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন মজিদে বিভিন্ন সূরায় এই কাবাঘর সম্বন্ধে অনেক কথাই উল্লেখ করেছেন। আল কোরআনের অলোকরশ্মি আমাদের জ্ঞান চক্ষুতে প্রতিফলিত হলে দুনিয়ার সৃষ্টি বিকাশে এই কাবাঘর সম্পর্কে অনেক কিছু জানা সহজ হয়, তখন সত্যের অনুভূতিতে কারো মনে কোন সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না। কাবাঘর মুসলমান জাতির পরলৌকিক ইবাদতের প্রয়োজনে একটি উল্লেখযোগ্য দিক। হজ্জ পালনের জন্য মক্কার কাবাঘর বিশ্ব মুসলমানের জন্য একটি মহাতীর্থ স্থান। আল্লাহ বলেন, আকাশ মন্ডলী এবং পৃথিবী সৃষ্টির মধ্যে দিন ও রাতের ব্যবধানে চিন্তাশীল মানুষের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। কাবাঘর মুসলমান জাতির জন্য একটি উত্তম নিদর্শন। করাঘরের মাহাত্ম্য জানতে হলে আল-কোরআনকে অনুস্মরণ করতে হবে তা হলে কাবাঘরের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে।

বিশ্বের প্রথম মানব মানবী হযরত আদম এবং হাওয়া (আঃ) উভয়ে আল্লাহ কর্তৃক বেহেশত থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবীতে এসে ছিলেন বিশ্ব খেলাফতের দায়িত্ব নিয়ে। হযরত আদম (আঃ) চল্লিশ বছর পর স্ত্রী হাওয়ার সাথে আরাফাত ময়দানে পরস্পরে সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হয়ে একত্রে মিলিত হন। তিনি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বেহেশতের সেই বাইতুল মামুর (কাবাঘর) যেখানে ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহর ইবাদতে রত থাকতেন সেই মসজিদ তিনি দুনিয়াতে আল্লাহর মহিমা ও গুণগান করার জন্য প্রার্থনা জানালে আদমের (আঃ) এই বিনীত মোনাজাত মহান আল্লাহ কবুল করেন। অতঃপর বেশেতের সেই বায়তুল মামুর এই দুনিয়ায় নেমে আসে পবিত্র মক্কায় এবং এটাই হচ্ছে দুনিয়ার প্রথম মসজিদ বা কাবাগৃহ। পৃথিবীর বুকে প্রথম মানব ও প্রথম কাবাগৃহ এই দুয়ের সমন্বয়ে নিলিখ বিশ্বে মানব জাতি আবাদ হয়ে আল্লাহর অনুগ্রহ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে। নবীজীর বিশ্বজনীন সত্য প্রেরণায় এই কাবাঘর ইসলামের অবিচেছদ্য অঙ্গ এবং অফুরন্ত আশীর্বাদ। বর্তমান সৌদিযুগে মসজিদুল হারামের ব্যাপক সম্প্রসারণ সাধিত

www.amarboi.org

হয়েছে। মসজিদের মূল অংশ দু'লক্ষের বেশী বর্গমিটারে ১০০টি দরজাসহ উন্নত করা হয়েছে। এখন জু'ম্মার দিন প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ মুসল্লী এক ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করে।

মুসলিম জাহানে দ্বিতীয় মসজিদ, মসজিদুল আকসা বা বায়তুল মোকাদ্দাস। এই মসজিদে প্রবেশের জন্য আছে একশটি দরজা। পাঁচ হাজার ধর্মপ্রাণ মুসুল্লি এই মসজিদ অভ্যন্তরে একত্রে নামাজ আদায় করতে পারে। বিশ্ব মুসলিম জাহানে সত্যের জন্য, প্রেমের জন্য, সৌন্দর্যের জন্য এই প্রাচীন মসজিদটি আধ্যাত্মিক মর্যাদার তুলনায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করেছে। কাবাগৃহ নির্মাণের ৪০ বছর পর জেরুজালেমে এই বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর হাতে সম্পন্ন হয়। পরে হযরত সুলাইমান (আঃ) এটা পুনঃনির্মাণ করেন (সূত্র মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা)। বর্তমানে এই পবিত্র মসজিদটি ঈজরাইল ভূখন্ডে জেরুজালেমে ইহুদীদের দখলে রয়েছে।

হযরতের মিরাজ যাত্রা প্রাককালে এই কাবা মসজিদটির এক অলৌকিক তাৎপর্য রঁয়েছে। একদিন রাতে নবীজী মাক্কার এই কাবাগৃহের চত্বরে ঘুমাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন কে যেন তাঁকে মুহম্মদ, মুহম্মদ বলে ডাকছেন। ডাকে হযরতের ঘুমভঙ্গ হলে দেখেন জিব্রাইল ফেরেশতা তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন। হযরত আরও লক্ষ্য করলেন কাবা চত্বরের অদূরে ডানা বিশিষ্ট অশ্বের আকৃতি বোরাক নামে একটি অদ্ভুত জ্যোতির্ময় বাহন অপেক্ষা করছে। জিব্রাইল (আঃ) দেরী না করে হযরতের হৃদয় পরীক্ষা করে ঐ বোরাকে আরোহনের জন্য ইংগিত দিলেন। হযরত বোরাকে আরোহন করার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে বোরাক জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদের কাছে হাজির হলে জিব্রাইল (আঃ) এর নির্দেশে হযরত সেখানে অবতরণ করেন। নবীজী জেরুজালেমের এই মসজিদে পরম ভক্তি ভরে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুরাকাত নামাজ আদায় করেন। হযরত এতোদিন এই মসজিদকে কেবলা করে নামাজ পড়তেন। আজ সেই পবিত্র মসজিদ তিনি স্বচোখে দেখে খুবই ধন্য মনে করলেন। এরপর জিব্রাইল (আঃ) হযরত কে সঙ্গে নিয়ে বোরাকে আরোহন করে বিদ্যুৎশক্তি গতিতে বেহেশতে আগমন করলেন। অবশেষে উর্ধ্বাকাশে সপ্তম আসমানে বায়তুল মামুর পর্যন্ত গিয়ে বোরাক থেমে যায়। তখন একটা

www.amarboi.org

পর্দার আড়াল টেনে পরম করুণাময় আল্লাহ তাঁকে অপরূপ দর্শন দিলেন এবং উভয়ের মধ্যে অনেক গোপন কথা হয়। এই মুহূর্তে হযরত স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে সত্য করে চিনলেন।

মহান আল্লাহর আর একটি অন্যতম প্রিয় স্থান এবং অফুরন্ত বরকতের কেন্দ্রভূমি মসজিদে নববী। নবীজী মক্কা থেকে ৪৩২ কিলো মিটার পথ অতিক্রম করে মদিনায় এসে হিযরত করলে সেখানে তিনি সর্বপ্রথম যে মসজিদটি নির্মাণ করেন সেটি হচ্ছে মসজিদে নববী। নবীজী এই মসজিদে নববী নির্মাণের সময় তিনি নিজেই সামান্য দিন মজুরের মত নিজ হাতে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। নবীজী এই মসজিদ নির্মাণের সময় কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কাউকে কোন গুরুগম্ভীর উপদেশ দেননি। নবীজীর মাথায়, মুখে ও দাড়ি মোবারকে ধূলামাটি ভরে গিয়েছিল অথচ তিনি পরম আনন্দে ইটের বোঝা মাথায় বহন করে বলেছিলেন- "সুন্দর সুস্বাদু খেঁজুর ও সুরম আঙ্গুরের মোট বহন করা অপেক্ষা এই মোট অধিক আনন্দের ও প্রীতিকর।"

হাদিসে উল্লেখ আছে হযরত উকরা ইবনে অমর (রাঃ) বলেন একদিন আমরা মসজিদে নববীর সুফ্ফাতে বসে জ্ঞানচর্চা করছিলাম। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে জ্ঞানশিক্ষা লাভের জন্য কোরআনের অর্জিত বাণী নিয়ে শিক্ষা আলোচনা হচ্ছিল। হঠাৎ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আমাদের মধ্যে জ্ঞানচর্চা ও ইসলামের আলোচনায় মশগুল দেখে অত্যন্ত খুশী হলেন। অন্য আর একদিন নবীজী মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দুটো মজলিস দেখলেন। এক মজলিসে দোয়া কালাম, যিকির ও অযিফা পাঠ করা হচ্ছিল এবং দ্বিতীয় মজলিসে দ্বীন বিষয়ে আলোচনা, জ্ঞানচর্চা, শিক্ষা দান ও শিক্ষা লাভের কাজ চলছিল। নবীজী বললেন-দুটো মজলিসই ভাল কিন্তু দ্বিতীয়টি অধিক ভাল। এই বলে রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় মজলিসে বসে গেলেন।

সাহাবীদের সময় থেকে যুগে যুগে মসজিদুল নববীর সম্প্রসারণ হতে হতে সৌদি শাসন আমলে সম্প্রসারণ চূড়ান্ত পর্যায় লক্ষাধিক স্কয়ার মিটারে পৌঁছেছে। বলা হয় মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ এক সময় ওহুদ পাহাড় পর্যন্ত ঠেকবে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তর থেকে আগত মদিনার সামগ্রীক পরিবেশ মুমিনদের হৃদয়কে করে আপ্লুত এবং মুসলিম জগতকে করে পূতপবিত্র।

www.amarboi.org

মসজিদ পৃথিবীর বুকে শান্তিকামী ও শান্তি স্থাপনকারী আদর্শ মুমিন গড়ে তোলার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। মসজিদ মুসলিম চরিত্র গঠনের উত্তম স্থান। মসজিদে সম্মিলিত নামাজ মুমিনদের মিরাজ। অন্যদিকে মসজিদ মানব শক্তি সংহতির কেন্দ্রবিন্দু। সারা মুসলিম জাহানে এযাবৎ প্রায় তেরলক্ষ মসজিদ নির্মিত হয়েছে। ইসলামে সকল মসজিদ ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক সহযোগিতা, সমবেদনা, প্রেম প্রীতি ও দয়ামায়া চর্চার অন্যতম মাধ্যম।

দেশের মসজিদগুলো মুসলমান জাতির সহানুভূতি, ধর্মস্পৃহা, সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছা প্রদর্শনের মিলনভূমি। মসজিদ মুসলমান জাতির জন্য ইসলামী তালিম এবং ধর্মজ্ঞান বিস্তারে শিক্ষা আয়তন। মসজিদ মুসলিম সমাজের জন্য পরামর্শ, আইন প্রণয়ন, বিচারকার্য, দণ্ডদান সবই ছিল মসজিদের ব্যবহৃত কার্য। এছাড়া বিচারপতি ও গভর্ণর নিয়োগ সবই মসজিদ থেকে পরিচালিত হোত ইসলামের স্বর্ণযুগে। আজকাল কেউ কেউ মনে করেন মসজিদ থাকা উচিত নীরব নিস্তব্ধ। কিন্তু শিক্ষা ও প্রচারের জন্য শব্দের যতটুকু প্রয়োজন তাঁরা তাও পছন্দ করেন না।

যে মানুষটি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে অথবা ইসলাম ধর্মের গন্ডির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ইসলামী চিন্তা চেতনায় জীবন যাপন করছে সেই ব্যক্তিই মুসলমান। মুসলমান শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহর বন্দেগী না করলে যেমন বান্দা হওয়া যায় না তেমনি এক আল্লাহর কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ না করলে মুসলমান হওয়া যায় না। মুসলমানী জীবন ব্যবস্থায় ধর্মীয় সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হলে সেখানে ইসলাম হয়ে পরে নেহাত নাজুক। ধর্মের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্যে প্রথমতঃ যে গুণের দরকার তা হচ্ছে ইসলাম ধর্ম শিক্ষায় উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন এবং সেই সাথে প্রয়োজন ধর্ম পালনের গতিকে আরও বাড়িয়ে তোলা। একজন মুসলমানের ইসলাম ধর্মের সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক থাকতে হবে অতি নিবিড়। ধর্মজ্ঞানহীন মানুষ সর্বত্রই ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে সমাজে বয়ে আনে অকল্যাণ। এজন্যে একজন মুসলমানকে হতে হবে ইসলাম ধর্মশিক্ষা অনুরাগে অনুসারী। সুতরাং ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে মুসলমান জাতিকে ঝিমিয়ে পড়লে চলবে না।

আল্লাহ মানুষকে কখনই নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। আল্লাহর ইবাদতের জন্য মানুষ সৃষ্ট হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ

www.amarboi.org

ও রসূলের বিধানে সম্পাদিত হওয়ার নাম ইবাদত। মুসলমানী জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রে ধর্মীয় মর্যাদায় জীবন জীবিকা পালন করাই হচ্ছে আল্লাহ ও রসূলের ইচ্ছাপূরণ।

আল্লাহ বিশ্বজগতে সব কিছুই মানুষের কল্যাণের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মানুষের উপকার সাধন করে না। এই উপকার ইহজগৎ কিংবা পরজগৎ উভয় সম্পর্কিত। জগতের যাবতীয় প্রাণী ও সকল বস্তু মানুষের কল্যাণে এবং আল্লাহর আরাধনায় নিয়োজিত আছে। একজন মুসলমান যদি তার মানস চক্ষু খোলা রেখে বাস্তব জীবন যাত্রায় ইসলামের বিধিবিধান যথাযথ ভাবে পালন করতে পারে তাহলে তার জীবনে ফিরে আসবে শ্বাশত কল্যাণ এবং সাফল্য। এজন্য একজন মুসলামনের ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে থাকতে হবে পরিষ্কার ধ্যান ধারণা। ইসলামের ধর্মীয় মর্যাদায় মানব সমাজের প্রত্যেকটি সৎ কাজই হচ্ছে ইহকাল ও পরকালের জন্য জীবন কল্যাণের প্রকৃত উৎস। একজন ধর্মভীরু মুসলমান আল্লাহর সাহায্য তখনই পায় যখন সে ইসলামী শক্তির দৃঢ় মনোবল নিয়ে সকল পবিত্র কাজে ঝাঁপিয়ে পরে।

মানব সন্তানের উপলব্ধির সূচনা ঘটে ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে। ইন্দ্রিয় উপলব্ধির কার্য ক্ষমতাকে "জ্ঞানলাভ" নামে অভিহিত করা যেতে পারে। ধর্মজ্ঞান অর্জনের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্রস্থল হচ্ছে সন্তানের পিতামাতার গৃহনিবাস। পিতামাতা ধর্মজ্ঞানে স্বচ্ছ হতে পারলে তাদের সন্তানেরাও ইসলাম ধর্ম বিষয়ে পরিচিতি লাভ করতে পারবে।

বুদ্ধি বিকাশের সাথে একটি শিশু নিজ অনুভূতি নিয়ে উপলব্ধি করতে পারবে তার আপন ধর্মজগতকে। শিশু ধর্ম নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে না। জন্মের পর শিশু ধীরে ধীরে তার পিতামাতা যে ধর্ম পালন নিয়মে আকৃষ্ট সন্তানটি সেই ধর্মে অনুসারি হয়। সন্তানকে মানুষরূপে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষা গ্রহণ ও ধর্ম পালনে শিশুর সম্ভাবনাময় জীবন যাত্রায় সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার দায়িত্ব তার আদর্শ পিতামাতার। আদর্শ পিতামাতা তাদের সন্তানের জীবন চরিত্রে সুন্দর চালচলন ও আচার আচরণ দ্বারা তাকে প্রকৃত মুসলমান রূপে গড়ে তুলতে সদা সচেষ্ট থাকবে যাতে আলেমের ঘরে জালেম তৈরীর মত অবস্থা না ঘটে।

www.amarboi.org

শিশু জন্ম লাভের পর সে হাঁটতে শিখে, কথা বলতে শিখে। তার শিক্ষা বয়স এলে সূচনাতে সাধারণ শিক্ষার সাথে ধর্মশিক্ষা দানে যত্নবান হতে হবে তার পিতামাতাকে। সন্তানকে মসজিদ মুখী করা, মসজিদ পরচিতি করা নির্ভর করে পিতামাতার দায়িত্ব পালনের উপর। বাস্তব জীবন যাত্রায় সন্তান যাতে মসজিদ, নামাজ, হাদিস ও কোরআন সবকিছুতে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে সেজন্যে মসজিদ ভিত্তিক জীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মসজিদ একদিকে যেমন ব্যক্তি কেন্দ্রিক অন্যদিকে সমাজ কেন্দ্রিকও বটে। সুতরাং মসজিদ বর্জন করে কেউ পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হতে পারে না।

যুগেযুগে আল্লাহ এই পৃথিবীতে নবী পাঠিয়েছেন বিপদগামী মানুষকে সত্যের পথে পরিচালনার জন্যে। নবীরা আসেন বিপথগামী মানুষের পাপমগ্ন স্বভাব থেকে ঐশী শক্তির মাধ্যমে তাদেরকে সত্যের পথে ফিরিয়ে আনা। এক এক যুগে প্রত্যেক গোত্রে আল্লাহ্ প্রেরিত নবীরা মানব জমিনে এসে অনাচার, মিথ্যাচার, লম্পটাচার ও ইন্দ্রিয় লালসাচার দূর করে সমাজে শান্তি ও ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে এনে কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করেছেন। নবীজী এই ধরাধামে এসেছিলেন সকল আরববাসী তথা বিশ্ববাসীকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনার জন্য। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাবের পূর্বে গোটা আরব দেশে সত্যের আলো নিভে গিয়েছিল। তখন আরব দেশে প্রতিমা পূজা ছিল তাদের ধর্ম উপাসনা। অত্যাচার, অনাচার, অবিচার, ব্যভিচার সবই ছিল আরবীয় জীবনে প্রচলিত জীবন বিধান। এ সময় আরবের শোচনীয় অবস্থা ছিল সর্বপেক্ষা ভয়াবহ এবং সকল প্রকার পাপকর্ম সমগ্র আরব বাসীদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

নবীজী এই পৃথিবীতে না আসলে মানব সমাজ হয়ে যেত নরক ভূমি। অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে নবীজী আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তাঁর মনোনীত ইসলামধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশ্বের বুকে। নবীজী কেবল আরব দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেননি, বরং তিনি আরব ভূমির বাইরে বিভিন্ন দেশে সাহাবী পাঠিয়েছেন ইসলাম প্রচারের জন্যে। তাঁরা ঈমানী আদর্শে বলিয়ান হয়ে দেশে দেশে ইসলাম প্রচার করে অনেক সাফল্য এনে ছিলেন। পরবর্তীতে ঐ সকল অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে ইসলাম প্রচার ও বিস্তার করে সাহাবীরা যথেষ্ট সফলকাম হয়ে ছিলেন। কালক্রমে ঐসকল ইসলাম

www.amarboi.org

প্রচারকারীগণ নিজ নিজ অঞ্চলে একটি করে মসজিদ নির্মাণ করে কোরআন-হাদিসের মধুর বাণী মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতেন। ফলে ঐসব অঞ্চলে আস্তে আস্তে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করতেন তাঁরাও দ্বীনের পথে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তেন।

আজ থেকে প্রায় ৮০০ বছর পূর্বে মধ্যপ্রাচ্য থেকে সুলতানী আমলে বিখ্যাত আউলিয়া খান জাহান আলী ইসলাম প্রচারে বাংলাদেশে আসেন। প্রথমে তিনি খুলনার বাগেরহাটে তাঁবু ফেলেন এবং সেখান থেকে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান ইসলাম ধর্মপ্রচারক। পরে তিনি এখানে একটি ৬০ গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য পুরাতাত্বিক নিদর্শন। এই ৬০ গম্বুজ মসজিদের প্রকৃত পক্ষে গম্বুজের সংখ্যা ৮১টি। ছাদের উপর ৭৭টি এবং চার মিনারের উপর ৪টি গম্বুজ আছে। এটা ৬০ গম্বুজ মসজিদ বলা হলেও এই মসজিদে সর্বমোট ৮১টি গম্বুজ লক্ষ্য করা যায়। খান জাহান আলীর মাজার থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে ঘোড়াদীঘি নামক এই ৬০ গম্বুজ মসজিদটি অবস্থিত। এই মসজিদে নিয়মিত আজান এবং ওয়াক্তী নামাজ আদায় হয়ে আসছে।

হযরত আব্দুল কাদের জিলানীর (রাঃ) পুত্র হযরত শাহ মকদুম (রাঃ) আজ থেকে সাতশ বছর পূর্বে সুদূর ইরাকের বাগদাদ থেকে বাংলার মাটিতে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। তিনিও প্রথমে ইসলাম প্রচারের জন্য রাজশাহীতে আস্তানা গাড়েন। ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। রাজশাহীর বাঘা মসজিদ এবং চাপাই নওয়াবগঞ্জে সুলতানিয়া আমলে আট কোন বিশিষ্ট সোনামিয়া মসজদি ইসলামের অন্যতম খ্যাতনামা নিদর্শন।

সিলেটে হযরত শাহ্ জালাল মাজার ও মসজিদ বিদ্যমান। শাহজালালের পূর্ণ নাম জালালউদ্দিন ইবনে মুহাম্মদ। তিনি ছিলেন ইয়ামেনের অধিবাসী। ধর্ম প্রচারের জন্য ইয়ামেন থেকে বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচার করতে করতে ভারতে আসেন এবং এখানে হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার (রাঃ) সাথে তার সাক্ষাত হয়। ভারত সফর শেষে

www.amarboi.org

তিনি বাংলাদেশের সিলেটে অবস্থান নেন। সিলেটে হযরত শাহজালাল মসজিদ ও মাজার ভক্ত মুসলমানদের কাছে এটি প্রাণের আকর্ষণ। কথিত আছে ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রাঃ) হযরত শাহ্ জালালকে একজোড়া কবুতর উপহার দেন। তাঁর মাজারে এই কবুতরগুলো জালালী কবুতর নামে খ্যাত।

শাহ্ বদর চট্টগ্রামের শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা বদর নামে পরিচিত। কথিত আছে তিনি আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বে একটি কুদরতি ভাসমান পাথরে বসে চট্টগ্রামে আসেন। এখান থেকে তিনি ইসলাম প্রচার করেন। এখানে তাঁর নির্মিত মসজিদে নিয়মিত নামাজ আদায় হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নাম জানা অজানা অনেক দরবেশ ও আউলিয়াদের মাজার রয়েছে। তাঁরা তাঁদের জীবদ্দশায় ইসলাম প্রচার এবং প্রসার ঘটানোর জন্য অকাতরে জীবন ব্যয় করেছেন। তাঁরা দূরদূরান্তর থেকে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য সবকিছু ত্যাগ করে ছুটে এসেছিলেন বাংলার মাটিতে। এমনি আর একজন আউলিয়া ছিলেন হযরত শাহ আলী। তিনি সুদূর বাগদাদ থেকে বাংলায় এসে ঢাকার মিরপুরে আস্তানা গারেন। এখানে তাঁর মাজার ও মসজিদ পাশাপাশি অবস্থিত। তিনি শাহ আলী বাগদাদি নামে পরিচিত। মাজার ও মসজিদে সব সময় ভক্ত মুসলমানদের নামাজ, যিকির, দোয়া কালাম পাঠ হয়ে আসছে।

উত্তর বঙ্গের সৈয়দপুর শহরে রয়েছে অনেক মসজিদ। এ কারণে সৈয়দপুর শহরকে মসজিদের শহর বলা হয়। এখানে অন্যান্য মসজিদের তুলনায় চিনি মসজিদের নির্মাণ সৌন্দর্য ভিন্ন ধরনের। এই মসজিদটির প্রথম নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৮৬৮ সালে। পরে ইমাম হাজী হাফিজ আব্দুল করিমের উদ্যোগে মসজিদের সকল কাজ শেষ হয়। মসজিদটির নকশা কাজ করে ছিলেন করিম সাহেব নিজেই। সে সময় কলকাতা থেকে আনা শংকর মর্মর পাথর, চীনামাটির টুকরা ও বগুড়া থেকে আনা চীনামাটির পাথর দিয়ে অত্যন্ত নয়নাভিরাম এই চিনি মসজিদটি নির্মাণ করা হয়।

ইসলামের সকল কর্মকান্ডকে শক্তিশালী করার জন্যে চাই মাদ্রাসা শিক্ষা। মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা ইসলাম জাগরণের সর্বতোভাবে ব্যবহার্য ধর্ম। স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষার বাইরে ইসলাম ধর্ম শিক্ষার আর একটি

www.amarboi.org

অন্যতম দিক হচ্ছে মসজিদে ইমামী মর্যাদায় ধর্মশিক্ষা। ইমাম সাহেব প্রতি জুম্মার দিনে ইসলামের শান্তিবাদ আদর্শ প্রচার করে ধর্মের বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন। মসজিদ মুসলমানদের ওয়াক্তী নামাজ, জুম্মার নামাজ, বছরান্তে ঈদুল ফিতের ও ঈদুল আজহা নামাজের জন্য একটি পবিত্র স্থান। অনেক সময় বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলের জন্যও মসজিদে ধর্মচর্চা এবং আলোচনার বিশেষ আয়োজন হয়ে থাকে বছরান্তে। হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমান একত্রে সমবেত হয়ে আলেম, ওলেমা, মোদ্দারেস বৃন্দের নিকট থেকে ধর্ম আলোচনা শ্রবণে অনেক বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে তারা ঘরে ফেরে। যারা ধর্মালোচনার বিষয় বস্তু অন্তরে আত্মস্থ করতে পারে তারাই হয় সফলকাম।

ইসলামধর্মে জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা ঘরে বাইরে সকল ক্ষেত্রে অমাবস্যার চাঁদের মত অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিন্তু যারা কিছুটা উন্নত চরিত্রের অধিকারী তাদের ধর্ম অপেক্ষা কর্মে, পরকাল অপেক্ষা দুনিয়ার ওপর নজরদারী থাকে কিছুটা বেশী। অপর পক্ষে ধর্মে সম্যক জ্ঞানবান মুসলমানেরাই লাভবানে হয় বেশী স্বার্থক। এ বিষয়ে আল্লাহ্ পাক কোরআন মজিদে এরশাদ করেনঃ "এমন কিছু লোক আছে যারা বলে "হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের এই পৃথিবীতেই দাও। এবং তাদের মধ্যে যারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের ইহকালের কল্যাণ দাও এবং পরকালের কল্যাণ দাও এবং আমাদের নরক যন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর।" (সূরাঃ বাকারা, আয়াত ২০০-২০১)।

দেশের মসজিদগুলো ধর্মশিক্ষা এবং প্রচারের জন্য উপযুক্ত স্থান। প্রতি শুক্রবারে বহু মুসলামান দলে দলে এসে মসজিদে সমবেত হয় জুম্মার নামাজ আদায়ের জন্য। ইমাম সাহেব জুম্মার দিনে সকল নামাজীদের সম্মুখে রেখে মিম্বারে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে অনেক সুন্দর ও মূল্যবান বক্তব্য সম্মুখে উপবিষ্ট মুসুল্লীদের কাছে তুলে ধরেন। তখন আগত সকল ধর্মপ্রাণ নামাজীরা অনেক অজানা ধর্মতত্ত্ব ও দ্বীনের তথ্য বিষয়ে সুন্দর ও স্বচ্ছ জ্ঞান লাভে হয় লাভবান।

আল্লাহর ঘর মসজিদ ইবাদতের উত্তম স্থান। মনোনিবেশের জন্য মসজিদে নীরব স্থানে ইবাদতে আনে ধ্যানমগ্নতা। মসজিদ আবাদ করে তারা যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি। যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা মসজিদে

www.amarboi.org

ইবাদতের জন্য উপস্থিত হয় আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি মাকাম তৈরী করেন (আল-হাদিস)। হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন "মসজিদে আগমনকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র মেহমান আর মেজবানের কর্তব্য মেহমানের সম্মান করা। কাজী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ) বলেন মসজিদের উদ্দেশ্যে বহির্ভূত কার্যকলাপ থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখা মসজিদ আবাদ করার শামিল।

নামাজের জন্য খুব তাড়াহুড়া কিংবা দৌড়ে মসজিদে আসতে নবীজী নিষেধ করে বলেছেন "অতি আদবের সাথে এবং বেশ শান্ত ও গাম্ভীর্য সহকারে নামাজের জন্য মসজিদে গমন কর।" শুক্রবার মুসলমানদের মসজিদে সমাবেশের দিন। এ জন্য এই দিনকে "ইয়াওমুল জুম্মা" বলা হয়। নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও সমগ্র জগতকে আল্লাহ্ ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন এই জুম্মার দিনে। এই জুম্মার দিন হযরত আদম (আঃ) সৃজিত হন। এই দিনেই তাঁকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয় এবং এই জুম্মার দিনেই আদম (আঃ) কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামানো হয়েছে। কিয়ামতও এই দিনেই সংঘটিত হবে অর্থাৎ পৃথিবী ধ্বংস হবে এই জুম্মার দিনে। এই জুম্মার দিনে এমন একটি মুহূর্ত আসে যাতে মানুষ যে দোওয়া করে আল্লাহ্ তা কবুল করেন। লক্ষণীয় যে, অমুসলমান রাজ্যে জুম্মার নামাজ পড়া ফরজ নয়। এ কারণে নবীজী মক্কায় থাকা কালে জুম্মার নামাজ পড়েন নাই। কারণ তখন সেখানে কোন শান্তি ছিল না।

জুম্মার দিনে জুম্মার আজান দেওয়া হলে আল্লাহ্র যিকিরের দিকে ত্বরা করা সকল মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "জুম্মার দিনে নামাজ ও খোৎবার জন্য মসজিদে যেতে যত্নবান হও।" হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা জুম্মার নামাজের জন্য গোসল করবে এবং অন্যান্য দিনের চেয়ে ভাল বস্ত্র পরিধান করে মসজিদে আসবে। পুরুষদের পক্ষে সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নত। (মুসলিম শরিফ)

জুম্মার নামাজ আদায়ের জন্য কৃতদাস, স্ত্রীলোক, নাবালেগ ও রুগ্ন ব্যক্তি এই চার প্রকার ব্যক্তি ব্যতীত সকল মুসলমানের জন্য জুম্মার নামাজ

www.amarboi.org

ফরজ। জুম্মার আজানের পর অন্য সকল কাজের প্রতি মনোযোগ দিতে নিষেধ আছে। আজানের পর সকল মুসলমানকে বেচাকেনা ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। এমন কি জুম্মার আজানের পর বেচাকেনা হারাম করা হয়েছে। এই আদেশ পালন করা ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের জন্য ফরজ। নামাজ শেষে ব্যবসা বাণিজ্য, বেচাকেনা, কাজকাম, রিজিক হাসিলের সকল চেষ্টা সবই বৈধ।

প্রতি শুক্রবারে জুম্মার দিন খুৎবা নামাজীদের কাছে একটি অপরিহার্য অঙ্গ। খুৎবার মাধ্যমে বিশ্বের কোটি কোটি মুলমানের ইসলাম শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। এ জন্য জুম্মার খুৎবা মুসলমানের কাছে অমূল্য সম্পদ। ইসলামে মুসলমান জাতির জন্য সত্যপ্রীয় কল্যাণ ও দ্বীন উপদেশ একটি অনিবার্য বিষয়। জুম্মার খুৎবা মুসলমানের জীবনী শক্তি। খুৎবার সময় ইমাম সাহেব ইসলামের আদর্শ ও দর্শন ধারাবাহিকতার নিয়মে নামাজীদের কাছে প্রচার করে থাকেন। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী দ্বীন ইসলামী জীবন পালন পদ্ধতি তথা নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব, যাকাত, তাসবীহ তাহলীল এমন কি ইহকালের জন্য রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসানীতি, সংসারনীতি ইত্যাদি ধর্মবিধি নিয়মে এসবের কার্য পালন ইমাম সাহেব খোৎবার মাধ্যমে সুন্দর ব্যাখ্যায় নামাজীদের বুঝিয়ে দেন ইসলামের আইন সিদ্ধ ধারাবাহিকতায়। হাদিসে উল্লেখ আছে হযরত যখন খোৎবা দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে উঠতো। স্বর উচ্চ হতে উচ্চতর হতো। তিনি তখন এতো উত্তেজিত হতেন মনে হতো তিনি যেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্য চালনা করছেন (মুসলিম শরীফ)

জুম্মার দিনে সকল নামাজীদের জুম্মার খুৎবা শোনা ওয়াজিব। কারণ খুৎবার সময় নামাজীদের আবশ্যকীয় ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। সে সময় কোন প্রকার কথা বলা বৈধ নয়। এমন কি সৎ কাজের আদেশ সম্পর্কে কথা বলাও নিষেধ করা হয়েছে। খোৎবা চলাকালিন সময়ে কোন নামাজ পড়া বৈধ নয়।

বাংলাদেশে সামগ্রিক ভাবে প্রায় দুলক্ষ পঞ্চাশ হাজার ছোটবড় মসজিদ আছে। এই সকল মসজিদে নিয়মিত জুম্মার নামাজ আদায় হয়ে থাকে। পল্লী অঞ্চলের মসজিদগুলো যেমন আকার আয়তনে ছোট তেমনি

www.amarboi.org

নামাজীদের সংখ্যাও অনেক কম হলেও শহরের মসজিদগুলো দেখতে যেমন সুন্দর ও মনোরম তেমনি আয়তনে নামাজীদের স্থান সংকুলানও অনেক ব্যাপক।

ঢাকার কেন্দ্রীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররাম দেশের মধ্যে সর্ব প্রধান ও প্রসিদ্ধ ধর্মীয় পীঠস্থান। এই মসজিদের সৌন্দর্য এক অপরূপ শোভায় ঝলমল করছে। দেখলে মনে হয় এ যেন সকল মুসলমানের পুণ্য কল্যাণ ও আশীর্বাদরূপে মনোমুগ্ধ শোভা বিরাজ করছে। বায়তুল মোকাররাম একটি বহুতল বিশিষ্ট সাততলা মসজিদ। এখানে প্রায় চল্লিশ হাজার নামাজী একত্রে নামাজ আদায় করতে পারেন। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য একদিকে নির্মাণ করা আছে সুন্দর ফুলের বাগান এবং পানির ফোয়ারা। এখানে মহিলা নামাজীদের জন্যও নামাজখানার সুন্দর ব্যবস্থা করা আছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময়ে মহিলারা মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করতো। তবে কোথাও কোন অনাচার ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা না থাকলে মহিলারাও মসজিদে নামাজ পড়তে পারে। কিন্তু তাদের পোশাক হতে হবে অতি সাধারণ এবং খুব সাদাসিধা। সাহাবিদের আমল পর্যন্ত মুসলমান নারীরা মসজিদে পুরুষদের সাথে নামাজ পড়তেন। কিন্তু সাহাবা আমলের শেষভাগে নারী পুরুষের মিলিত উপাসনায় অনাচারের আশঙ্কা দেখা দিলে নারীদের মসজিদে যাওয়া ঔচিত্য সম্বন্ধে মতভেদ দেখা দেয় ফলে সাহাবি আমল শেষ হওয়ার সাথে সাথে নারীদের মিলিত উপাসনা বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে মহিলারা নিজ নিজ গৃহে নামাজ পড়তে শুরু করে। বর্তমানে মক্কার মসজিদুল হারামে মহিলাদের নামাজের জন্য পর্দা করা পৃথক স্থান আছে। এই নিয়মে ঢাকায় বায়তুল মোকাররাম মসজিদে দুতলার পিছনে মহিলাদের নামাজের জন্য আলাদা ভাবে স্থান নির্দিষ্ট করা আছে।

১৯৫৯ সালে হাজি আব্দুল লতিফ বাওয়ানী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল ওমরাও খানের নিকট একটি জাতীয় মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা পেশ করেন। মেজর জেনারেল ওমরাও খান এ ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বাস প্রদান করেন। এরপর সরকার এবং বড় বড় শিল্পপতিদের আন্তরিক সহযোগিতায় অর্থ সংগ্রহ করা হয়। ১৯৬০ সালে

www.amarboi.org

২৭শে জানুয়ারী তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইয়ুব খান বায়তুল মুক্কারাম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

আল্লাহর ঘর মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সকল মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মহব্বত রাখতে চায় সে যেন আমাকে মহব্বত করে। যে আমার সাথে মহব্বত রাখতে চায় সে যেন আমার সাহাবিগণকে মহব্বত করে। যে সাহাবিগণদের সাথে মহব্বত করতে চায় সে যেন কোরআনকে মহব্বত করে। যে কোরআন এর সাথে মহব্বত রাখতে চায় সে যেন মসজিদ সমূহকে মহব্বত করে। কেননা মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহ্ পাক এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন। মসজিদে যারা নামাজে মশগুল হয় আল্লাহ তাদের কার্যোদ্ধার এবং অভাব দূর করেন (কুরতুবী)। হযরত আয়েশা সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, "রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে বাসগৃহের মধ্যেও মসজিদ অর্থাৎ নামাজ পড়ার বিশেষ জায়গা তৈরী করার এবং তাকে পবিত্র রাখার জন্যে আদেশ করেছেন" -(কুরতুবী)।

বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক প্রাচীন মসজিদ আজও বাংলার মাটিতে গৌরব নিয়ে টিকে আছে। প্রাচীন কালে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে বেশ কিছু আউলিয়া ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদর রসুলুল্লাহ" ইসলামের এই দাওয়াত নিয়ে মানুষের অন্তরে অসীম শক্তি প্রবেশ করানোর অদম্য ইচ্ছা নিয়ে। তখন দেশের বিদ্যমান মসজিদগুলো তাঁরাই সুন্দরভাবে পুনঃআবাদ করেছিলেন। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল মসজিদের ব্যবহার ও মর্যাদা অনেক বেড়েছে এবং সেই সাথে নামাজীদের সংখ্যাও উত্তোরোত্তর বাড়ছে। জুম্মার দিনে সমগ্র বাংলাদেশের সকল মসজিদে সকল বয়সের মুসুল্লীদের উপস্থিতি সংখ্যা প্রায় তিন কোটিরও কিছু বেশী। এই তিন কোটি নামাজীদের মধ্যে থাকে কিছু নিয়মিত নামাজী, বাকী অংশ অনিয়মিত অর্থাৎ তারা ওয়াক্তী নামাজ ছেড়ে সাপ্তাহিক হাজিরা দেওয়ার মতো জুম্মার নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে সমবেত হন।

ইমাম সাহেব কোরআনের বিভিন্ন অংশ থেকে তরজমা ও তফসির করে সমবেত সকলকে ধর্মের বিধান এবং আদর্শ প্রস্ফুটিত ফুলের ন্যায়

www.amarboi.org

বিকশিত করে দেন সকল নামাজীদের অন্তরে। নামাজীরা অতি মনোযোগে কান পেতে শুনতে থাকেন ইমাম সাহেবের মুখে আল্লাহর পাক বাণী। ইমাম সাহেব কোরআন হাদিসে যত উচ্চ মার্গের হবেন তাঁর বক্তব্য প্রয়োগের উপস্থাপনা ও বাচন ভঙ্গি হবে তত সহজ ও সুন্দর। নামাজীদের কাছে ঐ আবেদন হয়ে ওঠে অতি মনঃপুত। তখন ইমাম সাহেবের উপদেশ মুসল্লিদের অন্তরে ধরে রাখাও হয় অনেক সহজ। মুহূর্তে আল্লাহর কালাম শ্রবণে মনের মধ্যে সুন্দর অনুভূতি জেগে ওঠে জ্বলে ওঠা অগ্নিশিখার মত। তখন মন ভরে ওঠে অবাক বিস্ময়ে। অনুপ্রেরণা জাগে মনের গভীরে নিয়মিত নামাজী হওয়ার উদ্দীপনায়। সেই সাথে সুন্দর অনুভূতি সৃষ্টি হয় মনের মাঝে, তখন ঐ অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয় অনুপ্রেরণা। এই অনুপ্রেরণা একজন বেনামাজীকে নিয়মিত নামাজের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। ইমাম সাহেব ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী এবং ধর্মজ্ঞানে দক্ষ হলে মুসুল্লীদের মনের ভেতরে বয়ানের সবটুকু প্রবেশ ঘটনো তাঁর পক্ষে হয় সহজ। কোরআন হাদিসের আলোকে ইমাম সাহেবের বক্তৃতা নামাজীদের মনের অবচেতন অবস্থা থেকে সচেতনতা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। তখন আপন গতিতে তার মনের মাঝে উৎসাহ সৃষ্টি হয় প্রকৃত নামাজী হওয়ার জন্যে।

ইমাম সাহেব একজন শিক্ষকরূপে মসজিদ অভ্যন্তরে সকল নামাজীদের কাছে মুখে মুখে পাঠদানে ধর্মশিক্ষা দিয়ে থাকেন যেমনটি একজন শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে তাঁর ছাত্রদের কাছে একটা অধ্যায় থেকে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় সুন্দর ভাবে সমবেত ছাত্রদের বুঝিয়ে দেন যাতে তারা উক্ত বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারে। এই পাঠদান বক্তৃতা শিক্ষকের পক্ষে যেমন কর্তব্য তেমনি একই সাথে শিক্ষকের পাঠদানের বিষয় বস্তু অধ্যয়ন করা ছাত্রের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম সাহেব মসজিদ অভ্যন্তরে শিক্ষকের ভূমিকায় সকল নামাজীদের কোরআনের কোন একটি অংশবিশেষ সুন্দরভাবে তরজমা এবং তফসির করে বুঝিয়ে দিলে ঐ বক্তব্যের বিষয় বস্তু যথাযথ আমল করা নামাজীদের এখতিয়ারভুক্ত। ইমাম সাহেব কত সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন নামাজের গুরুত্ব। তিনি বুঝিয়ে দেন নামাজে বিনয় এবং ক্ষুদ্রতা প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। ইমাম সাহেব জুম্মার দিনে নামাজীদের স্মরণ করিয়ে দেন বিনয় ও ক্ষুদ্রতা বোধ অন্তরে না থাকলে তা কখনও নামাজ হয় না। অমনোযোগী নামাজ নামাজীকে গর্হিত কাজ থেকে বিরত

www.amarboi.org

রাখতে পারে না। ইমাম সাহেব মসজীদের শিক্ষক হিসেবে তাঁর খুৎবায় একথা সুন্দর ভাবে নামাজীদের বুঝিয়ে দেন।

নামাজ আদায়ের সময় অন্ততঃ মনে রাখতে হবে এই সামান্য সময়ের জন্য হলেও নামাজীর অন্তরকে পার্থিব জীবন এবং ঘর সংসারের যাবতীয় আকর্ষণ থেকে মুক্ত রেখে আল্লাহর প্রতি নিজেকে নিয়োজিত রাখা। তবেই নামাজীর নামাজ আদায় হবে সন্তোষজনক এবং স্বার্থক।

নামাজের জন্য উত্তম স্থান মসজিদ। তবে প্রয়োজনে ঘরে নামাজ পড়া নিষেধ নাই। একথা ভুললে চলবে না মসজিদের মর্যাদাগুণে সওয়াবের তারতম্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ঘরে একরাকাত নামাজ পাঠে কেবল এক রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায়। ঘরের বাইরে মহল্লার মসজিদে এক রাকাত নামাজে পঞ্চাশ রাকাতের পুণ্য হয়ে থাকে। জামে মসজিদে এক রাকাত নামাজ আদায়ে পাঁচশত রাকাতের পুণ্য সঞ্চয় হয়ে থাকে। অন্যদিকে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে একরাকাত নামাজে এক হাজার রাকাতের বরকত পাওয়া যায়। মদিনায় নবীজীর প্রথম মসজিদ মসজিদে নববীতে এক রাকাত নামাজে পঞ্চাশ হাজার রাকাতের এবং তদোপেক্ষা অধিক মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্বের শ্রেষ্ঠতর বায়তুল হারামে (কাবা) এক রাকাত নামাজ আদায়ে এক লক্ষ বরকতের পুণ্যফল লাভ হয়ে থাকে। (আল-হাদিস)

একজন নামাজী তার নামাজ যেখানেই আদায় করুক তাকে সর্বপরি আল্লাহর প্রতি ভয় ও বিনয় বোধ নিয়েই নামাজ আদায় করতে হবে। নবীজী বলেছেন যে নামাজ ভয়, ভক্তি ও বিনয় শূন্য সে নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না (তিরমিজী)। নামাজ কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য। এ কারণে নামাজীকে নামাজে হতে হবে পরহেজগার, বিনয়ী এবং মনোযোগী। লোক দেখানো যে কোন সৎকাজ করা ইসলামে গুরুতর অপরাধ। তবে আদর্শ স্থাপনের জন্যে এরূপ কাজ করায় কোন বাধা নেই।

আমরা জানি বিশ্বের সকল প্রাণীর জীবন আছে এবং তারা সকলেই আল্লাহর উপাসনা করে আসছে আদি অনন্ত কাল থেকে। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলছেন– "আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। সকলেই তাঁর (আল্লাহর) প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে

www.amarboi.org

এবং ওরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত" (সূরা নূর, আয়াত-৪১)। অনুরূপভাবে একথা নামাজের ক্ষেত্রেও অধিক গুরুত্ব বহন করে। নামাজ কায়েম করতে হলে নিবিষ্ট চিত্তে আল্লাহ্কে স্মরণ রেখে নামাজে মনোনিবেশ করে সেই মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে নিবেদন করতে হবে। আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে আরও বলেন "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে" (সূরা ক্বাফ, আঃ১)। প্রত্যেক প্রাণীর যেমন প্রাণ আছে তেমনি নামাজেরও আছে সতেজপ্রাণ। প্রাণীর মধ্যে জীবন বিদ্যমান থাকলে ঐ জীবিত জীবটির কদর এবং গ্রহণ যোগ্যতা বজায় থাকে তার মালিকের কাছে। আদরের এই প্রাণীটির মৃত্যু ঘটলে মালিক তাকে আর গ্রহণ করে না। প্রাণ থাকা অবস্থায় জীবটির গ্রহণ যোগ্যতা থাকে তার মালিক অথবা অভিভাবকের কাছে। জীবন হচ্ছে দেহের বলবৎ সম্বন্ধ। জীবন সম্বন্ধবিহীন হলে তা হয় সম্পর্ক বিহীন। তদ্রূপ ক্ষেত্রে নামাজের প্রাণ হচ্ছে নামাজীর মনোযোগ, ভক্তি এবং বিনয়। তখন এই নামাজ হয় জীবিত প্রাণ সমৃদ্ধ ইবাদত। সকল ইবাদতের একমাত্র মালিক আল্লাহ্র কাছে তখন এই নামাজ হয় গ্রহণযোগ্য। নামাজ আদায়ের সময় দুনিয়ার জীবনকে পেছনে রেখে আল্লাহ্র দরবারে হাজির হয়েছি এরূপ মন তৈরী করে নামাজে মনোযোগী হওয়ার নাম জীবন্ত নামাজ। প্রাণহীন নামাজ আল্লাহ্র কাছে বর্জনীয় অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য নয়। একজন নামাজী নিজেই এই দর্শন চিন্তা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারবে তার নামাজকে সে কতটুকু পরিশুদ্ধতার সাথে সতেজ প্রাণ করতে পেরেছে। নামাজী তার নামাজ আদায়ের পরিশুদ্ধতা নিজ চিন্তা অনুভূতি দিয়েই বুঝে নিতে পারবে তার নামাজ কোন্ অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে নিবেদিত হলো।

মসজিদ মানে "সিজদা"। মসজিদ হচ্ছে সিজদার স্থান। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশে মসজিদের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকা। এই ঢাকাকে মসজিদের নগরী বলা হয়। বর্তমানে ঢাকা শহরে সর্বমোট মসজিদের সংখ্যা প্রায় ১৩২০টি। ঢাকা শহরের প্রায় প্রতিটি মসজিদে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা রয়েছে। এসব মাদ্রাসায় শহরের মহল্লার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে প্রাথমিক ধর্মশিক্ষা লাভ করে থাকে। শহরে কোন কোন মসজিদে মক্তব মাদ্রাসাও চালু আছে। শিক্ষাদানের জন্যে মসজিদের ইমাম ও মোয়াজ্জিন

www.amarboi.org

নিযুক্ত আছে। তারা নিজ দায়িত্বে শিশুকিশোর কিশোরীদের আরবী এবং দ্বীন শিক্ষা দান করেন। এছাড়া ঢাকা শহরে মসজিদগুলো শবেবরাত, শবে কদর, শবে মিরাজ, মোহারাম, ঈদ-ই-মিল্লাদুন্নবী, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা এবং বিভিন্ন উপলক্ষে মিলাদ মহাফিল, ওয়াজ মাহফিল, জিকির আজগার এবং নফল ইবাদত বন্দেগী পালিত হয়ে থাকে।

স্বাধীন সুলতানী আমল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত দেশে মসজিদ নির্মাণের কাজ অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। কখনও ব্যক্তি প্রচেষ্টায়, কখনও যৌথ প্রচেষ্টায় মসজিদ নির্মাণের কাজ চলে আসছে। প্রাচীনকালে অনেক মুঘল সম্রাট, সুলতান ও পাঠান বাংলা শাসন করেছেন এবং প্রয়োজনে বহু মসজিদও নির্মাণ করেছেন ইবাদত বন্দেগীর জন্যে। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর, ইসলাম খান চিশতী, ঈশাখা, ইলিয়াস শাহ, সুলতান গিয়াজ উদ্দিন, সুবাদার সুবা, শাহ সুজা, মীর জুমলা, নওয়াব শায়েস্তাখান, সুবাদার মুর্শিদ কুলী খান এবং আরও অনেক মুসলিম শাসক বাংলাকে শাসন করে গেছেন। এভাবেই কালক্রমে ঢাকা শহর মসজিদের নগরীতে রূপ নিয়েছে।

সাধারণ মানুষের ধারণা মসজিদ হচ্ছে নামাজের একমাত্র কেন্দ্র স্থল। নামাজীরা মসজিদে আসবে, নামাজ পড়বে এবং মসজিদ ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু নবীজীর সময় মসজিদ ছিল রাষ্ট্র পরিচালনায় সকল কর্ম সম্পাদনের উৎস স্থল। রাষ্ট্র বিপ্লব পরিবর্তনের সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় কার্যধারা ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে কার্য পরিচালনা চলে আসে মসজিদের বাইরে। ইসলামে রাষ্ট্রিক বিবর্তনের সাথে সাথে রাষ্ট্র পরিচালনারও পরিবর্তন হতে থাকে।

ইসলামী শিক্ষায় মসজিদের অন্যতম ভূমিকা পালন হচ্ছে মুসলিম বালক বালিকাদের জন্য কোরআন শিক্ষার সুযোগ লাভ। ঢাকাসহ দেশের বড় বড় শহরগুলোতে এবং মফস্বল অঞ্চলের মসজিদে মসজিদে মহল্লার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোরআন শিক্ষার নিয়মিত ব্যবস্থা চলে আসছে বিগত বহু বছর থেকে। প্রত্যেক দিন ফজর নামাজ শেষে এই সব সরলমনা উৎসাহী ছেলেমেয়েরা ইমাম সাহেবের নিকট বিনা খরচে কোরআন পাঠ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। বছর যতই এগিয়ে যায় সময়ের টানে কোরআন শিক্ষায় আগ্রহী বালক বালিকাদের সংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই প্রসারিত

www.amarboi.org

হচ্ছে ধর্মকল্যাণ লাভের দিকে। কোরআন পাঠশিক্ষা এই সব ছেলেমেয়েদের যেমন উৎসাহিত করে তেমনি নিঃসন্দেহে ইসলামী আখলাখ ও শিষ্টাচার শিক্ষা লাভ করে থাকে মসজিদের পেশাদারী ইমাম সাহেবের নিকট। তদ্বারা এই সব কচিকাঁচা ছেলেমেয়েদের পরবর্তী জীবনে ইসলাম ধর্ম সচেতনা জাগিয়ে তোলে তাদের হৃদয় মাঝে। কিশোর কিশোরীরা একজন অভিজ্ঞ ইমামের কাছে সুন্দর আচরণ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামের ধ্যান ধারণা ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হতে থাকে তাদের মনের গভীরে। কোরআন শিক্ষা ছাড়াও এই সব কচিকাঁচা ছেলে মেয়েরা নামাজ শিক্ষার সকল নিয়ম বিধানও শিখে থাকে ইমাম সাহেবের কাছে। ফলে ধর্মের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাদের অন্তরে। শৈশবে তাদের কোমল অন্তরে অংকুরিত হয় ইসলামের প্রাথমিক স্তরের সুন্দর পরিবেশ। পরবর্তী জীবনে ইসলাম শিক্ষায় জ্ঞান অর্জনের সাবলিল আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় এই সব কিশোর কিশোরীদের কোমল হৃদয়ে।

ইসলামের বুৎপত্তি স্থল মক্কা এবং মদিনা। নবীজী ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বের বহুদেশে ইসলামকে ছড়িয়ে দেন তবলিকের মাধ্যমে। তবলিকের মাহাত্ম্য ও কার্যাদেশ সম্পর্কে কোরআন মজিদের বিভিন্ন সূরায় সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। অনুপম চরিত্রের অধিকারী মহামানব এবং সর্ব শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)কে আল্লাহ পাক এই ধরাধামে প্রেরণ করে প্রত্যেকের কাছে কোরআন পাকের নির্দেশ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া এবং প্রচার করা অপরিহার্য হিসেবে অনেক সূরার মধ্যে আল্লাহ পাক তাঁর কাছে আদেশ জারি করেছেন। এখানে কোরআন মজিদের কয়েকটা সূরা থেকে তবলিক সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হলো। "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎ কার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কার্যের থেকে নিষেধ করবে এবং এ সকল লোকেই হবে সফলকাম।" (সূরাঃ আল-ই-ইমরান, আয়াত ১০৪)

"হে বৎস! যথারীতি নামাজ পড়বে, সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং আপদে বিপদে ধৈর্য ধারন করবে। (সূরা ঃ লুকমান, আয়াত ১৭)।

"যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎ কাজ করে এবং বলে আমি তো আত্মসর্ম্পনকারী তার কথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা আর কার?" (সূরাঃ হামীম-সিজদাহ, আয়াত-৩৩)।

www.amarboi.org

নবীজীর সময় আরবের উদীয়মান যুবক ও সাহাবিরা নতুন ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের গৌরব ও মহিমা আরবের বাইরে প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। তাই নবীজীর সময় থেকে তবলিকের মূল কার্যধারা সূচীত হয়েছে। তবলিক শব্দের অর্থ প্রচার এবং জামাত অর্থ সংগঠন। ধর্ম প্রচারের জন্য যে সংগঠন তাকে বলা হয় তবলিক জামাত। (The Organization For Preaching Of Islam)।

আগেই বলেছি মসজিদ কেবল সিজদার স্থান নয়। মসজিদ হচ্ছে ইসলামের সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হওয়ার আর একটি উপযুক্ত স্থান। মসজিদ নামাজের স্থান হলেও ইসলাম চর্চা এবং ইসলামের কর্মবিধান প্রতিফলনের নির্বাচিত স্থান। নবীজীর সময় মসজিদ ব্যবহৃত হোত বহুমূখী কার্যধারায়। মসজিদ ব্যবহৃত হোত সংসদ ভবন (Parliament), সচিবালয় (Secretariate), আইন বিচারালয় (Court of Law) এবং জ্ঞান চর্চায় শিক্ষা নিকেতন হিসেবে (Educational Institute)। এভাবে ইসলামের সকল কার্য সম্পাদন হোত মসজিদাভ্যন্তরে। আজও ধর্মে অনোমযোগী মুসলমানদের কাছে ধর্মের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার কাজ পরিচালিত হচ্ছে এই মসজিদ কেন্দ্র থেকে। মুসলমান সমাজে তাবলিগ জামাতের কার্যক্রম উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে প্রতিনিয়ত পালিত হচ্ছে মসজিদ সংস্পর্শ থেকে। ইসলাম প্রচারের জন্য তাবলিগ দলটি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দেশব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাবলিগ দলের কর্মীরা নিবিষ্ট চিত্তে দ্বীনের পথে কাজ করে চলেছে। তাদের দ্বীনের পথের লক্ষ্যস্থল থাকে কোন একটি মসজিদের দিকে। তাবলিগ জামাতের অধস্তন সহকর্মীদের ওপর থাকে একজন নেতা যাকে বলা হয় আমির। তিনি তাঁর অনুগত সদস্য কর্মীদের প্রতি প্রচার কার্য পরিচালনার জন্য সঠিক উপদেশ দিয়ে থাকেন। তিনি দলের সকল সদস্যগণদের সাথে নম্র ও মধুর ব্যবহার দ্বারা সকলের প্রতি কর্তাগিরী করে ইসলাম প্রচারের কর্মপন্থা বন্টনকার্য বিবরণের নির্দেশ দেন।

তাবলিগ জামাত যে কেবল একটি দল তা নয় বরং তারা ধর্ম চেতনার শক্তি নিয়ে দলের সংগঠনকে মজবুত করে স্বদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শুরু করে বিদেশ পর্যন্ত ইসলাম প্রচারে বের হয়। অবস্থানের জন্যে মূলতঃ তারা বেছে নেয় একটি মসজিদ। এই দলটি মসজিদে কিছু দিনের জন্য

www.amarboi.org

অবস্থান করে এলাকা বাসীদের কাছে ইসলামের অমোঘ বাণী তথা নামাজের কথা বেনামাজীদের কাছে প্রচার করে। তাদের মধ্যে নামাজে প্রেমঅনুরাগে উদ্বুদ্ধ করাই হচ্ছে তবলিগ দলের প্রধান কাজ। তবলিগ দলটি বুঝিয়ে দেয় নামাজ আল্লাহর অন্যান্য ফরজ নির্দেশের মধ্যে অন্যতম আর একটা জরুরী বিধান। হেদায়েতের মাধ্যমে তবলিগ জামাত বেনামাজীদের নামাজের ফজিলত সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেয় নামাজই হচ্ছে সকল পাপমুক্তির সঠিক পথ। নামাজ নামাজীকে সকল অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে হেফাজত করে। অতীতে কৃত পাপের জন্য ক্ষমা এবং ভবিষ্যতের জন্যও আল্লাহর কাছে মঙ্গল প্রার্থনার একমাত্র উপায় এই নামাজ। নামাজ একজন মুসলমানকে সৎ কাজে উৎসাহিত করে প্রকৃত মোমেন তৈরী করে। যথাযথ নামাজ আদায়ে পাওয়া যায় আল্লাহর অনুগ্রহ ও রুজি রোজগারে বরকত।

মসজিদের প্রত্যক্ষ ব্যবহার না থাকলে নবীজীর রেখে যাওয়া নির্দেশ, ইসলাম প্রচার ও ধর্মকার্য সম্পাদন কোনটাই সম্ভব হোত না। এজন্য মসজিদের গুরুত্ব এতোবেশী এবং এ কারণে মসজিদ হচ্ছে ইসলামের বিধান রক্ষার ধর্মশালা।

চীন একটি অতি প্রাচীন দেশ। জাপানের মত এখানেও প্রধান ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধ। এতৎসত্ত্বেও চীন দেশে ইসলাম প্রসার ঘটেছে হাজার হাজার বছর আগে থেকে। চীন দেশে কান-ছু ও শেন-ছি প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসীরা মুসলমান। কোন একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় বর্তমানে চীনদেশে মুসলামানের সংখ্যা ন'কোটিরও উপর। চীনে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে বহিরাগত আরবীয় মুসলমানদের আগমন এবং ইসলাম ধর্ম নেতাদের ধর্ম প্রচার দ্বারা। প্রাচীন কাল থেকে আরবদের সাথে চীনাদের সদ্ভাব ছিল অতি নিগূঢ়। আরব হতে বহু প্রচারক ও সওদাগর চীনদেশে প্রবেশ করে তারা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি, গোষ্ঠী থেকে গোষ্ঠী, যুগ থেকে যুগে ও শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে ছড়িয়ে পরে এবং একই সাথে তারা মুসলিম ধর্মপুস্তক চীনা ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার আকারে বিলি করতে থাকে। ফলে মুসলমানগণের ইসলাম প্রচারের সুযোগে ইসলামের আচার আচরণ এবং মুসলিম কালচার তাদের মধ্যে স্থান লাভ করে। আরবের ওহাব ইবনে আবিকাব শাহ ৬২৮ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে আসেন এবং ক্যান্টন নামক স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে ইসলামকে আরও সুদৃঢ় করেন। এই মসজিদের

www.amarboi.org

চারিদিকে আরবীয় বণিকদের মহল্লায় গড়ে ওঠে অনেক জনবসতি। এতে তাদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের সংস্কৃতির প্রসার বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন অনেক চীনারা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। চীনের শেন-ছি প্রদেশে ৭৪২ খৃষ্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মিত হয়, তখন নব্য চীনা মুসলমানেরা এই মসজিদে নামাজের জন্য দলে দলে জমায়েত হোত। সেই সময় মুসলমানগণ অবাধে চীনা রমণীদের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হতে থাকায় তাদের বংশবৃদ্ধি বিস্তার ঘটতে থাকে। মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এবাদতের জন্য চীন দেশে মসজিদের সংখ্যাও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

চীনদেশে চীনা মুসলমানদের সাথে বৌদ্ধচীনাদের কোন দ্বন্দ্ব জুলুম আজও নেই। উভয়ে নিজেরা একসঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। তবে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়, বৌদ্ধদের কুসংস্কারে যাতে আঘাত না আসে সেই ভয়ে চীনা মুসলমানেরা তাদের মসজিদের মিনার বিশেষ উঁচু করে না। সমগ্র চীনদেশে মসজিদের সংখ্যা ছয় হাজারের ওপর। প্রত্যেকটি মসজিদে নিয়মিত নামাজ ও ইসলামী আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। চীন সরকারের অধীনে মুসলমানদের চাকরি গ্রহণেও কোন বাধা নিষেধ নাই। চীনে মুসলমান ছেলেমেয়েদের ধর্ম শিক্ষার জন্য আরবী শিক্ষার ব্যবস্থাও চালু আছে। চীনে সকল স্তরের নারী পুরুষদের কোরআন শিক্ষার নিয়মিত ক্লাশ হয়। পিকিং শহরে মুসলমান ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য একটি সরকারী কলেজও আছে। (সূত্রঃ ইসলাম সোপান, লেখক ইব্রাহীম খাঁ ও আহসান উল্লাহ)

আজ বিশ্বের সকল মুসলমানদের চরম দুরাবস্থা সত্ত্বেও এশিয়ার অন্যতম ধনীদেশ জাপানে মুসলমানের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিন দিন প্রসার ঘটছে ইসলামী আচার আচরণ, ইসলামী কালচার ও ইসলামী অনুষ্ঠান। প্রয়োজনে বৃদ্ধি পাচ্ছে মসজিদের সংখ্যাও। জাপানের নারী পুরুষ তাদের বংশগত বস্তুবাদী ও ভোগবাদী চিন্তা চেতনা ও বিশ্বাস ছেড়ে এখন তারা ইসলামের সুশীলত ছায়ায় ধর্ম চর্চায় সময় কাটাচ্ছে। "ইসলামী মিশন অব জাপান", "জাপানী ইসলামিক ট্রাষ্ট এবং ইসলামী সেন্টার ফর জাপানী" সকলেই ইসলামকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামের সুমহান মধুর বাণী তারা নিয়মিত প্রচার করে যাচ্ছে

www.amarboi.org

দেশব্যাপী এবং এতে সারাও পাচ্ছে অভাবনীয়। বেশ কিছু প্রগতিশীল জাপানীরা ইসলামকে ভালবাসতে শিখে তাদের সনাতন বুদ্ধ ধর্ম ছেড়ে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করছে। জাপানে এখন একের পর এক মসজিদ তৈরীর কাজ অব্যাহত রয়েছে। ক্রমান্বয়ে জাপানী নামাজীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকায় ইদানিং অনেক মসজিদে জুম্মার দিনে নামাজীদের স্থান সংকুলানও ঠিকমত হয় না। মুসলমান জাপানী দম্পতিদের বংশ বিস্তারের সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষার জন্য মক্তব মাদ্রাসার চাহিদাও বেড়ে চলেছে একের পর এক এবং সেই সাথে মসজিদের সংখ্যাও বাড়ছে একান্ত চাহিদার জন্যে। জাপানের বিত্তশালী মুসলমানেরা এ কাজে অর্থ দান করে যাচ্ছে অকাতরে। টকিও শহরের প্রধান মসজিদসহ আরও অনেকগুলো মসজিদ মাদ্রাসা রয়েছে, বিশেষ করে টোকিও শহরে এর প্রগতি লক্ষ্যনীয়। টোকিও শহরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মসজিদটির নাম "টোকিও জামে"। এটি তুর্কি সরকার নির্মাণ করেছেন বলে জানা যায়।

এই মসজিদের ইমাম সাহেবের সকল ব্যয়ভার তুর্কি সরকার বহন করেন। পরিতাপের কথা এই মসজিদের ইমাম সাহেব দাড়িহীন এবং কোট টাই পরিহিত চাঁচাছোলা দাড়ি কামানো (clean shave)। জুম্মার দিন এই মসজিদে আড়াই হাজারেও বেশী মুসুল্লী নামাজে অংশ নিয়ে থাকেন। মসজিদের ইমাম ইসলাম ধর্মজ্ঞানে বহু পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দাড়ি এবং পরনে পাঞ্জাবী না থাকার কারণে অনেক নামাজী এই মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করতে আসে না। তিনি ইসলামের একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসেবে নামাজের গুরুত্ব অতি সুন্দর বাচন ভঙ্গিতে নামাজীদের বুঝিয়ে দেন ফলে ইসলামের ভিত জাপানীদের কাছে আরও মজবুত আকার ধারণ করছে সময়ের চাহিদা অনুপাতে।

বর্তমানে জাপানের মুসলমান ছেলেমেয়েরা কোরআন শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করে কোরআনে হাফেজ হওয়ার জন্য নিয়মিত অধ্যবসায় করে চলেছে। এমন কি জাপানী মুসলমান মহিলাদের কোরআন শিক্ষার জন্য ক্লাসও চালু হয়েছে। জাপানে মসজিদুল হারাম নামে মসজিদটি বহুতলা বিশিষ্ট। জাপানে ইসলামী ট্রাষ্ট নামে সংস্থাটির প্রথম তলায় মহিলাদের জামাত, দ্বিতীয় তলায় পুরুষদের জামাত এবং তৃতীয় তলাটি হচ্ছে কোরআন শিক্ষার কেন্দ্র। অনেক জাপানী ছেলেমেয়েরা এখানে একাধারে

www.amarboi.org

কোরআন শিক্ষা করে চলেছে; অনেকে কোরআনে হাফেজও হয়েছে এবং হাফেজি শিক্ষা গ্রহণ করছে অনেক জাপানী ছেলে মেয়েরা। (সূত্রঃ ইসলাম সোপান, লেখক ইব্রাহীম খাঁ ও আহসান উল্লাহ)

ধর্ম প্রচারে বহু বাধা সত্ত্বেও ইসলাম কোথাও থেমে নেই। প্রথমে লণ্ডনের কথা ধরা যাক। লন্ডনে ওকিব মসজিদ গোটা ইউরোপে ইসলামের প্রধান কেন্দ্রস্থল। প্রকৃত পক্ষে বৃটেনে ইসলামের প্রসার কখন ঘটেছে তা সঠিক ভাবে বলা বেশ মুশকিল। তবে অনেকে মনে করেন ক্রুসেড যুদ্ধের সময় থেকেই ইউরোপে সরাসরি ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বর্তমানে যুক্তরাজ্যে মুসলমানের সংখ্যা অনুমান তিন লাখেরও বেশী। এরা প্রত্যেকেই বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ থেকে আগত মুসলমান। কার্ডিফ শহরে বেশ কয়েকটি মসজিদ রয়েছে। এই কার্ডিফ শহরে সবচেয়ে বড় মসজিদে নামাজীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। জুম্মার দিন নামাজীদের সংখ্যায় মসজিদটি ভরপুর হয়ে ওঠে। ইদানিং যুক্তরাজ্যের বহু এলাকায় বেশ কিছু মসজিদ গড়ে উঠেছে। এসব মসজিদে আজান ও ওয়াক্তি জামাত নিয়মিত হয়ে থাকে। নিউপোর্ট শহরে মুসলমানের সংখ্যা সহস্রাধিক। এখানেও একটা বড় মসজিদ আছে। কার্ডিফ শহরের অনতিদূরে মুসলিম অধিবাসীরা সকলে উদ্যোক্তা হয়ে নিজ খরচে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেছে। লন্ডনের পিকাডেলী এলাকায় ভূগর্ভস্থ একটি মসজিদ আছে। ইসলামী কালচার সেন্টার নামে মসজিদটি লন্ডনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র এবং এই মসজিদের প্রথম ইমাম ছিলেন মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষাবিদ ডঃ আলী আব্দুল কাদের। অনেক বৃটিশ নাগরিক যুক্তরাজ্যের এই কেন্দ্রীয় মসজিদে এসে ইসলাম গ্রহণ করছেন। বেশ কিছু সংগঠন যুক্তরাজ্যে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত আছেন। তারা অনেকের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে মানব জীবনের আধ্যাত্মিক সত্ত্বার কথা সমভাবে প্রচার করে যাচ্ছেন। লন্ডনে ইসলামী শক্তিকে মাথা উঁচু রাখতে বেশ কয়েকটা ইসলামী সংগঠন নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে যাচ্ছে।

লণ্ডনে কিছুকিছু অমুসলমান ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে। লন্ডনে ইসলামী কাউন্সিল ফর ইয়োথ নামে একটি সংগঠন ইসলামের নীতি এবং আদর্শ শিক্ষিত মহলে পৌঁছে দেওয়ার কাজে লিপ্ত আছে। (সূত্রঃ ইসলাম সোপান)

www.amarboi.org

বর্তমানে আমেরিকার মত একটি বৃহৎ দেশে ইসলামের ঝাণ্ডাধারী অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা ইসলামের দাওয়াতের সুন্দর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। খবরে প্রকাশ ১৯৬০ সালে আমেরিকায় সাদাকালো বিশ হাজার নারীপুরুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। তাদের মধ্যে অনেকে ছিল উচ্চ শিক্ষিত, বিজ্ঞানী, গবেষক, চিকিৎসক এবং উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী।

বর্তমানে আমেরিকায় মুলসমানের সংখ্যা কত এর সঠিক তথ্য আমার জানা নাই। তবে কোন এক সূত্র থেকে বুঝা যায় বর্তমানে আমেরিকায় মুসলমানের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষের কাছকাছি। আমেরিকার খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী মুষ্টিযুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণের পর ইসলাম প্রচারে নিজেকে সদা ব্যস্ত রেখেছেন। তবে আমেরিকায় ইসলাম প্রচারে মূলবাধা হচ্ছে ইহুদি মহল। অনেক সময় ইহুদিদের চাপের মুখে ইসলাম প্রচারে অনেকটা বাধা সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানা যায়। (সূত্র : ইসলাম সোপান)

আমেরিকায় কবে কোন সময় মুসলমানদের প্রথম আগমন ঘটে সে বিষয়ে তেমন কোন অনুসন্ধান হয়নি আজও। অনেকের মতে উনিশ শতকের প্রথম দিকে মোহাম্মদ ফারহাদ নামে জনৈক আরবীয়ান বণিক আমেরিকায় প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারে ভূমিকা পালন করেন। আমেরিকার বুকে সাদাকালো সকল স্তরের মানুষের ইসলাম গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে দীর্ঘকাল থেকে। বর্তমানে বিশ্বের বুকে অশিক্ষিত মুসলমান সমাজে পাপের তৎপরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ভিন্নধর্ম থেকে ইসলামে ধর্মান্তকরণের প্রবণতা ইসলামকে যেমন সজীব করছে (In Religious Practice And Spiritul Performance) তেমনি ইসলামের খোলসধারি কিছু সংখ্যক মুসলমান ষড়রিপু কামনায় ইসলামকে নির্জীব করে তুলছে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে তারা ধর্মসাধনের ক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড দ্বারা সত্যের ইসলামকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে নানা ভাবে। তাদের ধর্মান্ধতার চেহারা বড়ই ভয়ানক। তাদের মধ্যে ইসলামের মানমর্যাদা ভিত্তিক মনোভাব এবং উদ্দীপনার লক্ষণ তেমন চোখে পড়ে না। নিঃসন্দেহে এই শ্রেণীর মুখোশধারী মুসলমানেরা রিপুর তাড়নায় নিজেদেরকে ধ্বংসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করছে নানাভাবে। অভ্যাসদোষে এরাই ইসলামের ইজ্জত সম্ভ্রমের কলংক। পাপ স্রোতের তলদেশে তারা ক্রমে একটু একটু করে নিমজ্জিত হয়ে পড়ছে। এর ক্ষতিকর পরিণতি তারা

www.amarboi.org

বুঝছে না। জাতিসম্প্রদায় যখন পাপ পথের দিশারী হয় তখন তাদের মনোরাজ্যে বিস্তার লাভ করে জঘন্য প্রবৃত্তিগুলো।

খারাপ কাজ এবং পাপ চিন্তা সম্পর্কে তাদের কোন বোধশক্তি না থাকার কারণে তারা অন্যায় থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। মানুষ যখন ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় তখন তাদের কাছে মসজিদের কোন উপকারীতা কিংবা প্রয়োজনীয়তা থাকে না। মসজিদ তাদের কাছে নেহায়ৎ একটা মসজিদ মাত্র। আর কিছু না। তাদের মরচেধরা অন্তরে ইসলামের যে অবশিষ্টাংশটুকু থাকে তাও মন থেকে ঝেরে ফেলে দিয়ে ইসলামহীন জীবন যাপন করাটা তাদের কাছে ইহজগতের কামনা বাসনা। এতেই তাদের তৃপ্তি লাভ।

ইসলামী জ্ঞান সাধনায় হয় পাপ মুক্তি এবং মুক্তিতে আছে কল্যাণ আর এই কল্যাণে আছে সত্যাশ্রয়। আলোর সাথে অন্ধকারের যেমন কোন আপোষ নেই তেমনি ন্যায়ের সাথে অন্যায়ের, সত্যের সাথে মিথ্যার, পুণ্যির সাথে পাপের নাই কোন আপোষ, নাই কোন যোগাসন্ধি। ইসলামে নাই কোন অন্যায় অনাচার। ইসলামধর্ম পালনে আছে বিধিসম্মত পুণ্যময় জীবন যাপন।

ইসলামের সকল নিদর্শনের মধ্যে মসজিদ হচ্ছে একটি অন্যতম নিদর্শন। একারণে ঐশ্বরিক দৃষ্টিতে মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম। একজন মুসলমান দিনে পাঁচবার মসজিদে এসে নামাজের জন্য করুণাময় আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদন করলে মনের স্নিগ্ধতা রক্ষিত হয় এবং একই সাথে আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়। এই রহমত তার শান্তিময় জীবন যাপনের জন্য চরম প্রাপ্তি। মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে দমন করার উপায় হিসেবে দিনে পাঁচবার মসজিদে এসে ভক্তিভরে সালাত কায়েম করা। খারাপ কাজ এবং পাপচিন্তা থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায় হচ্ছে মসজিদে পাঁচবার উপস্থিত হওয়া। এ কারণে দেশের প্রত্যেকটি মসজিদ হচ্ছে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। কোরআন এবং হাদিসের মতো মুসলমানের মসজিদও ইসলামের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

www.amarboi.org

ইসলামী ভাবধারায় শিশু শিক্ষা

একটি জাতির উন্নতি এবং সার্বিক সমৃদ্ধির যতগুলো দিক আছে তার মধ্যে শিক্ষাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট দিক। শিক্ষার গুরুত্ব শিক্ষামনা এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরাই ভাল বুঝেন। পানির অপর নাম জীবন, পানি ছাড়া জীবন বাঁচে না। জীবনের জন্য পানির প্রয়োজন কতখানি তা সবাই উপলব্ধি করেন। তেমনি শিক্ষার অপর নাম আলো তাই শিক্ষা ছাড়া জ্ঞানালো জ্বলে না। জ্ঞানালো না জ্বললে জীবন হয়ে পড়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন। শিক্ষার অভাবে মানুষ হয় নিরক্ষর। নিরক্ষর ব্যক্তি সমাজ, দেশ এবং জাতির কাছে শত্রুরূপে গণ্য হয়। শিক্ষা গ্রহণ সবার জন্য প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা গ্রহণের জন্য কোন বয়ঃসীমা নেই তবে শিশুর শৈশব কালই হচ্ছে শিক্ষা সূচনার চমৎকার সময়।

ইসলাম ধর্মে শিক্ষার মর্যাদা এবং গুরুত্ব অনেক বেশী কারণ ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সার্বজনীন। শিক্ষা ছাড়া ধর্মানুসারীদের মধ্যে ধর্মচর্চা ইসলামে বিশৃংখল এবং অশান্তির জীবন যাপন। ধর্মজ্ঞান আহরণ, আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি এবং আল্লাহর বাণীগ্রন্থ চয়ন এসবের মূলে প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে শুভচিন্তায় জানিয়ে দেয় ইসলাম পরিমণ্ডলে জীবনচারণ পদ্ধতি।

আজ যাকে আমরা প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ বলছি একদিন সে শিশু হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে। এই শিশুর মধ্যে নিহিত আছে ভবিষ্যৎ মানুষটির সম্ভাবনা। সুতরাং সম্ভাবনাময় মানুষ পেতে হলে শুরুতে শিশু শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। জন্মের পর নানা পারিপার্শ্বিকতায় শিশু তার শৈশব সীমানা পেড়িয়ে পূর্ণ শক্তিতে বিকশিত হয়ে একদিন সে আর এক শিশুর পিতা পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এটাই মানব জীবন চক্রের ধারাবাহিকতা। শিশু মাতৃগর্ভ থেকে নিষ্পাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে কিন্তু পরবর্তীতে তার নিষ্পাপ জীবন আর থাকে না কারণ পারিপার্শ্বিকতার মন্দ প্রভাব তাকে পাপ প্রবণতার পথে টেনে নেয়। পরবর্তী জীবনে শিশুকে পাপাচার কার্যকলাপ থেকে মুক্ত রাখার উপায় হচ্ছে ইসলামধর্ম শিক্ষা। ন্যায় অন্যায়, পাপ পুণ্যি এবং হারাম-হালাল বুঝার জন্য প্রয়োজন ইসলাম শিক্ষায় নৈতিক জ্ঞান যা প্রত্যেক মানুষের জন্য

www.amarboi.org

একান্ত প্রয়োজন। নৈতিক জ্ঞানের সাথে ইসলামের আদর্শ না থাকলে মানুষের কর্ম ভাল হয় না। এ কারণে ইসলাম হচ্ছে মঙ্গলের অস্তিত্ব। নৈতিক জ্ঞান অর্জন ছাড়া মানুষের মুক্তি নেই। শিক্ষা কেবল মানব জাতির জন্য। অন্য কোন প্রাণীর জন্য বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নাই। মনুষ্যত্ব এবং পশুত্ব পাশাপাশি আছে বলে মানুষ ন্যায়ের অধিকারী এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীব।

আমার লেখার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কিভাবে মুসলিম জীবন ব্যবস্থায় ইসলাম ধর্মের প্রভাবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য পথে এনে তাদের ভাগ্য নির্মাণ করা যায়।

অতীতে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে শিশুর ইলেম শিক্ষা শুরু হোত মসজিদ থেকে। পিতা তার সন্তানকে সুন্দর পোষাকে মাথায় টুপি পরিয়ে জুম্মার দিনে নামাজ শেষে ইমাম সাহেবের কাছে শিশুর প্রথম হাতেখড়ি "বিসমিল্লাহির রহমানের রাহীম" পাঠ দ্বারা আরবী হরফ উচ্চারণ করিয়ে পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে সকল নামাজীরা শিশুর ইলেম শিক্ষার জন্যে পবিত্র দেহমন নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া খায়ের চাইতেন। এরপর পারিবারিক নিয়মে আরবী এবং বাংলায় শিশুর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হোত।

মানব জীবনে শিক্ষার প্রারম্ভিক যাত্রা শুরু শৈশবে শিশুর পিতামাতার কাছ থেকে। শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রকৃত পক্ষে কোন বয়স কিংবা নির্দিষ্ট সময় নেই। জ্ঞান সন্ধানের জন্য শিক্ষা গ্রহণ সব সময় সমাদৃত। শিক্ষার ফলপ্রসূ কার্যকারিতা শিশু কিশোর কিশোরীদের মনের মধ্যে প্রতিফলন ঘটাতে না পারলে তাদের নির্মল চরিত্র হয় কলুষিত। শিশু শিক্ষায় রোপিত বীজ অঙ্কুরোদগমনে শুকিয়ে গেলে নতুন গড়নে শিক্ষায় প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত আসে নিদারুন ব্যর্থতা। শৈশবে শিশুর মেধাশক্তির কোমল মনে যদি কোন অজ্ঞতা, ভ্রান্তি কিংবা সত্য স্থানচ্যুতি দাগ কাটে তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে জাতীয় ক্ষতির কারণ। এ কারণে শিক্ষকের শিক্ষা দানে থাকতে হবে সুনিশ্চিত জ্ঞান।

মানব জাতির শিক্ষার প্রথম সূচনা হয় শিশুর শৈশব অবস্থা থেকে। পরিবারে জন্মের পর থেকেই শিশুটি দ্রুত শিখতে শুরু করে। বলা যায় দু'বছর বয়সের মধ্যেই শিশুর মস্তিকের গঠন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যায়। শিশুর

www.amarboi.org

আচার-আচরণ কেমন হবে তা নির্ভর করে তার শিক্ষাদীক্ষা এবং পরিবেশের উপর। এজন্য দরকার শিক্ষিত পিতামাতা। একমাত্র পিতামাতা শিশুর জীবনে সুন্দর ভিত গড়ে দিতে পারে। শিশুর বিকাশ সাধনে পিতামাতারাই প্রধান কারিগড় এবং এই বিকাশ মূল্যায়নে তারাই শ্রেষ্ঠ বিচারক। এক্ষেত্রে পিতা অপেক্ষা মাতার ভূমিকা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় শিশু মাঝারী জোরে শব্দ শুনতে এবং ভাষাহীন সুরে শব্দ উচ্চারণ করতে পছন্দ করে। এ জন্যে মাকে অবশ্যই হতে হবে শিক্ষিত মহিলা।

শিশুর প্রথম পরিচয় মুখ-মা এবং পরিচিত কণ্ঠস্বর মায়ের। মায়ের কণ্ঠস্বর শিশুর শোনার জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুমিষ্ট ধ্বনি। শিশুর আবেগ অনুভূতি বুঝতে হলে মাকে হতে হবে শিক্ষা দীক্ষায় উপযুক্ত। শিক্ষিতা মা শিশুর শরীরস্বাস্থ্য, মনমানসিকতা এবং ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার সবকিছু বুঝে উঠতে সক্ষম হবে। "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে" এর তাৎপর্য এবং গুরুত্ব জন্মদাত্রী মাকেই বুঝে নিয়ে আগামী দিনের ঈমানদার নাগরিক গঠনের দায়িত্ব নির্ভর করে মায়ের শিক্ষাবিধি ব্যবস্থা প্রয়োগের ওপর। শিশুকে প্রথম ইলেম দানকারী মা-ই হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ। শিক্ষিতা মায়ের আদর্শ শিক্ষায় তার সন্তানটি মাতৃগৃহে ধীরে ধীরে সুজ্ঞানে বৃহৎ বৃক্ষে আত্মপ্রকাশ ঘটে। মাটিতে বীজ পোঁতা হলে তার চতুর্দিকে থাকে মাটি, পানি ও বাতাস। এদের প্রভাবে বীজটা মাটি, বাতাস কিংবা পানি হয়ে যায় না। এটা হয় একটা চারাগাছ। তখন এই চারাগাছটি আস্তে আস্তে বড় হয়ে মাটি, বাতাস এবং পানিকে আত্মস্থ করে হয় একটা বৃহৎ বৃক্ষ। অনুকূল পরিবেশ না পেলে সে বীজ কোন কাজে আসে না। তাকে লালন করে বিকাশের সুন্দর পরিবেশ তৈরী করে দিতে হয়।

শিশু শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার মূল ধাপ হচ্ছে মা। একটা শিশু জন্ম নেওয়ার পর হতে সে তার মায়ের আদর যত্নে লালিত হতে থাকে। ক্রমে এই শিশু সন্তানটির বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার মায়ের কাছে কথা বলার সূচনা হয়।

শিশু তার দেহ মনের প্রবণতা মায়ের দেহ মনের প্রবণতা থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে থাকে। শিশুর সুন্দর স্বভাব, ভদ্র আচরণ সবই তার মায়ের কাছ থেকে শিখে থাকে। শিশুর কাছে ঘরের প্রথম মানুষ মা। মায়ের কাছে শিশুর আকর্ষণ বেশী। শিশুর কাছেও মায়ের আকর্ষণ ঠিক

www.amarboi.org

অনুরূপ। শিশুশিক্ষা দানে মা-ই শিক্ষা উপকরণের একমাত্র সকল প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম। তাই শিশুর প্রথম বিদ্যালয় মাতৃগৃহ। মাতৃগৃহই হচ্ছে শিশুর প্রথম গুরুগৃহ। নবী করিম (সাঃ) গৃহকে শিক্ষালয় ঘোষণা দিয়ে বলেছেন পিতামাতার বাসগৃহ হচ্ছে শিশুর প্রথম শিক্ষাগার।

যে পরিবারে শিক্ষিতা মা থাকে সেই পরিবারে সাধারণত তাদের সন্তনেরা নিরক্ষর হয় না। শিক্ষিতা মাকে তৈরী করে নিতে হয় তার সন্তানের শিক্ষা দানের অনুকূল পরিবেশ। মা ছাড়া এই কঠিন দায়িত্ব পালনে গৃহের অন্য সদস্যের পক্ষে অত সহজ সাপেক্ষ নয়। যেহেতু আমরা মুসলমান সে জন্যে শিশুর দু'তিন বছর বয়স থেকে তাকে বুঝাতে ও শিখাতে হবে আমাদের ধর্ম চেতনার দিকগুলো। ইসলামধর্ম চেতনায় শিশু কিশোরদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে যাতে তারা ধর্মকে ভালবাসতে শেখে। এ দায়িত্ব পিতামাতার। ইসলাম আমাদের ধর্ম। এই ধর্ম চেতনা এবং জীবনছন্দ দিয়ে শিশুর মনে বিস্তৃতি ঘটাতে পারে মায়ের ধর্মজ্ঞান প্রচেষ্টা। তবেই এটা হবে সাফ্যলের দিক। মায়ের প্রচেষ্টার পরিমাণ যত বেশী তার সন্তানের ধর্ম অনুভূতির পরিমাণও হবে তত নবলব্ধ। সংসারে শিশুসন্তান তার জনক-জননীর মাঝে যাতে কোন রকম মনস্তাত্ত্বিক ব্যবধান সৃষ্টি না হয় সে দিকে উভয়কে সজাগ থাকতে হবে যাতে করে সন্তানের মনে কোন দারুন অবস্থা সৃষ্টি না হয়।

শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। আজকের শিশু বড় হয়ে একদিন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে অথবা ইসলামের কাণ্ডারী হয়ে বিপদগামীদের সত্যের পথ দেখাবে। এটাই নিয়ম। শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে না পারলে পরবর্তী পর্যায় দেখা দেবে ব্যর্থতা এবং সৃষ্টি করবে নানা জটিলতা। শিশু পৃথিবীতে জন্মনেয় আপন সত্তায়। এরপর শিশুটি তার পরিবেশের মধ্য দিয়ে পিতামাতার চিন্তা চেনতায় উত্তরাধিকার সূত্রে গড়ে উঠে শিক্ষার নতুন জাগরণ নিয়ে।

পিতামাতার শিক্ষা দানের পাশাপাশি সমাজের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে সমাজ শিক্ষক রূপে ভূমিকা রাখতে পারে একজন সুপ্রতিবেশী। শিশুদের কল্যাণ কামনায় একজন আদর্শ প্রতিবেশী তার সুন্দর আচার ব্যবহার এবং স্নেহ ভালবাসার কথাবার্তা দ্বারা তাদের মনমানসে

www.amarboi.org

নৈতকি প্রভাব বিস্তার ঘটাতে পারে। প্রতিবেশীর বিনম্র ব্যবহারে শিশুটি তার কথা শ্রবণে আগ্রহী হয়ে উঠে। ফলে আদর্শ প্রতিবেশীর স্নেহ মমতা শিশুটির কাছে হয় ভিন্ন স্বাদের। গুরুজনের স্নেহভালবাসা শিশুকে আকৃষ্ট করলে তার মধ্যে শ্রদ্ধা বোধ জেগে উঠে। এ কারণে সমাজ রচনায় একজন আদর্শ প্রতিবেশী সনাতন সমাজ সংস্কারক এবং শিশুসমাজ উন্নয়নের ধারক। সুতরাং শিশুর জীবনে সুন্দর আচরণের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার জন্যে আদর্শ পাড়া প্রতিবেশীদের আন্তরিকতা অনেক খানি। শিশুর সাথে বিনয়ী হয়ে কথা বললে সেও তার সাথে বিনয় সুরে কথা বলতে চাইবে। শিশুরা সব সময় অনুকরণ প্রিয়। এই বিনয় আচরণ এক পর্যায় শিশুর সুন্দর অভ্যাসের সাথে মিশে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে তার আদবকায়দা এবং সুন্দর কথাবার্তা শিশুর কচি কোমল মনকে আকৃষ্ট করে তোলে। তখন আদরের গন্ধে শিশুর মন খুশিতে ভরে উঠে।

শিশুদের মধ্যে সৌজন্য বোধ না থাকলে পরবর্তী জীবনের সকল ক্ষেত্রে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। তখন এর কুপ্রভাব সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এ জন্যে শিক্ষার প্রথম ধাপ হতে অবলম্বন করতে হবে সাবধানতা। শিশু শিক্ষার সকল কর্মকান্ডকে ফলপ্রসু করতে হলে পিতামাতাকে হতে হবে অধিক যত্নবান। শিশুর জীবনকে বিকশিত করার কাজ একদিনে ঘটে না। ছাত্রাবস্থা থেকে এ কাজের প্রস্তুতি নিতে হয়। শিক্ষিত পিতামাতারই এ কাজের প্রাথমিক কারিগড়। তারাই সন্তানটিকে উপরে উঠার সিঁড়ি দেখাবে। তবেই তাদের শিশুটি একদিন হবে উন্নততর মানুষ।

শিশুর সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে তৎসম্বন্ধে তাদের পিতামাতা উভয়ের জ্ঞানের প্রয়োজন। শিক্ষার অভাব থাকলে পিতামাতা তাদের সন্তানদের সাথে সঙ্গত ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না। ব্যবহার দ্বারা শিশু কিশোরদের প্রতি অধিক কঠোরতা প্রয়োগ করলে তাদের জীবনে দুর্ভোগ টেনে আনতে পারে এ কথা ভুললে চলবে না। এজন্য সকল দিক চিন্তা করে সন্তানের প্রতি পিতামাতাকে আচার আচরণে হতে হবে সহজ এবং স্বাভাবিক; এতে শিশুর জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। শিশুটিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব নির্ভর করে বাবামার। এজন্যে শিশুকে পরিচালনা করার জন্য পিতামাতার থাকতে হবে ন্যায়সঙ্গত জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা

www.amarboi.org

এবং এর যথাযথ প্রয়োগ। পিতামাতার অন্তর্দৃষ্টি যত বেশী হবে শিশুর জীবন পরিচালনার কাজে সাফল্য লাভ হবে তত সহজ। শৈশব অস্থায় শিশুকে নমনীয় আচরণ বিধি সম্পর্কিত শিক্ষা দেওয়া এবং একই সাথে হাতে কলমে প্রাথমিক শিক্ষায় জ্ঞান দান করার দায়িত্ব নির্ভর করে বাস্তব পক্ষে মায়ের সঠিক যোগ্যতার উপর। এ কারণে শিশু প্রতিপালনের জন্য মা-জননীর ভূমিকা বলা বাহুল্য অনেক বেশী। স্নেহের বসে মায়ের সন্তান পালনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সবটুকু অত্যাবশ্যক। লালন-পালন দ্বারা শিশুর চরিত্র গঠনের ভিত তৈরীর কাজ মাকেই পালন করতে হয়। সু-সন্তান গঠনের ভূমিকায় প্রথমে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে মায়ের আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি থাকতে হবে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা। আধুনিক শিক্ষা এবং ধর্ম শিক্ষা এ দুয়ের সমন্বয়ে শিশুর চরিত্র গঠনে বাল্যশিক্ষা দেওয়া কঠিন না হয়ে, হয় অনেক সহজ। শিশুর লেখাপড়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ এবং সুযোগ করে দিতে পারলে শিক্ষার জন্য তাদের শিশুটি মেধার পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে।

পিতামাতা যে রকম চরিত্রের অধিকারী হয় তাদের সন্তানেরা পিতামাতার স্বভাব এবং চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সহজাত দোষগুণে তদ্রূপ অধিকারী হয়ে ওঠে। সন্তানের আচরণ তৈরী করার কার্যকারীতা নির্ভর করে পিতামাতার চারিত্রিক আচরণের উপর। পিতামাতা নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হলে তাদের সন্তানদের মধ্যে নৈতিক আচরণের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে। শিশু সন্তানেরা কিশোর কিশোরী বয়সে পদার্পণ করলে তাদের পিতামাতাদের হতে হবে অধিক সাবধানী এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন যাতে তারা কোন রকম বিপদের পথে পা না বাড়ায়।

শিশু এতটুকু বয়স থেকে কিশোর বয়সে আসলে তাদের মানসিকতায় পরিপক্কপতা আসতে শুরু হয় তখন পিতামাতাদের আচরণে, অধিক মাত্রা না হলেও সামাজিকরণের প্রক্রিয়ায় কিছুটা দৃঢ়তা রক্ষা করতে হবে। পিতামাতা আদর্শ শিক্ষা এবং ইসলাম ধর্মগুণের অধিকারী হলে সুসন্তান গঠনে যুগবৎ ক্রিয়া দ্বারা শিশুর সামাজিক ও চারিত্রিক গুণের বিকাশ ঘটে। তখন তাদের স্নেহের শিশু সন্তানটি সমাজের উপযুক্ত সদস্য হিসাবে বিকশিত হয়ে উঠবে চারিত্রিক গুণাবলীর আদর্শে।

পিতামাতাকে মুসলমান হিসেবে তাদের সন্তানকে ইসলামের আদর্শে করতে হবে বলিয়ান। সন্তানের মধ্যে ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো শিশুর

www.amarboi.org

কোমল মনের ভেতরে প্রবেশ ঘটানোর দায়িত্ব নির্ভর করে পিতামাতার শরিয়ত জ্ঞানের উপর। আল্লাহ্ এবং নবী; কোরআন এবং হাদীস সম্পর্কে সন্তানকে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া, নামাজ এবং আখিরাত এসব বিষয়ে সন্তানকে পরহেজগারী রূপে গড়ে তোলার যথাযথ দায়িত্ব নির্ভর করে পিতামাতার আবশ্যকীয় ধর্মজ্ঞানের উপর।

বলা বাহুল্য একজন ছাত্র যতটুকু সময় তার অধ্যায়নে ব্যয় করতে পারবে সে ততোটুকু জ্ঞান অর্জন উপভোগে সক্ষম হবে। সন্তানের জীবন চরিত্রের শুরুতেই পিতামাতাকে হতে হবে জ্ঞানবিধান পালনের ক্ষেত্রে পরম সহায়ক। পিতামাতা তাদের সন্তানের ভিত্তিপত্তন ঠিক মত তৈরী করে দিতে পারলে পরবর্তীতে তার মনন শক্তি হবে সবল। শৈশবে সন্তানের শিক্ষার শখ কমে আসলে নিশ্চয় তা উৎকুণ্ঠার কারণ। এরূপ যাতে না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে অভিভাবকদের। কর্তব্যবোধ নিয়ে পিতামাতাকেই তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে সন্তানের শিক্ষার প্রাপ্য যেন বাকী না থেকে যায়।

আরেকটা কথা, পরিবারে সদস্যদের মধ্যে শিক্ষা প্রচেষ্টায় গা না থাকলে বিদ্যাশিক্ষা সম্ভব হয় না। অপর পক্ষে শিক্ষাকে চিন্তার বাইরে রাখলে সর্বনাশ কেবল ঐ পরিবারের নয়, দেশ এবং জাতির জন্যেও। অল্প বয়স থেকে ছেলেমেয়েরা যাতে উদ্যমমুখী হয়ে জ্ঞানের দীপ জ্বেলে শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হতে পারে তার ক্ষেত্র তৈরী করে দিতে হবে তাদের অভিভাবকদের। তখন ঐ সন্তানটি জীবন সৃষ্টির মাঝে নিজেকে খুঁজে নিতে পারবে।

ইসলাম যেমন একটি আদর্শ ধর্ম তেমন ইহা একটি অমূল্য মানব সত্তা। ইসলাম এবং শিক্ষা দুটি একই বৃন্ত। এ দুটি একে অপরের পরিপূরক। তাই ইসলামের শক্তিই হচ্ছে শিক্ষা। ইসলাম শিক্ষাহীন সমাজকে স্বীকৃতি দেয় না। ইসলামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো মানব জাতিকে সৃজনশীল জীবনধারায় কল্যাণ এবং প্রেম ভালবাসা বিতরণ করে থাকে। পরম করুণাময় আল্লাহকে জানতে হলে চাই নিখুঁত শিক্ষা ব্যবস্থা। সন্তান ধর্মীয় বই পড়ে যে পর্যন্ত জ্ঞান পেলে হারাম হালাল, আখেরাতের ধারণা এবং ন্যায় অন্যায় পৃথকীকরণে সক্ষম সে পর্যন্ত হবে তার ইসলামে প্রাথমিক জ্ঞানের সীমা। এ জন্যে আল্লাহ পাক শিক্ষাকে ইসলামে ফরজ করে দিয়েছেন।

www.amarboi.org

পিতামাতারা তাদের ছেলেমেয়েদের যে ভাবে লালন পালন এবং পার্থিব আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করে তেমনি তাদের ছেলে মেয়েরাও পিতামাতার কাছ থেকে চাওয়া পাওয়ার দাবীদার। সন্তানের সকল কার্যকলাপ, চরিত্র গঠন এবং সংশোধনের দায়িত্ব পিতামাতাকেই নিতে হয়। শিক্ষিত পিতামাতারাই এই নিত্য নৈমিত্তিক গুরুদায়িত্ব পালনে সমর্থ হতে পারে। কেবল তারাই তাদের ছেলেমেয়েদের মন্দ পথ ও মন্দ কার্যকলাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। পিতামাতার এই সম্ভাবনাময় সাফল্য নিহীত থাকে সন্তানের ভালবাসা ও স্নেহমমতায়। জ্ঞানী এবং সচেতন পিতামাতা তাদের সন্তানকে যেমন প্রখর রোদ তাপ থেকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকে তেমনি দোজকের বিভীষিকাময় অগ্নিদগ্ধ যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পিতামাতাদের। তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ এবং তার কল্যাণময় জীবনের জন্য ধর্ম শিক্ষা দ্বারা তাদের সন্তানকে প্রকৃত মুসলমান তৈরী করতে পারলে ঐ সন্তানের আখেরাত জীবন হবে চিরসুন্দর। মুসলিম জগতে একটি সুশিক্ষিত ঈমানদার সন্তান সমাজের গর্ব, দেশের পরশমণি এবং পিতামাতার কাছে হীরের টুকরো এমন কি এই নেকবান সন্তানটি মৃত পিতামাতার জন্যেও হয় সদকায়ে জারিয়া।

সমাজে নিরক্ষর পরিবারে পিতামাতাদের জীবন পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান সচেতনতা না থাকার কারণে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে পশু পালনের মত দু'মুঠো ডালভাত খাইয়ে মাথায় বড় করে তোলে। গ্রাম্য ও শহুরে বস্তি পর্যায়ে এরাই সবচেয়ে নিম্নবিত্ত এবং বিত্তহীন সমাজ শ্রেণী। তাদের ঘরের সন্তানেরা সব সময় শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে কেবল তাদের ললাট শীর্ষে অভাবের কারণে। নিরক্ষর পিতামাতারা জন্মনিরোধ না জনার কারণে নির্বিচারে সংখ্যায় সংখ্যায় সন্তানোৎপাদন করে দেশ এবং জাতির চরম বোঝা সৃষ্টি করে সমাজে সর্বনাশ টেনে আনে অনাহূতভাবে। এই সব সমাজ পরিবারে সন্তানের সংখ্যা প্রতুল হওয়ার কারণে তারা সমাজের সকল সম্ভাবনাকে করে তোলে আতঙ্কিত। নিরক্ষর পিতামাতা তাদের সন্তানদের ভালমন্দ, ন্যায়অন্যায় এবং পাপপুণ্যি সম্বন্ধে কোন চিন্তাভাবনা করতে পারে না বলে তারা নিম্ন সমাজ পরিবেশে অন্নবস্ত্র সমস্যা নিয়ে পশুজীবন যাপন করে সারাটা জীবন। অনেক ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব উৎপাদনশীল জমিজায়গা এমনকি বসবাসের জন্য মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত থাকে না।

www.amarboi.org

অশিক্ষিত সমাজের সন্তানেরা যুবক বয়সে পদার্পণ করলে স্বভাবে হয়ে পরে নিষ্ঠুর, আচরণে হয় হিংস্র এবং তাদের জীবিকা নির্বাহে সীমাবদ্ধতার ফলে হয়ে পড়ে বেকার, আয় রোজগারে দেখা দেয় সমস্যা। থাকে না কাজ পাওয়ার তেমন কোন সুযোগ সম্ভাবনা। তখন তারা নিজেদের জালে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ে। একান্তে বেছে নেয় নরপশু জীবন। ক্রমে তারা অন্যায়ের পথে খুনখারাবী, ছিন্তাই এবং নানা অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। এজন্য দায়ী তাদের নিরক্ষর পিতামাতা এবং নিম্ন সমাজ ব্যবস্থা। নিম্ন সমাজের পিতামাতারা নিজেদের নিরক্ষরতার জন্য সন্তান গড়ার কাজে হয় অজ্ঞ এবং উদাসীন। জীবিকার জন্যে তাদের উদরের চিন্তাটাই হয় প্রধান সমস্যা।

নির্দ্ধিধায় স্বীকার রকতে হয় সুশিক্ষিতা ও সুযোগ্য মাতার গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা নিম্ন সমাজে অশিক্ষিতা মাতার গর্ভজাত সন্তান হয় অধিক নিকৃষ্ট এবং এই নিকৃষ্ট সন্তানেরাই শিক্ষিত সমাজে পাপাচারের প্রধান উৎস। অশিক্ষিত সমাজে পাপাচার ও হিংস্র প্রবণতা বড়ই মারাত্মক। এ কারণে তারা সমাজে সকল প্রকার অশ্লিল এবং অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকে সর্বক্ষণ। চুরি, মদ, জুয়া, চাঁদাবাজী, এসিড নিক্ষেপ এ সবই তাদের নিন্দনীয় চরিত্রের কলঙ্কগর্ভ কার্যকলাপ। এরাই হচ্ছে জাহিলিয়াত যুগের প্রতিচ্ছবি। অশিক্ষিত এবং নির্বোধ পিতামাতার কাছ থেকে তাদের সন্তানেরা শিক্ষা হিসেবে যা গ্রহণ করে তা একদিকে যেমন মারাত্মক অপরদিকে তেমনি দুর্বিষহ। জ্ঞানশূন্যতার কারণে তাদের সমাজ জীবনে জেঁকে বসে অন্যায়ের স্বেচ্ছাচারিতা। বিদ্যমান শিক্ষাহীনতার কারণে তাদের মাঝে বিরাজ করে জঘন্য মনমানসিকতা। অনেক সময় তাদের জীবন পরিমন্ডলে জন্ম নেয় ক্রোধহিংসার পাপাচারীতা।

অশিক্ষিত সমাজে তাদের ব্যবহৃত ভাষা উচ্চারণার্থে বড়ই নিন্দনীয়। অভ্যাস দোষে বেফাঁস কথা তাদের মুখ থেকে আপনা আপনি বেরিয়ে আসে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নীচু লোকেদের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে অশ্লীল বাক্য। এই সকল মানুষেরা খারাপ অভ্যাস দ্বারা নিজেদের পাপের বোঝা ভারী করে জীবনকে করে তোলে কলুষময়। তারা গরীব থেকে আরও গরীব অবস্থায় নিমজ্জিত থাকার কারণে নৈরাশ্যব্যঞ্জক মনোবৃত্তি নিয়ে তাদের সন্তানদের হেলায় ফেলায় লালন পালন করে থাকে।

www.amarboi.org

সমাজে নিরক্ষর পরিবার ধর্মজ্ঞানহীন হলে তারা হয় ইসলামহীন জৈবপ্রাণী। এজন্য অশিক্ষা ইসলামে মহাপাপ। শিক্ষার সাথে ইসলামের একটা আত্মিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠভাবে বিদ্যমান আছে। যেখানে শিক্ষা নাই সেখানে ইসলামের কোন কার্যকারীতা থাকে না। শিক্ষাহীনতা থেকে সৃষ্টি হয় হিংসাত্মক কার্যকলাপ এবং পশুপ্রবৃত্তি। একদিন জগৎ ধ্বংসের এটাই হবে মূল কারণ। স্বার্থপরতা, হত্যা, রক্তারক্তি, ব্যভিচার, কামপ্রবৃত্তি সবেমিলে সমাজকে করে দেয় নরক রাজ্য। বলার অপেক্ষা রাখে না এই মহাপপের জন্য আল্লাহ্ পাক পৃথিবীতে বহু জাতি ও সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করেছেন।

সামাজিক এবং রাষ্ট্রিকভাবে নিরক্ষর পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেও অধিকাংশ নিরক্ষর পরিবারে ছেলেমেয়েরা এই সুযোগ গ্রহণ করে না। এই অনীহার কারণে তাদের সমাজ জীবনে পাপের অনুপ্রবেশ ঘটার পথটা হয় সুগম। জ্ঞানশক্তির আকার প্রকার না থাকার কারণে তারা ভালমন্দ কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে তাদের বাঁচার জীবনে ভেতর বাইরে থাকে একই অবস্থা। তাদের চেতনায় থাকে অভাব। চেতনাহীন মানুষ কোন অবস্থাতেই নিজের উন্নতি তো দূরের কথা তার অনবতির কথাও চিন্তা করতে পারে না। তারা জ্ঞানের আলোটাকে শত্রুমনে করে দিনের আলোটাকে অনেক বড় করে দেখে। জ্ঞানহীনতার কারণে তাদের ছেলেমেয়েদের লালন পালনের ক্ষেত্রে বিরাজ করে চরম উদাসীনতা। একারণে তাদের ছন্নছাড়া জীবনে থাকে না সুখের চাহিদা। ফলে রোগশোক এবং দারিদ্র্যের জটিলতা নিয়ে তারা বেঁচে থাকে সারাটা জীবন। অনিবার্য দুঃখকষ্টের বোঝা নিয়েই চলে তাদের মৃত প্রায় জীবন। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানহীনতাই তাদের নরক জীবনের উৎস। নিরক্ষর সমাজে শৈশব অবস্থাটাকে মজবুত করতে হলে প্রয়োজন শিশুশিক্ষা। শিক্ষার অভাবে জাতির একটা অংশে পচন ধরলে সমাজ সত্তার বাকী অংশ সুস্থ থাকার বিপরীতে সৃষ্টি করে অনেক সমস্যা। এরূপ ভয়াবহ অবস্থায় প্রতিকারের দিকে নজর না দিলে অর্থাৎ সতর্ক না হলে একদিন এরাই হবে সমাজ ধ্বংসের কারণে।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই, যে রাষ্ট্রের আদর্শ যত বেশী সেই রাষ্ট্রে মানব উপযোগী আদর্শিক পরিবেশ হয় তত গর্বের। একটি আদর্শ

www.amarboi.org

রাষ্ট্র বিবেকের ধারক এবং বাহক হিসেবে নিম্ন সমাজ জীবনের ভ্রান্ত ধারণাগুলো পাল্টে দিতে পারে। সুতরাং সু-সামঞ্জস্য কর্মপদ্ধতি রাষ্ট্রের জন্য একটি কল্যাণকর উদাহরণ।

মানুষ গড়ার প্রথম ফ্যাক্টরী হচ্ছে মাতৃগৃহ। এখান থেকে সন্তানটি পর্যায়ক্রমে শিক্ষার সকল স্তর অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষা শেষে দেশের মানসম্মানে মূল্যায়িত হয়। এটাই শিক্ষা গ্রহণের নীতিগত প্রক্রিয়া। ছাত্র শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ থাকলে তার চারিত্রিক কার্যকারিতা হয় চিত্তগ্রাহী। ছাত্রজীবন হচ্ছে সৃজনশীল জ্ঞান অর্জনের মাপকাঠি। সে তার ছাত্র জীবনে শিক্ষকের প্রতি অনুগত থাকবে। শিক্ষকের সকল আদেশ নিষেধ পালনে ছাত্র সদা আগ্রহী থাকলে এবং শিক্ষকের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলে ঐ শিক্ষকের বিদ্যাদান ছাত্রের অন্তরে সুন্দর ক্রিয়া করে। একজন ছাত্র যত বড়ই শিক্ষিত হোক না কেন পরবর্তীতে সে তার শিক্ষকের কাছে চিরদিন ছাত্রই থেকে যায় যেমনটি একজন বৃদ্ধ সন্তান তার পিতামাতার কাছে চিরদিন বালকসুলভ সন্তানই থাকে।

ছাত্রকে হতে হবে তার শিক্ষকের প্রতিকৃতি। ছাত্র শিক্ষকের আদর্শ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে তার ছাত্রজীবন অসমাপ্ত থেকে যায়। একজন প্রতিভাবান ছাত্রকে ভাবতে হবে সে কি আছে এবং কি হতে পারে এই দুয়ের তুলনা দিয়ে তাকে জ্ঞানের অভিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে এবং আবিষ্কার করে নিতে হবে তার নিজের মত করে।

ছাত্রকে জ্ঞান দানের সাথে শিক্ষকের সকল সহানুভূতি ছাত্রের কাছে আশীর্বাদ। ছাত্র তার শিক্ষকের নিকট যে শিক্ষা লাভ করে, পরবর্তী কর্মজীবনে এটাই তার ভবিষ্যৎ সাফল্যে জীবনচুম্বক হিসেবে কাজ করে। ছাত্রের শিক্ষা গ্রহণে ত্রুটি থাকলে তার কর্মজীবনে সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে এনে দিতে পারে পরাজয়ের গ্লানি। এজন্য শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে নিজের মধ্যে চিত্তসাহস সঞ্চয় করে মনোবলে হতে হবে আত্মবিশ্বাসী। তখন ঐ মনোবলের সবটুকু ছাত্রের সকল ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। সাহস এবং মনোবল হচ্ছে জীবনের কল্যাণকামী সৌন্দর্য বিকাশ। সাহস অর্জন করে মনোবল তৈরী করতে পারলে বিজয় তার হাতে এসে ধরা দেয়।

www.amarboi.org

প্রকৃত পক্ষে সঠিক মানুষ গড়ার দায়িত্ব শিক্ষকের উপর। শিক্ষকের শিক্ষাদানের সাথে সাথে ছাত্রকে বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে তার শিক্ষককে। ছাত্রের জ্ঞান ও মেধাশক্তি তৈরী করার দায়িত্ব একজন আদর্শ শিক্ষকের। গৃহের যোগ্য পিতামাতা এবং বিদ্যালয়ের আদর্শ শিক্ষক উভয়ের অবদানে ছাত্রের পরবর্তী জীবন সংগ্রামে গড়ে তুলতে পারে তার অপরাজেয় প্রতিদ্বন্দী শক্তি। তাই নতুন কালের নতুন শক্তি নিয়ে ছাত্রের মাঝে ধর্মশিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষা দুটোর সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে।

কথাটা অপ্রীতিকর হলেও নির্মম সত্য, দেশে বিশেষ করে মফস্বল অঞ্চলে অনেক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদর্শ শিক্ষকের কিছুটা অভাব থেকে গেছে। এ কারণে পল্লী অঞ্চলে অনেক ছাত্রছাত্রীরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে না। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষার্থীকে নিম্ন মানসম্পন্ন শিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি অন্যতম গরীব দেশ হওয়ায় মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্ররা হাতেগুণা কয়েকটি আদর্শ বিদ্যালয় দেশে থাকলেও আর্থিক ব্যয় বহুলতার কারণে তাদের জন্য আদর্শ শিক্ষার দ্বার সব সময় রুদ্ধ। ইদানিং মেধাবী এবং প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের জন্য বেশ কিছু আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনাখরচে অথবা সুলভ শিক্ষার জন্য পড়াশুনা করার সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছে। বলা বাহুল্য মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা তাদের উদ্দীপ্ত প্রতিভায় বিকশিত হতে পারলে জাতির কান্ডারী হয়ে একদিন তারাই দেশের সৃষ্টিকর্মের বিশালতায় দীপ্ততেজে মহিমান্বিত হয়ে জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করবে।

অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের জ্ঞানমেধা যাচাই বাছাই করলে প্রতিয়মান হবে তাঁদের মধ্যে বেশকিছু বাতিলগণ্য শিক্ষক শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন। তাঁদের অনেকে এই পেশায় প্রবেশ করার উদ্দেশ্য কেবল একটি চাকরি পাওয়া ছাড়া আর কিছু নয় এবং এটাই তাদের জীবন ধারণের উপকরণ। সুতরাং শিক্ষকতা পেশায় তাদের বিদ্যামূলধন যতটুকু দরকার এর বেশী তাদের অনেকে অনাবশ্যক মনে করেন। শিক্ষকতা পেশায় এই শ্রেণীর শিক্ষকের উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ উপার্জনে সাদামাটা

www.amarboi.org

পেশাকারী জ্ঞান যা এর বেশী তাদের কাছে অপ্রয়োজন। একারণে চাহিদা অনুপাতে দেশে পন্ডিত প্রবর শিক্ষকের অভাব। বস্তুতঃ এজন্য শিক্ষকতা পেশা জগতে অনেকটা ব্যর্থতা সৃষ্টি হয়েছে, আর এই ব্যর্থতার দায় ভার পরিশেষে জাতিকেই বহন করতে হয়। উল্লেখ্য, এই দুর্ঘটনা কিছুটা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজ করছে।

ইসলামে সুন্দর চরিত্র স্বর্গজ্যোতি স্বরূপ। সৎ চরিত্র স্বর্গীয় সম্পদ। চরিত্র রক্ষা করা মহৎ কাজ। এতে আছে বেহেশত লাভের নিশ্চয়তা। চরিত্রহীন ব্যক্তিরা লোভের পথে পশুতৃপ্তি সাধনের জন্য থাকে সদা জাগ্রত। তারা হীন দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে সমাজ, দেশ এবং জাতির জন্য অমঙ্গলের লীলাকৌশলী। আত্মকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে তারা নীতিজ্ঞানান্ধ। অমনুষ্যত্বের কারণে তারা জাতিকে ধ্বংসের গর্ভে নিক্ষেপ করার পরিচয় দেয়।

লোক প্রবাদে বলে যে, বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে একটি সুখের সংসার ধ্বংস করার জন্যে কারো কুবাসনা থাকলে সেই পরিবারে মামলা মোকদ্দমা প্রবেশ করালে, মামলার হারজিৎ নয়, মূলতঃ চোখের সামনে প্রাণান্তে যে অর্থ ব্যয় হয় এটাই সংসার ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন সুখের সংসারটি বদলে হয়ে যায় দুঃখের আলয় অথবা একটি দেশের মর্যাদা বিনষ্ট করতে চাইলে ঐ দেশটির শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে সংকট সৃষ্টি করলে ঐ দেশের ভবিষ্যৎ পরিণাম হয় নরকভূমি। শিক্ষাহীন জীবনে মানুষের ভাল মন্দ বোঝার জ্ঞান না থাকলে সেই জাতির ধ্বংস অনিবার্য। পক্ষান্তরে দেশবাসীকে অশিক্ষিত করে তাদের জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাইয়ে দিলে তখন তারাই হয় নিজ দেশের শত্রু।

জাতি গঠন প্রকল্প দ্বারা দেশে শিক্ষা বিস্তার ঘটাতে হলে শিশুশিক্ষা আরম্ভের গোড়ায় যত্নবান হয়ে প্রথমে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে শিক্ষার সাথে তাদের নৈতিক এবং চারিত্রিক প্রশিক্ষণ। শিক্ষার শুরুতে এখানেও প্রয়োজন দক্ষ অভিভাবক। উপযুক্ত অভিভাবকের অধীনে তাদের ছেলেমেয়েরা নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারলে চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে সবটুকু যশমানে বিকশিত হতে পারে। সমাজে সৃষ্টি বিকাশের জন্যে দরকার নৈতিক জ্ঞান এবং বিচার বুদ্ধি যা মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই পবিত্র সম্পদ অর্জন নির্ভর করে

www.amarboi.org

ধর্মীয় জ্ঞান এবং শিক্ষা সাধনার উপর। জ্ঞানের তেজ এবং ধর্মীয় শক্তি অর্জিত হলে তা মানুষের মাঝে বিশুদ্ধ চিত্তে কাজ করে।

শিক্ষার কাজ হচ্ছে জাতিকে জ্ঞান দানে সমৃদ্ধ করে সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত স্যার সৈয়দ আহম্মদ বলেন, "শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো নিজেদেরকে নীতিবান ও উৎকৃষ্ট নাগরিকরূপে গড়ে তোলা, কলুষমুক্ত ও শান্তিময় জীবন যাপন করা, উন্নত মানের সামাজিক ও চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করা, দেশের মর্যাদা ও শ্রীবৃদ্ধি হতে পারে এমন সব মহৎ ও উত্তম কাজে উদ্বুদ্ধ হওয়া।" স্যার সৈয়দ আহম্মদের এই উক্তিকে সামনে রেখে সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করতে হয়, সমাজে যাদের জীবন সৎ কাজে ব্যয়িত হয় না তাদের কখনও শিক্ষিত বলা যায় না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষা দানের মাধ্যমে তাঁদের ছাত্রদের জ্ঞান সাধনার পথ, কর্তব্য সম্পাদনের পথ, আত্মবিকাশের পথ, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার পথ এবং বলিষ্ঠ কর্ম পন্থার পথ তৈরী করে দেশপ্রেমিক জাতি গড়ে তোলার দায়িত্ব সংগ্রামী শিক্ষকদের।

এরূপ অবস্থায় বলা যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা যে ধরনের জ্ঞান গরিমা এবং চরিত্রের অধিকারী হবেন তাঁদের ছাত্র ছাত্রীরাও শিক্ষকের মতই হতে পারবে কিংবা বেশীর চেয়েও বেশী হতে পারবে। জ্ঞানের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হলে এর পাশাপাশি শিক্ষকদেরও যেখানে যতটা প্রয়োজন শিক্ষাগত, চরিত্রগত ও কর্মগত অবস্থার দিকে অধিক নজর দিতে হবে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে শিক্ষকদের শিক্ষাগত বিদ্যা এবং ধ্যানধারণায় কোন রকম বিকৃতি না আসে। শিক্ষা চালিকায় শিক্ষকেরাই হচ্ছেন ইঞ্জিন। ইঞ্জিনে ত্রুটি থাকলে সেটা হবে গোড়ায় গলদ। শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের হতে হবে বিশেষ যন্ত্রবান এবং থাকতে হবে তাঁর নিজস্ব কৌতূহল। তিনি জ্ঞান অর্জনে ও জ্ঞান দানে সর্বতোভাবে আগ্রহ নিয়ে চিন্তাশীল ভাবধারায় হবেন অনুসন্ধানী। তাঁর জীবিকার চেয়ে পেশা জীবনটাকে ভাবতে হবে বড় করে তারচেয়ে বড় কথা তাঁর পেশাকে গ্রহন করতে হবে জীবনের ব্রত হিসেবে।

মগজের চিন্তা নিয়ে ছাত্রের মনের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে প্রতিভা বিকাশের নবঅধ্যায়। শিক্ষকতার অন্তরঙ্গ পরিচয়ে শিক্ষককে চিন্তা করতে

www.amarboi.org

হবে তাঁর শিক্ষা পেশাকে নিয়ে। শিক্ষকের শিক্ষা যন্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে, প্রতিভার বিকাশ ঘটবে, সংস্কৃতির এবং মনন শক্তির ক্রমোন্নতি হবে। বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রকৃত মনীষী এবং মনীষার বিকাশ ঘটানোর দায়িত্ব শিক্ষকের নিজেরই। এ কথা প্রতিটি শিক্ষককে সদা স্মরণ রেখে তাঁকে হতে হবে শিক্ষা জগতের সত্যিকার অনন্ত অন্বেষা।

শিক্ষা উৎপাদনের জন্য স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানগুলো জ্ঞান তৈরীর কারখানা। বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিরাই জ্ঞান সমৃদ্ধ পুস্তক রচনা করে থাকেন। ভালমানের পাঠ্যপুস্তক মানে সমৃদ্ধ জ্ঞান সৃষ্টি এবং এরই মাঝে নিহিত থাকে জাতীয় জীবনের সার্বিক কল্যাণ এবং উন্নতি।

শিক্ষায় অবহেলা কিংবা অমনোযোগ জাতির জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ। জাতি শিক্ষার রাস্তা থেকে দূরে সরে গেলে তাদের অবনতি নিশ্চিত হয়ে পরে। পতনমুখী জাতি অন্ধকারে নিমজ্জিত জাতি। জ্ঞানহীন জাতি সকল সময় একটা নির্বোধ জাতি হিসেবে নিদ্রাঘোরে ঘুমন্ত জাতি। ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতি সব সময় বর্বর জাতি। একটি জাতিকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হলে শিক্ষা সোপানের প্রতিটি ধাপে প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষক এবং এই আদর্শ শিক্ষকই হচ্ছে জাতি গঠন কাজে জ্ঞানগুরু।

শিক্ষকের অর্জিত গভীর জ্ঞান পুষ্প সৌরভের মত ছাত্র চরিত্রকে মহিত করে দিতে পারে শিক্ষার প্রতিটি স্তরে স্তরে। আজকের ছাত্ররা শিক্ষা শেষে ন্যায়ের এবং গঠনমূলক পথে পরিচালিত হলে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সমাজে টিকে থাকবে। ইসলামের আদর্শে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সমাজ পরিমণ্ডলে ফিরে আসে মানব কল্যাণ। শক্তি হিসেবে ছাত্রদের জ্ঞানগর্ভ শিক্ষা, বলিষ্ঠ জাতীয় দর্শন এবং ধর্মীয় কর্মসাধনা দ্বারা সমাজে বয়ে আনবে শান্তির আশীর্বাদ, মানবিক অগ্রগতি এবং উন্নতির ঐশ্বর্য। এ ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য যত বিরাট হবে সব কিছুর বাস্তবায়নও হবে তত পূর্ণাংঙ্গ। এজন্য শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্দর চরিত্র গঠন। একজন আদর্শ শিক্ষক তার শিক্ষাদান প্রস্তুতিকে সামনে রেখে শিক্ষাদান করতে পারলে ছাত্রের মনোবিকাশের পথ উন্মুক্ত হবে অনায়াসে।

www.amarboi.org

সাধারণ কথায় শিক্ষক বলতে স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বুঝানো হয়, তা ঠিক। তবে গৃহের সন্তানটি যখন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা শেষে প্রবেশ করে তার কর্মজীবন পেশায় তখন তার কর্মস্থলটি হয় জ্ঞান অর্জনের আর একটি চারণভূমি। তখন এই শিক্ষিত যুবকটি তার কর্মক্ষেত্রে ধীরে ধীরে কর্মে মনোনিবেশ করতে থাকে। মানব জীবনে কর্মই ধর্ম। আল্লাহর বিধানে প্রত্যেকটি কর্ম ধর্মপালনের স্রোতধারা। কর্মজীবনে তার জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রটি হয় কলম পেশার আদর্শ লীলাকুঞ্জ ভূমি। এখানে তাকে নতুন দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে জীবন সাফল্যে হতে হয় উপযুক্ত।

পবিত্র কোরআন এবং হাদীসে হালাল রেজেক অর্জনের কথা উল্লেখ আছে। ইসলাম ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে হারাম হালাল পৃথকীকরণের জ্ঞান অর্জন হয় সহজ। হালাল রেজেক অর্জনের জন্য প্রয়োজন হালাল চিন্তা এবং ইসলামী মন মানসিকতা। কর্মে নির্মল ধর্মাত্মা না থাকলে তার অর্জিত রেজেকে পবিত্রতা থাকে না। এজন্যে সকল ইবাদতের পূর্বশর্ত হালাল রেজেক।

কর্মক্ষেত্রে নতুন নতুন মানুষের সাথে তার পরিচয় হয়। তাদের দর্শন এবং শিক্ষার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। কর্মক্ষেত্রে সকলের কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে সরিয়ে রাখাও সম্ভব নয়। ইসলামী শিক্ষায় নিজেকে বলিয়ান রাখতে পারলে তাকে কেউ ক্ষতির সম্মুখীন করতে পারে না। ইসলাম স্বীকার করে একজন মুসলমানের উৎকর্ষ বিকাশ এবং পরকালের মুক্তির পথ তার পরিচ্ছন্ন কর্মক্ষেত্রের মধ্যে বিদ্যমান। কর্মক্ষেত্রে সঠিকভাবে জীবন পরিচালনা করাটাও একটি পবিত্র ইবাদত। কারণ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জন করে নিতে হয় হালাল রেজেক।

কর্মক্ষেত্রে যিনি বসের ভূমিকা পালন করেন তিনিও তাঁর কর্মস্থলে অধিনস্থ সকল কর্মচারীদের শিক্ষক। কারণ কমকর্তা সুশিক্ষায় এবং শিষ্টাচারের অধিকারী হলে তিনি তাঁর অধিনস্থ সকল কর্মচারীদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হবেন। মানব জীবনে এটা ইহকাল ও আখেরাতের জন্য মুক্তির পথ। মানুষের কাছে দুটো ধর্ম আছে একটা জাগতিক অপরটি আখেরাতের জন্যে। প্রত্যেকটি শিক্ষিত লোকে এটা জানে

www.amarboi.org

কিন্তু অনেকে মানে না। মানব চরিত্রে আদর্শের প্রভাব একটা মূল্যবান দিক। এই সত্যের কার্যকারিতা যিনি উপলব্ধি করতে পারেন তিনিই তাঁর অফিসে একজন সুযোগ্য এবং শ্রদ্ধাশীল বস।

দেশের নেকবান রাজাবাদশা কিংবা গণতন্ত্রমুখি রাজনৈতিক নেতা নিজ দেশে সকল প্রজাদের প্রতি শিক্ষকের ভূমিকা পালন তাঁর আদর্শ পরিচয়। তিনি জ্ঞানে এবং ইসলামের আদর্শে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হলে শিক্ষকের ভূমিকায় দেশবাসীকে সামাজিক শিষ্টাচারে এবং জ্ঞান স্বচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করে তাদের মন মগজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করতে পারেন। তুরস্কের অধিনায়ক যেমনটি বুঝে ছিলেন তাঁর দেশের সকল মানুষগুলোকে যথাযথ ভাবে শিক্ষাদান করতে না পারলে দেশ একদিন চরিত্রধ্বংসে তলিয়ে যাবে। দেশের প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলে শিক্ষার মাধ্যমে প্রজাদের জীবন শিল্প গড়ে তুলাই হচ্ছে রাজনেতাদের কর্তব্য পালন। দেশের প্রত্যেকটি মানুষের সুখ-সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব দেশনায়কের। দেশনয়াক সৎ চরিত্রের অধিকারী হতে পারলে তার নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে মানুষের মঙ্গল প্রতিফলিত হয়। এজন্য দেশ নায়কের জন্য দরকার ইসলাম ধর্মের উপর পূর্ণতা অর্জন। তখন রাজনেতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের ভালমন্দ নির্ধারনের শাসন দক্ষতা। দেশের রাজাবাদশা অথবা রাজনৈতিক নেতাদের সকল কর্মকাণ্ডে শিষ্টাচার বোধ না থাকলে রাজনৈতিক অঙ্গনে নেমে আসে অশান্তির কালোছায়া। রাজাবাদশা কিংবা রাষ্ট্রনেতা জাতির কাছে বিষবৃক্ষ না হয়ে একটি সবুজ সতেজ জ্ঞানবৃক্ষ হলে দেশবাসী সেই জ্ঞানবৃক্ষের শীতল ছায়াতলে পাবে কল্যাণময় জীবন।

আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠজীব মানুষ। প্রত্যেক বস্তুর যেমন পরিচয় আছে তেমনি মানুষেরও একটা নিজস্ব পরিচয় রয়েছে। মানুষ কিসের ভিত্তিতে সৃষ্টির সেরা জীব তার প্রধান দিক হলো তার জ্ঞানশক্তি। আল্লাহ মানুষের জ্ঞান, বিবেক এবং বিচার বুদ্ধির চেয়ে উৎকৃষ্ট ছাড়া অন্য কোন কিছু দিয়ে সৃষ্টি করেননি। এই গুণগুলো দিয়ে আল্লাহ আমাদের কল্যাণ বিধান করেছেন। এর দ্বারাই আমরা সব কিছু বুঝতে পারি এবং অনুধাবন করি। জন্তু জানোয়ারের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় জ্ঞান চেতনা কোন কাজ করে না। এজন্য মানুষকে বলা হয় জীবসম্রাট। মানব জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বের আদি অনন্তকে সামনে রেখে পরিণাম চিন্তা করা এবং এই চিন্তার জাগরণে

www.amarboi.org

সে বুঝতে পারে কোন্ বস্তু উপকারী এবং কোন বস্তু কল্যাণকর, কোন্ কোন্ বস্তু ক্ষতিকর এবং কষ্টদায়ক। জ্ঞানের আলোয় উপকারী বস্তু অর্জন এবং সমস্ত ক্ষতিকর বস্তু থেকে বেঁচে থাকা এই পরিচয়ে মানুষ জ্ঞানশক্তির চেতনায় শ্রেষ্ঠ জীব।

সাধারণতঃ দুটো জিনিষের ওপর ধর্মাদর্শ নির্ভর করে। একটা কর্মকাণ্ড অপরটি জ্ঞানকাণ্ড। আমরা যা কিছু করি সবই কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। আবার কর্মকাণ্ডেরও দুটো দিক আছে, একটা ভাল অপরটা মন্দ। স্বেচ্ছাচারিতা অথবা মন্দ কর্মকাণ্ডের গতিতৎপরতা বয়ে চলে দুর্গতির দিকচক্রের দিকে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ এরশাদ করেন, "যারা অবিশ্বাস করে, ভোগবিলাসে মগ্ন থাকে এবং জন্তু জানোয়ারের মত উদরপূর্ণ করে তাদের নিবাস জাহান্নাম" (সূরা মুহাম্মদ আয়াত-১২)।

আল্লাহ্ পাক আমাদের মধ্যে রুহ্ দান করে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের মৃত্যু ঘটবে অর্থাৎ দেহ্ মরবে, আত্মা মরবে না। আমাদের নাফসের সকল মন্দ কাজের প্রাপ্য বড়ই কঠিন এবং আছে লাঞ্ছিত শাস্তি। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন, যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে তারা আমার আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে, তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ," (সূরা আনক্বাবুত, আয়াত-৪)। মুসলমান জাতি হিসেবে আমাদের বাঁচতে হলে আল্লাহ্ ও রসূলের সকল আদেশ নিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। এগুলি হেলায় উপেক্ষা করলে আমরা অমান্যকারী হিসেবে হবো বিভ্রান্তকারী। অমান্যকারীর মূল ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম যা কঠিন শাস্তির স্থায়ী ঠিকানা। নামাজ কায়েম করা, রোজাব্রত পালন করা, যাকাত প্রদান করা, সামর্থ ব্যক্তির জন্য হজ্জব্রত পালন ইসলামী কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

জীবন জীবিকার তাগিদে মানুষকে বেছে নিতে হয়েছে বিভিন্ন প্রকার পেশাবৃত্তি। সততার সাথে কর্ম করে অর্থ উপার্জন, চাকরি কিংবা অন্য কোন পেশায় বহাল থেকে আয় রোগজার করা, ধর্ম বিধান মতে কৃষি কাজ পালন করে রেজেকের জন্য ফসল উৎপাদন করা সবই মানব কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। রিজিকের জন্য হালাল পন্থায় রিজিক অনুসন্ধানে আল্লাহর নির্দেশ আছে। জীবিকা অর্জনের জন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য। বিশ্ব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এবং সভ্যতা বিকাশে ব্যবসায় বাণিজ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ কারণে নবীজী বলেছেন সৎ এবং আমানতদার ব্যবসায়ীরা

www.amarboi.org

হাশরের দিনে নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথী হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবনের জন্য যা কল্যাণকর তা যদি শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে করা হয় তবে তা হবে বৈধ। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধের বিষয়টি ইসলামে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সততা অবলম্বন করে বৈধ উপায়ে ব্যবসা পরিচালনা করা ইসলামের দৃষ্টিতে পুণ্য বিধান।

সংসারধর্ম পরিবেশে পিতামাতা, স্ত্রী, পুত্রকন্যা একত্রে বসবাস করে হক হালালী রেজেক দ্বারা সনাতন জীবন যাপন ইসলামের কর্মকাণ্ড ভুক্ত। কর্মকাণ্ডকে ঠিক ঠিক ভাবে পালন করতে হলে প্রয়োজন জ্ঞানকাণ্ড। এই জ্ঞানকাণ্ডই হচ্ছে সমুদ্রগামী জাহাজের মত প্রথম পোতাশ্রয় থেকে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে তার লক্ষ্য পথের শেষ গন্তব্য বন্দরে পৌছানো পর্যন্ত জ্ঞানকাণ্ডের ভূমিকা পালন।

জ্ঞানকাণ্ড থেকে মানুষের সম্ভাব্য জ্ঞানশক্তির উৎপত্তি লাভ করে যার ফলশ্রুতিতে আমরা জীবনের অনেক কিছু জ্ঞান দিয়ে ধরতে পারি, বুদ্ধি দিয়ে উচিত অনুচিত বুঝতে পারি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে তা সমর্থন করি। এগুলো সবই জ্ঞানের সদব্যবহার। কর্ম সম্পাদনের শেষপ্রান্তে পৌছানো পর্যন্ত মানুষ তার জ্ঞানের মাধ্যমে যদি জ্ঞান শক্তি দিয়ে পরিচালিত করতে না পারে তবে তাকে ব্যর্থতায় ভুগতে হয় দীর্ঘ সময় ধরে। সুতরাং জ্ঞান মানুষের প্রদীপ্ত জ্যোতি। জ্ঞান মানুষকে গতিময় করে রাখার প্রাণশক্তি। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, যার জ্ঞান নাই আল্লাহ তাদের হৃদয়কে মোহর করে দেন" (সূরা রুম, আয়াত-৫৯)। এ জন্যে জ্ঞান অর্জন মানব জীবনের আজ্ঞাধীন তত্ত্বাবোধ (Knowledge Of Fundamental Truth)। জ্ঞান চর্চায় মানুষের স্বচেতনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং সেখান থেকে সে তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য পরায়নতার উৎকর্ষ সাধন ঘটিয়ে সৎ কাজের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ এরশাদ করেন, "যে কেউ সৎ কাজ করবে সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাবে এবং যে কেউ মন্দা কাজ করবে তাকে অধোমুখে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে।" (সূরা নমল, আয়াত ৮৯-৯০) সুতরাং ধর্মশিক্ষায় বলিষ্ঠ জ্ঞান আল্লাহর কাছে ভাল কাজের প্রতিশ্রুতি।

মানব জাতির মূল উৎপত্তিস্থল মানব শিশু। বাবামায়ের স্নেহ ভালবাসা এবং নজর দায়িত্বে শিশু শৈশব অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ বয়সে পদার্পণ করলে তাকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা নির্ভর করে অভিভাবকের কর্তব্য

www.amarboi.org

পালনের উপর। অশিক্ষিত বাবামা শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে অনাগ্রহী হলে তাদের শিশুটির ভবিষ্যৎ জীবনকে করে তোলে বিভীষিকাময়। শিশুশিক্ষা প্রারম্ভের চেষ্টাচেতনা নির্ভর করে আদর্শ পিতামাতার উপর। পারিবারিক জীবনে শিশু ইসলামধর্ম শিক্ষার জ্ঞানালো না পেলে পরবর্তী জীবনে তার মাঝে বিরাজ করে অপরাধ চক্রান্ত কর্মকাণ্ড। তখন তাদের অর্জিত পাপরাশি সমাজকে করে তোলে নরককুণ্ড। এই অশুভ ধ্বংসের আবর্তচক্র থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে শিশুদের শৈশবকাল থেকে কোরআন এবং হাদিস শিক্ষার আলোকে প্রকৃত মুসলমান তৈরী করা।

ইসলামধর্ম শিক্ষা দ্বারা শিশুর মন মানসিকতা গড়ে না উঠলে ভবিষ্যতে তাদের ধর্মচর্চায় ঘটে অবনতি এবং বিনষ্ট হয় ধর্মের প্রতি আগ্রহ। ফলে তাদের জীবন যাত্রায় ইহকাল ও পরকালের ক্ষেত্রে দেখা দেয় দুঃখজনক পরিস্থিতি। সুতরাং রোধকল্পের জন্য প্রয়োজন সাধারণ শিক্ষার সাথে ইসলাম ধর্মশিক্ষা। ধর্মশিক্ষাকে চর্চার বেষ্টনিতে ধরে রাখতে পারলে তাদের ইহকাল ও আখেরাতের জীবন হয় সুন্দর এবং শান্তিময়। এ কারণে ইসলামী ভাবধারায় শিশুর হৃদয়মনে গড়তে হবে ধর্মশিক্ষার শক্ত বুনিয়াদ। অশিক্ষিত মুসলমান পরিবারে অজ্ঞতার কারণে কোরআন হাদিসকে পাশ কাটিয়ে বেঁচে থাকার জীবন যাত্রায় তাদের পরকাল হয় নরক নিবাস। সুতরাং জীবনে মুক্তির একমাত্র পথই হচ্ছে ঐশী পুণ্যি অর্জন। ব্যর্থতায় অনেক জটিল সমস্যা তাদের কাছে শক্ত বাধা হয়ে জীবনকে ঘিরে রাখে। পিতামাতাদের বুঝতে হবে অল্প বয়সে তাদের সন্তানের লেখাপড়ায় উদ্যম নষ্ট হয়ে গেলে বাকী জীবনটা আক্ষেপ করে মাথাকুটতে হয়।

শিশুর প্রতি শক্তি প্রয়োগ দ্বারা নয়, পিতামাতার সঠিক প্রচেষ্টা প্রয়োগ দ্বারা শিক্ষা দানের পথ অবলম্বন করতে হবে শিক্ষার দৃষ্টি নিয়ে। একটি মানব শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ না করেও নিজ গৃহে আদর্শ পিতামাতার পথ নির্দেশে উন্মুক্ত শিক্ষালাভে হয়ে উঠতে পারে ধর্মব্রতী। শিক্ষার দীপ্তালো প্রভাতী সূর্যালোর মত শিশু সমাজে ছড়িয়ে দিতে পারলে একদিন মুসলিম লোকশিক্ষায় আসবে নৈতিক মূল্যবোধ।

প্রকৃত জ্ঞানজ্যোতি দিয়ে মুসলিম জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হলে শিশুদের জন্য প্রয়োজন সাধারণ শিক্ষার সাথে ইসলাম ধর্মশিক্ষা। আজ যারা শিশু আগামীতে তারাই হবে শিক্ষাদানে শিক্ষাগুরু। শিশুদের জন্য

www.amarboi.org

নিরাপদ সমাজ গড়ে তোলার দায়িত্ব কেবল পিতামাতার তা নয় বরং এ দায়িত্বের হকদার হতে হবে আমাদের সকলকে। সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক ভাবে শিশু শিক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে তাদের শিক্ষার শখকে বাড়িয়ে তুলার জন্যে। শিশুদের অন্তরে রচনা করে দিতে হবে সুন্দর বিদ্যাবাগিচা যা তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেরণা যোগাবে। আজকের শিশুরা মহিমায় বিকশিত হলে আগামীকাল তারাই জ্ঞানসৌরভ ছড়াবে আমাদের নবপ্রজন্মের সমাজ পরিমণ্ডলের সকল ক্ষেত্রে। নতুন কালের নতুন শক্তি নিয়ে একদিন তারাই জাতির মঙ্গল সাধন করবে এবং তারাই হবে দেশহিতৈষী।

ফুলের গন্ধ বাতাসে মিশে ভরপুর হয়ে মনকে যেমন করে দেয় মাতোয়ারা তেমনি আজকের শিশুরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত এবং জ্ঞানাদর্শে বিদ্বান হতে পারলে অচিরে তারাই একদিন জ্ঞান মর্যাদায় বিকশিত হয়ে সমাজ এবং দেশকে করে তুলবে গৌরবোজ্জ্বল। একটি আদর্শ পরিবারের পিতামাতারাই তাদের সন্তানকে সুনাগরিক তৈরী করার প্রধান হাতিয়ার। তা না হলে দেশের ভাগ্যাকাশে আশার আলো একদিন ম্লান হয়ে যাবে। নতুন চেতনা নিয়ে আদর্শ সমাজের পিতামাতারাই তাদের সন্তানদের শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে হবে বিরাট অধিকারী। সকল শক্তির উৎসমূল হচ্ছে পিতামাতার মস্তিষ্কের তেজস্বী শক্তি। এখান থেকে জন্ম লাভ করে শিক্ষা সম্পদের অচিন্তনীয় জাগরণ।

এখানে আর একটা কথা বলতে চাই তা হচ্ছে আল-কোরআন যা সমগ্র মানব জাতির জন্য মহাগ্রন্থ এবং এই কোরআনই হচ্ছে সমুদয় শিক্ষার মূল শিক্ষা। আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের মাঝে কোরআন এসেছে মানুষের মুক্তির জন্য, মানুষের শিক্ষার জন্য, মানুষের উপদেশ গ্রহণের জন্য। আল কোরআনের শিক্ষা থেকে শিশু কিশোর কিশোরীরা যাতে বঞ্চিত না হয় তার দায়িত্ব তাদের পিতামাতাদের উপর। আল-কোরআনে অনেক গল্প কাহিনী আছে যা শিশু সন্তানদের শিক্ষা দেবে, তাদের আনন্দ দেবে, তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য সুন্দর পথ দেখাবে। পরিবারের সন্তানটি শৈশব থেকে ইসলামী সংস্কৃতিবেষ্টিত পরিবেশে সুশিক্ষায় জ্ঞানযশোমানের সংমিশ্রণে গড়ে উঠতে পারলে পরবর্তীতে সে দেশপ্রেমে যোগ্য নাগরিক হয়ে প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় সমাজে হয়ে উঠবে সৌরভান্বিত।

www.amarboi.org

মহতী পরিবারে পিতামাতা তাদের সন্তানকে শৈশবকাল থেকে আদর্শ শিক্ষা দানের সাথে ইসলাম ধর্মালোয় তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারলে একদিন ঐ সন্তানই হবে দেশের জনসমষ্টির মূলধন সম্পদ। দেশে মূলধন বৃদ্ধি পেলে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তখন ঐ উৎপাদিত পণ্য দ্বারা জাতীয় আকাঙ্ক্ষার অভাব পূরণের চাহিদা মিটে। অনুরূপভাবে দেশের জাতীয় কাঠামোয় শিক্ষা সম্পদের মূলধন বৃদ্ধি পেতে থাকলে জ্ঞানপ্রতিভার উৎপাদন পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পায়। তখন জ্ঞানসম্পদ মূলধনের মালিকানা স্বত্ত্বে দেশটি মালিক হয়ে যায়। দেশ উন্নত শিক্ষা সম্পদে সমৃদ্ধ হলে বিশ্বদরবারে তার জ্ঞান ঐশ্বর্যের খ্যাতি অর্জিত হয়।

www.amarboi.org

নারী শিক্ষায় ইসলাম

আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষই হচ্ছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীব। মাখলুকাতকে আল্লাহ পাক দুটি'খন্ডে বিভক্ত করে একটিকে নর অপরটিকে নারী রূপে দৈহিক এবং মানসিক পার্থক্য রেখে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। নারী জাতির পোষাক পরিচ্ছদ, চালচলন, আচার-আচরণ, খানা-পিনা, ধ্যান-ধারণা এমনকি কথাবার্তার কন্ঠস্বর পুরুষ স্বরভঙ্গী থেকে ভিন্ন মর্যাদা সম্পন্ন। সৃষ্টির ব্যবস্থায় নারী এবং পুরুষের কর্তব্য কার্য এক নয়। এই নারী শ্রেণীকে আমরা দু'পর্যায়ে দেখতে পাই। একটি গ্রামীণ নারী সমাজ অপরটি শহুরে নারী সমাজ। গ্রামীণ নারীরা সাধারণতঃ লাজুক স্বভাবের, লজ্জাশীলা ও পর্দানশীন এমন কি তারা বেশরমী বেল্লাপনা মোটেই পছন্দ করেনা। শিক্ষার আলো খুব কমই তাদের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ হয়েছে। গ্রামের নারী সমাজে অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাস তাদের সব সময় সমাচ্ছন্ন করে রাখে বলে তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে বড়ই অক্ষম। তারা শিক্ষায় অবহেলিত, তাই পড়ে থাকে পুরুষদের অনেক পেছনে। গ্রামের অধিকাংশ পরিবার গরীব এবং চরম দারিদ্র্যের শিকার হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে অশান্তি, অভাব অনটন, অসুখ-বিসুখ, জ্বালা-নির্যাতন, অধিক সন্তান, স্ত্রী তালাক এগুলি তাদের নিত্য দিনের বাস্তব চিত্র। এর মূল কারণ হচ্ছে শিক্ষার অভাব এবং অজ্ঞতা।

যখন মুসলিম নারী সমাজ প্রকৃতিগত এবং মৌলিক পার্থক্যের কারণে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে ছিল অসহায় তখন পুরুষ জাতি আপন স্বাধীন সত্তা নিয়ে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে শিক্ষার সুযোগ এবং কর্ম ক্ষেত্রের সুবিধা ছিল অনেক ব্যাপক। নারী জাতি নিজেদের পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকার কারণে তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা সবই পঙ্গুত্ব বরণ করে উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই তারা অসহায় অবস্থায় অদৃষ্টের কাছে নিজেদের সপে দিয়ে পুরুষ প্রভুর অত্যাচার, অবিচার, এবং লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করে সংসার জীবন কাটিয়ে দেয় তাদের কপালের লিখন মনে করে। বস্তুতঃ এর প্রধান কারণ নারী সমাজের বেশীর ভাগ মহিলা যখন অশিক্ষিতা, তখন তারা হয় অভাগী কপাল পোড়া দুঃখী নারী। তারা লেখাপড়ার সুযোগ

www.amarboi.org

থেকে সব সময় অবহেলিত থাকলেও ধর্মের ব্যাপারে অনেক সজাগ। মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা অশিক্ষিতা হওয়ার কারণে তাদের নিজস্ব জ্ঞান চেতনা অনেক সীমিত। লেখাপড়া না জানা কিংবা কম লেখাপড়া জানা মহিলাদের চলাফেরার সীমানা ছিল যেমন সীমাবদ্ধ তেমনি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে এককালে তাদের কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হোত। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষা গ্রহণে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। এই সকল পরিবারে মহিলাদের শিক্ষার সুযোগ কম থাকলেও পল্লী অঞ্চলের মহিলারা ইসলাম ধর্ম পালনে অনেক সন্ধিৎসা এবং আন্তরিক।

বর্তমানে শহরের মেয়েরা চলাফেরায় বেশ স্বাধীন ও চাকচিক্যময় জীবনে আকৃষ্ট প্রবণ যার জন্য তারা ধর্ম চর্চায় অনেক উদাসীন। পল্লী মহিলা এবং শহুরে মেয়েদের আচার আচরণ, বেশভূষার মধ্যে নিশ্চিত পার্থক্য ধরা পড়ে। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী সমাজ দিন দিন ধীরে ধীরে জীবন সঞ্চারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই এগিয়ে যাওয়াটা হচ্ছে মূলতঃ আধুনিক শিক্ষা জীবনে একটা অগ্রগতির দিক। তবে ইসলামী বিধান পালনের মূল্যবোধ তাদের চিন্তা জগতে অনেক কম বললেই চলে। নারী শিক্ষায় ইসলাম এবং ইসলামী ভাবধারায় নারী শিক্ষা এ দুটোর মাঝে রয়েছে পারস্পারিক যোগসূত্র। জীবনকে ধরে রাখতে হলে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এ কারণে জীবনের সাথে শিক্ষার প্রয়োজন বাঞ্ছিত। জীবন সংগ্রাম এবং শিক্ষা এ দুয়ের বিস্তার না হলে বাস্তব পক্ষে জীবনের পতন হয় অনায়াসে। আর যাই হোক, ছেলেদের মত মেয়েদেরও ধর্ম শিক্ষার জন্য থাকতে হবে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। ছেলেরা যদি মাদ্রাসা শিক্ষা দ্বারা ইসলাম ধর্মে জ্ঞান অর্জন করতে পারে তবে মেয়েরা তা পারবে না কেন? ছেলেরা যদি কোরআনে হাফেজ হতে পারে মেয়েরা তা পারবে না কেন? তদ্রূপ হতে না পারার কোন কারণ থাকতে পারে না। ধর্মশিক্ষায় জ্ঞান না থাকলে ইসলাম কখনও সজীব থাকে না। যখন পুরুষেরা মক্তব, মাদ্রাসা এবং স্কুল কলেজে একতরফা বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা জ্ঞানলাভ করে তখন নারী জাতি অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে অন্ধকারে হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকবে কেন? আনন্দের বিষয় বর্তমানে নারীরাও পুরুষদের পাশাপাশি নিজেদের স্থান করে নিতে ব্যর্থ নয়, সমর্থ হয়েছে। ইদানিং কালে স্বামীর ঘরে দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হওয়া কিংবা

www.amarboi.org

যাবজ্জীবন যাতনা ভোগের দিন তাদের অনেকাংশে কেটে গেছে।

ধর্মশিক্ষা লাভের জন্য ইসলাম নারীকে শুধু অনুমতিই দেয়নি বরং এটা ফরজ করেছে। জ্ঞান অর্জন নারী পুরুষ উভয়ের জন্য ফরজ। নবীজীর কাছে পুরুষেরা যেমন নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতো তেমনি নারীদের জন্যও তদ্রূপ ব্যবস্থা ছিল। নবী করিম (সাঃ) গৃহের দাসীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যও আদেশ দিয়েছেন "যার নিকট দাসী আছে এবং সে তাকে ভালভাবে বিদ্যাশিক্ষা দান করে, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয়, অতঃপর তাকে স্বাধীন করে বিয়ে করে তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার আছে" (বুখারী শরিফ)।

ইসলাম নারীকে যে ভাবে বিপুল সম্মান ও মর্যাদা দান করেছে অন্য কোন জীবন ব্যবস্থায় তা কখনও দিতে পারেনি। ইসলামের বিধান অনুযায়ী মুসলিম নারীজাতির মর্যাদাকে কতদূর বাড়ানো হয়েছে এ বিষয়ে মুসলিম নারীর সাথে অমুসলিম নারীর একটা তুলনামূলক সমালোচনা করলেই তা অনায়াসে বুঝা যায়।

নারী জাতির জন্য নবীজীর অন্যতম প্রধান সংস্কার হচ্ছে, তিনি নারীকে দিয়েছেন কল্যাণময়ী, মহিমাময়ী ও পুন্যময়ী রূপ। হযরতের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের দাসীর মত মনে করা হতো। সেভাবে তাদের ব্যবহারও করা হতো এবং তাদের নানাভাবে লাঞ্ছনাও ভোগ করতে হতো। নবীজী নারীজাতির মর্যাদা এবং সম্ভ্রম অনেক বেশী বৃদ্ধি করেছেন ইসলামের গুণাবলীতে। হযরত নারীজাতির দুর্ভোগ এবং নিন্দনীয় অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় ফিরিয়ে এনে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে ইসলামের ধর্মবিশ্বাসে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ইসলাম নারীকে নারীর মর্যাদা দান করেছে। নারী কখনও সমাজের প্রতিবন্ধক নয়। নবীজী বলেন নারীর প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধা ভালবাসা মজ্জাগত। একারণে নারী গৃহের রানী, স্বামীর কাছে সহধর্মিণী, সন্তানের কাছে মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে পুত্রবধূ। এই বহু মুখী পরিচয়ে নারীকে তার জীবনের সকল কর্মকাণ্ডকে কল্যাণপ্রসূ করে নিতে হয় নিজগুণে এবং বুদ্ধির কর্তৃত্ব দিয়ে। এই বহুমুখী মর্যাদা নিয়ে নারী তার জীবন ধারাকে বিভিন্ন পরিচয়ে দায়িত্ব পালনে গৌরবের অধিকারী হতে পারে যদি তার মধ্যে থাকে ইসলাম ধর্ম শিক্ষায় জ্ঞান অনুশীলন। তখন সে তার জীবন

www.amarboi.org

চরিত্রে শান্তি এবং উন্নতি বিকাশের প্রতিফলন ঘটিয়ে আদর্শ নারীর দৃষ্টান্ত রাখতে পারে।

ইসলাম নারী পুরুষ উভয়ের জন্য সর্বোপযোগী ধর্ম। ধর্ম মানুষের প্রাত্যহিক সহচর, তাই ধর্মের ক্রিয়াকর্ম হওয়া উচিত সহজ ও সরল মানের। ইসলাম সর্বকালের এবং সর্ব সাধারণের জন্য একান্ত উপযোগী সহজ পালন যোগ্য ধর্ম। এই ধর্মক্রিয়া যত কঠোর হবে উহা ততোই ব্যর্থ হবে। ইসলামে ধর্মের কঠোরতা কিংবা কোন বাড়াবাড়ির বিড়ম্বনা নেই। ইসলামে কোথাও কঠোর অনুশাসন নাই; এই ধর্ম কখনও কাউকে নিরাশ অথবা বিভ্রান্ত করে না। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন ঃ "ধর্মের জন্য কোন জবর দস্তি নাই। নিশ্চয়ই সুপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে।" (সূরা বাকারা, আয়াত-২৫৬) ইসলাম ধর্মের কঠোরতা যেমন দোষের তেমনি ধর্মের শৈথিল্য এবং উদাসীনতাও নিন্দনীয়।

নারী-পুরুষ একত্রে মিলেই মানব গোষ্ঠী। কেবল পুরুষেরা ধর্ম শিক্ষায় জ্ঞান অর্জন করে ইসলামের কল্যাণ সাধন করলে পিছনে পরে থাকা নারী জাতির অকল্যাণ রোধ করবে কে? নারী জাতি যদি শিক্ষায় জ্ঞানহীন থেকে যায় তবে সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় অর্ধেক অসমাপ্ত থেকে যাবে। ইসলামধর্ম নারীকে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়েছে। এই সুবিধা ভোগের জন্যে একমাত্র ইসলাম নারীকে আইনগত অধিকার প্রদান করেছে। জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে নারীকে তার সকল ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে হয়।

নারীর অধিকার আদায় নয়, তার প্রাপ্য অধিকার তাকে প্রদান করতে হয়। এটা আল্লাহ মাবুদের নির্দেশ। ইসলাম এমন একটি ধর্ম যেখানে নারীব্যক্তিক পরিবার এবং নারীর সামাজ জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আল্লাহর কল্যাণ নিহিত। দুঃখের বিষয় অনেক ক্ষেত্রে নারীকে এ বিষয়ে সংগ্রাম করে তার অধিকার আদায় করে নিতে হয়। একারণে আল্লাহ পাক পুরুষদের তুলনায় নারী জাতিকে শরিয়ত বিধান অনুযায়ী দিয়েছেন তদতিরিক্ত পরিমাণ অধিকার। পুরুষদের দিয়েছেন নারীর উপর কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী এবং পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক হলেও নারীর মর্যাদা তদবস্থায় বেশী। পুরুষের জন্য নারীর প্রয়োজন যতখানি নারীর জন্যও

www.amarboi.org

পুরুষের প্রয়োজন ততখানি হলেও ইসলামের বিধান মতে দুর্বল চিত্ত নারীর অধিকার এবং মর্যাদা অনেক প্রাধান্য পেয়েছে তার সৃজনধর্মী ভালবাসার জন্য। পুরুষ নারীর উপর প্রভাবশালী হলেও মর্যাদা ও গুরুত্বের বিচারে নারীর স্থান পুরুষের নীচে নয়।

যে কোন জাতির উন্নতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি হচ্ছে নারীদের প্রতি পুরুষ জাতির মনোভাব। প্রাচীন গ্রীসে স্ত্রী পুরুষের মর্যাদায় কোন পার্থক্য ছিল না। একারণে বলা হয়েছে অবিবাহিত পুরুষ অর্ধাঙ্গ এবং অসম্পূর্ণ। সুতরাং নারীর কাছে পুরুষের এবং পুরুষের কাছে নারীর প্রয়োজনীয়তা সমপরিমান। এই প্রয়োজনীয়তা তাদের মধ্যে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন যা তাদের উভয়ের জীবনের প্রেম ভালবাসা। অবশ্য এই ভালবাসা হতে হবে নিরপেক্ষ। তবেই নারীর অধিকার হবে প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ মাবুদ পুরুষদের নারীর অধিকারচ্যুত করতে নিষেধ করেছেন। নারী অধিকার ভোগে বঞ্চিত হলে সে কখনও ভাল ভাবে বাঁচতে পারে না। আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টির মাঝে সকল জীবের বাঁচার ন্যায্য অধিকার দান করেছেন। এজন্যে কেউ কাউকে তার বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে এমন কি বিরুদ্ধাচরণ করলেও সে হবে অপরাধী যা ইসলাম ধর্ম মতে কবীরাগুণা। এ কারণে নারীদের অধিকারচ্যুত করা মহাপাপ। অধিকারভুক্ত নারী বলতে বুঝায় কন্যা, স্ত্রী, মা এবং বোন। মনে রাখতে হবে পুরুষেরাই নারীমর্যাদার সংরক্ষক এবং ব্যবস্থাপক। এ কারণে তাদের অধিকার এবং সুবিচার অনস্বীকার্য যাতে নারীর কোন প্রকার অসম্মান না হয়। বলা যায় নারীদের ন্যায়সংগত অধিকার পুরুষদের মর্যাদার এক স্তর উপরে।

জন্মের পর থেকে নারীর বিবাহপূর্ব পর্যন্ত জীবন ধারণের পূর্ণ অধিকার অর্পিত হয়েছে পিতার দায়িত্বের উপর। বিবাহের পর জীবন যাপনের সকল অধিকার অর্পিত হয় স্বামীর দায়িত্বে। এ কারণে জীবনোপকরণের সকল বিষয়ে নারীদের অধিকার প্রদান করতে হয় পুরুষদের। এই অধিকার পালনের জন্য আল্লাহপাক নির্দেশ প্রদান করছেন পুরুষদের প্রতি। এখানে পুরুষ বলতে বুঝানো হয়েছে নারীর পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও সন্তান।

পিতা তার কন্যার প্রতি কর্তব্য পালন থেকে নিবৃত্ত হলে, স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে, ভ্রাতা তার অসহায় ভগ্নির দায়িত্ব

www.amarboi.org

পালনে বিরূপ হলে এবং সন্তান মাতার দায়িত্ব পালনে কোন প্রকার ক্রটি করলে তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে অভিযুক্ত হবে। কারণ এই দায়িত্ব পালন তাদের কাছে আল্লাহর বিধান। যতকাল কুমারী কন্যা, স্ত্রী, মা ও বোন জীবিত থাকবে ততকাল তার অধিকার তাকে দেবে, কেননা এটা আল্লাহ মাবুদের নির্দেশ। (সূরা নিসায় নারীর অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ্পাক বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। সুতরাং সূরা নিসা পাঠ করলে নারীর অধিকার সম্পর্কে সব কিছু জানা যাবে।)

স্বামীর সংসারে স্ত্রী হিসেবে তার অধিকার যতদিন থাকবে সে পর্যন্ত তাকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান নিরাপত্তা, চিকিৎসা এবং আদর ভালবাসা এসবের সুষ্ঠু ব্যবস্থা পুরুষের হাতে ওয়াজিব হিসেবে অর্পণ করেছেন মাহান আল্লাহ। এ কারণে স্বামী স্ত্রীর সকল বিষয়ে একমাত্র যিম্মিদার। ইসলামের ধর্মনীতি অনুযায়ী স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ স্বামীর প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে রয়েছে তার অধিকার। বলা বাহুল্য এই অধিকার একটা নির্দিষ্ট অংশ মাত্র। সবটুকু নয়।

স্বামীর কাছে স্ত্রী রত্ন স্বরূপ। স্ত্রীর প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা এবং তার মানসিক শান্তি রক্ষা করার দায়িত্ব নির্ভর করে স্বামীর কর্তব্য পালনের উপর। নারীর মর্যাদা সম্পর্কে বিবেচনা করলে আল্লাহর বিধানে স্ত্রী স্বামীর কাছে একটি মূল্যবান সম্পদ। মূল্যবান সম্পদ যেমন স্বযত্নে গোপন রাখতে হয় তেমনি নারীও লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে গোপন রাখবে যাতে তার দেহ সম্পদের উপর অন্যের দৃষ্টি না আসে এবং অন্যের অনুভূতিতে তার অস্তিত্ব যেন ধরা না পড়ে। এ কারণে ইসলামধর্মে পর্দা ব্যবস্থাকে ফরজ করা হয়েছে নারীর গুপ্ত সম্পদকে গোপন রাখার জন্যে। গুপ্ত সম্পদ কী? গুপ্ত সম্পদ হচ্ছে নারীর দেহ সম্পদ এবং তার সৌন্দর্যের কোমলতা। কোরআন পাকে আল্লাহ্ এরশাদ করেন, "নারী লোকচক্ষুর অন্তরালে ইজ্জত রক্ষাকারী।" আল্লাহ্ নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "হে নবী আপনি আপনার বিবিগণকে, কন্যাগণকে এবং মুসলমানদের স্ত্রীগণকে বলিয়া দিন তারা যেন চাদর অথবা বোরখা দ্বারা তাদের মুখমণ্ডল আবৃত রাখে।" এ কারণে নারীর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্য পর্দা ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। নারীর পর্দা বিষয়ে আল্লাহ্ ধর্মীয় মর্যাদা দান করেছেন। নারী পর্দার মধ্যে থাকলে তার পবিত্রতা রক্ষিত হয়। এ কারণে নারীর শারীরিক পবিত্রতা

www.amarboi.org

ধর্মের অংশ বিশেষ। সুতরাং নারী তার ধর্মবুদ্ধি এবং ইসলামের পর্দা প্রথা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করবে। নারী ঐশীমন নিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করলে তার দেহ সম্পদের ওপর অন্যের মনঃদৃষ্টি পড়েনা। আল্লাহ বলেন, "নারীগণ যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।" ইসলাম ধর্মে নারীর বেপর্দা শরীর একটি নিষেধ বাক্য।

নারীকে তার নিজের সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে হলে প্রয়োজন সাধারণ শিক্ষার সাথে ইসলামধর্ম শিক্ষা। নারী ইসলামধর্ম শিক্ষায় জ্ঞান পেলে সে তার নিরাপদ স্থানের অবস্থান, পর্দার আবশ্যকতা এবং সংসার ধর্ম মাঝে জীবনের বিভিন্ন দিকগুলো সর্বাংশে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। নারী ইসলামধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা পেলে এই দুয়ের জ্ঞানালোয় স্বভাবগত এবং সংগতি সম্পন্ন মর্যাদায় সে তার জীবনকে পরিচালিত করতে পারলে তার বেহেশতী সুখ লাভের সম্ভাবনা হয় সহজ।

শিক্ষাহীন মহিলাদের অনেক সময় তার স্বামীর সংসারে নানান ভাবে প্রতারিত হতে হয়। এই দুর্দশাকে প্রতিহত করার জন্যে শিক্ষাই হচ্ছে তার জন্য একটা হাতিয়ার। শিক্ষার একটা কল্যাণময় দিক আছে যা স্বতঃস্ফুর্তভাবে মানুষকে সুন্দর করে গড়ে তোলে। শিক্ষা মানে জ্ঞান আর জ্ঞান মানেই উজ্জ্বল আলোক শিখা। নারীজাতির সুন্দর জীবন যাপনের যতগুলো পথ আছে তার মধ্যে শিক্ষাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট। শিক্ষাই শক্তি এবং এই শিক্ষার মাধ্যমে নারী খুঁজে পাবে তার প্রকৃত মুক্তি। এ জন্য নারীর পারিবারিক পরিমন্ডল থেকে আরম্ভ করে নারী সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে স্তরে প্রয়োজন ইসলাম ধর্মশিক্ষা এবং তার চর্চা। তখন সেখান থেকে বেড়িয়ে আসবে নারীমুক্তির সঠিক পথ। ধর্ম শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নারী এবং পুরুষ উভয়কে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান তৈরী করা এবং সঠিক শিক্ষা গ্রহণ দ্বারা সে ফিরে পাবে তার জীবনের পূর্ণ অধিকার।

নারী শিশুর মা এবং স্বামীর কাছে স্ত্রী। মা নিরক্ষর হলে তার সন্দুর শিশুটি নির্মল চরিত্রের অধিকারী হতে পারেনা। সন্তানের দৈহিক, নৈতিক, মানসিক এবং ধর্মের বিবিধ বিষয়ে তাকে প্রতিভায়িত্ব করার অধিকাংশ দায়দায়িত্ব মায়ের উপর। সাধারণতঃ নিরক্ষর মা তার সন্তানের মঙ্গলের জন্য আহার বিহার এবং সুষ্ঠু পরিচর্যায় যত্নবান ও সতর্কতা অবলম্বনে হয়

www.amarboi.org

ব্যর্থ। অশিক্ষিতা মহিলা স্ত্রী হিসেবে তার স্বামীর মন মানসিকতা, সময়ের ইঙ্গিত ইশারা, স্বামীর জীবন জীবিকায় ভারসাম্যের জীবনাদর্শ এসবের কিছুই বুঝতে প্রয়াসী হয় না। স্বামীর বাড়ী সংসার করতে এসে সংসার কূটনীতি খেলায় অশিক্ষিত নারীকে তার দাম্পত্য জীবনে নিত্যদিনের আচার আচরণের কাছে হার মেনে পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করতে হয়।

যে গৃহ-সংসারে শিক্ষা নাই সেখানে জন্ম নেয় বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা এবং হাজারো সমস্যা। অনেক সময় স্ত্রীর সংসার জীবনে নেমে আসে বিষ সঞ্চালনের মত বিধি বিড়ম্বনা অথবা স্ত্রী নির্যাতন। এ জন্য উন্নত মানের জীবন যাপনে দরকার শিক্ষিতা নারী। তখন সে সংসার তৎপরতার মাঝে হতে পারবে চমৎকার এবং শিক্ষার আলোয় নিজের সাফল্যের পথও খুঁজে পাবে। একজন শিক্ষিতা এবং ধার্মিক স্ত্রী স্বামীর কাছে হৃদয় ভূষণ। সুতরাং সংসারে ধর্মাচরণ না থাকলে ধর্ম পরায়ন স্বামীর ধর্মেকর্মে সৃষ্টি হয় বহু সমস্যা। শিক্ষা হচ্ছে মঙ্গল, শিক্ষা হচ্ছে বিজয় বন্ধু এবং দীপ্তোজ্জ্বল মুক্তি। নারী তার সংসার গৃহে আত্মত্যাগের আদর্শে ধর্মের মৌলিক নীতিগুলো ধরে রাখতে পারলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ফিরে পাবে ধর্মতৃপ্তি। তখন তার জীবনটা সাফল্যের আশায় ভরে উঠবে। খুঁজে পাবে তার পারিবারিক জীবনে সকল সমস্যার সঠিক সমাধান। সে তার সংসারে শান্তি ও ভালবাসার নীড় রচনা করে হয়ে উঠবে স্বগৃহিনী এবং ধর্ম নিষ্ঠায় মর্যাদাশীল।

নানা ঘটনাবলী নিয়ে সংসার জীবনচক্র বয়ে চলে আনন্দ আকাঙ্ক্ষার গতিধারায়। সংসার জীবনে হাসি-কান্না, সুখ দুঃখ, আপদ বিপদ ও দ্বন্দ্ব কলহ নিয়ে ভরপুর এই সংসার জীবন। সংসারে দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর মধ্যে থাকতে হবে ধর্মনীতি হিসেবে শিষ্টাচার এবং সহনশীলতা। এজন্য পুণ্যময়ী স্ত্রী স্বামীর জীবনে একটা সেরা সম্পদ।

বড়ই নির্মমের কথা, অতীতে মুসলিম নারীজাতি সকল ক্ষেত্রে ছিল উপেক্ষিত। এর প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, সেই অতীত যুগের পুরুষ সমাজ আশঙ্কা করতো নারীদের বিদ্যাশিক্ষা দিলে তাদের ধর্ম পালন ব্যাপারে দেখাদেবে দেউলিয়া মনোভাব। ধর্মভক্তির ক্ষেত্রে আন্তরিকতা বিনষ্ট হবে অর্থাৎ ধর্মের প্রতি তাদের কোন দৃষ্টিপাত থাকবে না। স্ত্রীলোকদের বিদ্যাশিক্ষা দিলে তাদের স্বামী ভক্তি হ্রাস পাবে এবং চরিত্রে খুঁত সৃষ্টি হবে।

www.amarboi.org

তাদের বাসগৃহে গৃহশান্তি বিঘ্ন ঘটবে। কালক্রমে তারা ভক্তিজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন যাত্রায় দৈনভার সৃষ্টি করবে। একারণে তাদের জীবনমুক্তি সম্পর্কে পুরুষ সমাজ ছিল উদাসীন।

নারীর প্রকৃত কল্যাণ এবং মুক্তির লক্ষ্য অর্জন নির্ভর করে সঠিক জ্ঞানশিক্ষার আলোকে। মুসলিম নারী শিক্ষার জন্য ধর্মপ্রণালীর পরিমণ্ডল তৈরী করে দিতে হবে সচেতন পুরুষ সমাজকে। নারী জাতিকে শিক্ষার আড়ালে ফেলে রাখলে সত্যিকার জ্ঞানী ব্যক্তিরা কী ভাববে বলুন? প্রাত্যহিক জীবনের কথা বিবেচনা করলে নারীশিক্ষাকে অবহেলায় রাখার অর্থ আল্লাহর আদেশকে অমান্য করা। মহান আল্লাহ ইলেম শিক্ষাকে নারী পুরুষ উভয়ের জন্য ফরজ আদেশ করেছেন। আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা অমান্য করা গুনার কাজ।

পক্ষান্তরে দ্বীন ইসলাম শিক্ষা হচ্ছে একটি ধর্মীয় অনুশাসন ব্যবস্থা। মুসলিম কথাটা ইসলাম হতে নির্গত হয়েছে। সুতরাং ইসলাম শিক্ষায় কোন অকল্যাণকর পরিবেশ নাই। বাস্তবিক ইসলাম শিক্ষা সব সময় জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে কল্যাণ কর কার্যক্রম ব্যবস্থা।

হাদিসে উল্লেখ আছে স্ত্রীলোকদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া ফরজ। শিক্ষা অর্জন ব্যতীত নারী জাতির মুক্তি সম্ভব নয়। ধর্মশিক্ষায় জ্ঞানপুষ্ট যাদের আমরা আলেম বলি এবং মুসলিম নারী ব্যক্তিত্ব যারা কোরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষাদীক্ষায় সফলকাম হতে পেরেছেন তাদের সকলের মিলিত প্রচেষ্টা নারী মুক্তির জন্য কল্যাণ সাধন বয়ে আনতে পারে কারণ ইসলাম নারী পুরুষ উভয়ের ধর্মসম্পদ। এই অমূল্য সম্পদ লাভের জন্য অর্জন করতে হবে সঠিক জ্ঞান ও ইসলাম শিক্ষা। ইসলাম ধর্মে উপর জ্ঞান সচেতন পুরুষেরা নারী শিক্ষার কর্মকাণ্ডে এগিয়ে এলে তাদের সৌভাগ্যের উন্নতি সম্ভব।

নারী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেলে সে তার বাস্তব জীবন এবং সংসার জীবন গড়ার ক্ষেত্রে সঠিক পথের সন্ধান পাবে। একজন নারী শিক্ষার মাধ্যমে নিজের চরিত্রকে সুদৃঢ় করে নিতে পরলে তার পরিবারের সকলকে পার্থিব জীবন থেকে শুরু করে আখেরাত জীবনের ক্ষেত্রেও আল্লাহ এবং রসূলের নির্দেশে সবকিছু গুছিয়ে নিতে সক্ষম হবে। এজন্যে সে তার

www.amarboi.org

সংসারে ধর্মনিষ্ঠা দ্বারা স্নেহমমতার বাহুবন্ধনে সকলকে ধরে রাখতে সামর্থ হবে। প্রয়োজনে একজন শিক্ষিতা স্ত্রী তার ধর্ম দুর্বল স্বামীকেও ধর্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে ধর্মের পথে আনতে সাহসী উদ্যোগ গ্রহণে পিছপা হবে না।

নারী পুরুষ উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় সংসার সুখের হয়। কেবল একক প্রচেষ্টায় সংসারের সকল দায়দায়িত্ব পালন করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পরে। শিক্ষিতা নারী তার অর্জিত জ্ঞান দ্বারা সংসার ধর্ম থেকে আরম্ভ করে নারী সমাজের সকল ক্ষেত্রে হাসিমুখে সবার মন জয় করে নিতে পারে কারণ শিক্ষাই হচ্ছে তার বেঁচে থাকার সঠিক অবলম্বন।

বেগম রোকেয়া নারী জাতির অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের কথা নিগূঢ় ভাবে উপলব্ধি করে শিক্ষার উন্নয়নশীল কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নারী শিক্ষা সংগ্রামের একজন বলিষ্ট উদ্যোগী নারীরত্ন। বেগম রোকেয়া আলোর প্রদীপ হয়ে এসে ছিলেন মুসলিম নারী সমাজে। তিনি ছিলেন শিক্ষার আলো হাতে এগিয়ে আসা একজন অসাধারণ নারী।

নারী আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয়েছিল বয়সে প্রায় আড়াই গুণ বড় দোজবর উচ্চ শিক্ষিত উর্দুভাষী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে। রোকেয়ার পারিবারিক জীবন, বিবাহপূর্ব এবং পরবর্তী জীবন সুখের ছিল না মোটেই। শৈশবে পিতার আদর পায়নি, বিবাহ জীবনে কেবল রুগ্ন স্বামীর সেবা করে গেছেন অকাতরে। স্বামীর মৃত্যুর পর সমাজের বৃহৎ কর্মক্ষেত্র ডেকে নিল তাঁকে, তাই তিনি চলে এলেন কলকাতায়। তার নারী শিক্ষা সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসেবে বেগম রোকেয়া কলকাতায় ফিরে এসে মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল" কলকাতায় ১৯১৩ সালে স্থাপন করেন। কলাকাতার আলিপুর জজ কোর্ট আদালতের কাছে স্বামীর নামকরণে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলটি বর্তমানে মহিলা কলেজে উন্নীত হওয়ায় বেগম রোকেয়ার নারী মর্যাদার গৌরব আরও সমুন্নত হয়েছে। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ঘটনা ছিল পরবর্তী ঘটনার একটি মাইল ফলক। বেগম রোকেয়ার আগে কলকাতায় এবং ঢাকায় গুটিকয়েক মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনটাই টিকে থাকতে পারেনি। কুমিল্লার এক নিভৃত অঞ্চলে নওয়াব ফয়জুন্নেছা মুসলিম মেয়েদের জন্য একটি প্রাথমিক এবং পরবর্তীতে

www.amarboi.org

একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন কিন্তু নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাও ছিল কুমিল্লার নিভৃত এলাকায় সীমাবদ্ধ এবং এখানেও ছাত্রীদের পর্দার কঠোর শাসন মেনে চলতে হোত।

কলকাতায় বেগম রোকেয়ার বিদ্যালয়টিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাকে অমানুষিক শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে তার বিরুদ্ধে কুৎসা, নিন্দা ও অপপ্রচারের ঝড় বয়ে গেছে অনেক। বহু লোকের দ্বারে দ্বারে রোকেয়াকে প্রার্থী হতে হয়েছে সাহায্যের জন্য।

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষিতা মায়ের ভূমিকা কত প্রয়োজন একথা রোকেয়া অধিক গুরুত্ব সহকারে বলেছেন। এজন্যে তিনি নারী শিক্ষা প্রসারে সারাটা জীবন কাজ করে গেছেন। সংগ্রাম করেছেন আমরণ পর্যন্ত। নারী জাতির জন্যে শিক্ষা কত যে প্রয়োজন রোকেয়া তা ভালভাবেই বুঝে ছিলেন। এ কারণে নারী জাতির দুঃখ মোচন এবং নারীকে নারী সমাজ প্রতিষ্ঠানের কথাও তিনি বলেছেন। ব্রিটিশ যুগে মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার অন্ধকার ছায়ার মত ঘিরে রেখেছিল। ফলে মুসলিম নারীসংস্কৃতির পিপাসা ছিল অচরিতার্থ এবং তার অস্তিত্বও ছিল শঙ্কিত। বেগম রোকেয়া নারী দুর্দশা সম্পর্কিত এই অবস্থা রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপলব্ধি করে ছিলেন অন্তর্বেদনার আলোকে।

বেগম রোকেয়া তার দুঃখময় জীবনের সকল বাধা অপসারণ করে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে একজন খ্যাত বাঙ্গালী মুসলিম মহিলা হিসেবে নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তির ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি রেখে গেছেন। মহীয়সী বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষা তথা বালিকা শিক্ষায় আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই নারী সমাজ প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন দীপ্তকণ্ঠে। তিনি ছিলেন নারী শিক্ষায় জ্ঞানের প্রদীপ শিখা।

বেগম রোকেয়া বলতেন স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা যথাযোগ্য রূপে হলেই নারীর উন্নতি হবে অনিবার্য। এ বিশ্বাসে তিনি অটল ছিলেন সারাটা জীবন। তিনি নারী নির্যাতন, নারী নিগ্রহ, নারী অসম্মান দেখেছেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে। তিনি বলতেন নারীশিক্ষা বিস্তারই হবে এসব অত্যাচার নিবারণের একমাত্র মহৌষধ। তিনি বলেছেন অন্ততঃত বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষা

www.amarboi.org

দিতেই হবে। শিক্ষা নারীদের নাগরিক অধিকারে সক্ষম করে তোলে। বেগম রোকেয়ার কণ্ঠভাষা থেকে নেওয়া উক্তি, "নারীদের জীবন শুধু পতিদেবতায় মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে। তাহারা যেন অন্ন বস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়।" মেয়েদের সুশিক্ষার অভাব রোকেয়াকে বড়ই পীড়িত করতো সারাক্ষণ কারণ "আমরা পুরুষদের পশ্চাতে পড়িয়া আছি। সমান সুবিধা পাইলে আমরাও কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম না?" বেগম রোকেয়া বজ্রকণ্ঠে প্রবল আশা বুকে নিয়ে লিখেছেন "বুক ঠুকিয়া বলো মা, আমরা পশু নই, বল ভগিনী, আমরা আসবাবপত্র নই, বল কন্যা! জড়াউ অলঙ্কার রূপে সিন্ধুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই, সকলে সমস্বরে বল আমরা মানুষ।" এই মনোভাব ধ্বনিত হয়েছে তার "স্ত্রী জাতির অবনতি" শীর্ষক রচনায়, "পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয় তাহাই কবির। আবশ্যক হইলে লেডি কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি ম্যাজিষ্ট্রেট, লেডি ব্যারিষ্টার, লেডি জজ সবই হইব। উপার্জন করিবনা কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকার্যে ব্যয় করি সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারিব না? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক।"

তৎকালীন কূপমন্ডুক সমাজে নারী শিক্ষা তথা নারী মুক্তির বিরুদ্ধে পুরুষদের উথাপিত যুক্তি খন্ডন করে বেগম রোকেয়া বলেছেন "আমরা সামজের অর্ধাঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? যদি শিক্ষা পাইয়া পুরুষগণ বিপথগামী না হয় তবে স্ত্রীলোকেরা কেন বিপথগামী হইবে? যাহারা নিজেদের সমাজকে উদ্ধার করিতে পারে না তাহারা দেশোদ্ধার করিবে কিরূপে?" বেগম রোকেয়া আরও বলেন "মুসলমানদের যাবতীয় দৈন্যদুর্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রী শিক্ষায় ঔদাস্য।"

সে সময় মুসলিম সমাজে চার দেওয়ালে আবদ্ধ নারীদের সাথে বালিকা মেয়েদেরও আবদ্ধ করে রাখা হোত। মাত্র সাত আট বছর বয়স হলেই তাদের পর্দানশিন করে ঘরে আবদ্ধ রাখা হোত। সে সময় মেয়েদের পর্দা ছিল বড়ই কড়াকড়ি এবং তা সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত হোত। তাদের বাড়ীর বাইরে যাওয়া ছিল নিষিদ্ধ। জীবন ছিল খাঁচার পাখীর মত বন্দিদশা। এই কঠোর বাধার কারণে ছেলেদের অপেক্ষা মেয়েরাই বেশী বাধাগ্রস্থ

www.amarboi.org

হয়েছে হাতে খড়ি বাংলা এবং আরবী শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে।

মাত্র আট দশ বছর বয়সে, যৌবনে পা ফেলার অনেক আগেই, পল্লী বালিকা মেয়েদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হোত। পিতামাতার স্নেহ ভালবাসা ত্যাগ করে চলে যেত বালিকা বধূ সেজে স্বামীর বাড়ী। চিন্তা চেনতায় সংসার ধর্মের অভিজ্ঞতাচক্ষু ফুটার আগেই নতুন পরিবেশে জীবন কাটানোর জন্যে ঘোমটা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে যেত ক্লান্ত হৃদয়ে স্বামীর সংসার করতে। সেখানে তাঁর নতুন সংসারটা ক্রমেই যেন দুঃসহ বোঝা হয়ে উঠতো। তার জীবনের প্রত্যেকটি গ্রন্থিগুলো যেন ক্লান্তভারে ঢলে পড়ার অবস্থা হয়ে আসতো। ছটফট করেও সে তার বোঝা নামাতে পারতো না। স্পষ্টতঃ তখনও তার গিন্নি সাজার বয়স হয়নি। কারণ তখনও সে কাঁচাজ্ঞান এবং কচিবুদ্ধি সম্পন্ন কিশোরী বালিকা। অনেক ক্ষেত্রে শ্বাশুড়ী ননদের কাছে সহানুভূতির প্রকাশ টুকুও পেতনা। কোন কোন ক্ষেত্রে চণ্ডালী শাশুড়ীর নিষ্ঠুর আচরণে বালিকা বধূর উপর মাত্রাছাড়া নির্যাতনের কারণ হয়ে উঠতো। বিয়ের পর স্বামী কী, সংসার ধর্মই বা কী তা যথাযথ বুঝে উঠা এই বয়ঃসন্ধিক্ষণে পূর্ণতা আসতো না। এখানেও পর্দার কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হোত অসহায় বালিকা বধূকে। জীবনের তিক্ততা তাকে ঘিরে ফেলতো পলেপলে। বালিকা বধূর গতিবিধি থাকতো রীতিমতো কড়াকড়ি। এমন কি দিনের বেলায় স্বামীর সাথে কথা বলাও ছিল বেয়াদবী আচরণ। এভাবে অতীতে মুসলমান সমাজে নিরক্ষরতা, কুসংস্কার, কুপ্রথা এবং নানা গোঁড়ামী তাদের সমাজ দেহে ক্ষতের মতো বিরাজ করতো। মুসলিম নরী যখন এই ঘোর অন্ধকার অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছিল তখন নারী শিক্ষার অগ্রগতি ছিল বড়ই করুণ এবং মুসলিম বালিকা শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ বাধাপ্রাপ্ত।

ব্রিটিশ যুগে যখন মুসলিম পুরুষদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল নানা বাধার মুখে তখন মুসলিম নারী শিক্ষা প্রসারের কথাটা ছিল বাতুলতা মাত্র। নিম্ন পাঠশালা কিংবা গ্রাম্য মক্তবে দু'একটা মুসলিম বালিকার মুখ দর্শন হলেও সেখানে সার্বিক ভাবে নারী শিক্ষার কোন সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে। মুসলমান নারীরা পর্দার অন্তরালে থেকে সামান্য শিক্ষা কিংবা বিনা শিক্ষায় সারাটা জীবন চোখ কান বুজে কাটিয়ে দিত।

www.amarboi.org

বেগম রোকেয়া বুঝে ছিলেন পুরুষ শিক্ষার মত মহিলা শিক্ষাকেও পূর্ণাঙ্গ করতে না পারলে নারী সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে নারী শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় আনতে না পারলে নারী জীবন নিরক্ষতার কুপ্রভাবে মুসলিম নারী সমাজ সার্বিক উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। নারী জাতি শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থেকে গেলে মহিলারা পুরুষের বোঝা হয়ে বেঁচে থাকবে। বেগম রোকেয়ার জীবনে সংগ্রাম ছিল নারী শিক্ষায় কুসংস্কার বর্জন। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে নারী কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্যে অনেক দুঃখ কষ্টের সাথে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে গেছেন।

নারী জাতি শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেলে তাদের জন্য তা হবে নির্মম অভিশাপ। নারীর আপন ভাগ্যকে সুন্দর করে সাজাতে চাইলে পুরুষ শিক্ষার পাশাপাশি চাই প্রগতিশীল নারী শিক্ষা। বেগম রোকেয়া স্পষ্ট বুঝেছিলেন নারী সমাজকে অন্ধকার পাষাণপুরী থেকে উন্মুক্ত আলোর জগতে আনতে হলে চাই আধুনিক এবং ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা।

নারী জাতীর মুক্তির বাণী দীপ্তকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল বেগম রোকেয়ার কণ্ঠে। সংসার জীবন থেকে আরম্ভ করে সামাজিক কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা। বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে মেয়েদের জন্যে শিক্ষার যে সব সুযোগ করে দিয়েছেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বেগম রোকেয়ার নানা দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল মহিলা শিক্ষার ক্ষেত্রে যথার্থ পদক্ষেপ। তৎকালীন সময়ে মুসলমান সমাজে ধর্মান্ধতার কারণে নারী শিক্ষা ছিল ঘোর অন্ধকারে আবদ্ধ্য। বেগম রোকেয়া বুঝে ছিলেন নারী জাতিকে শিক্ষার জগৎ থেকে পিছনে রাখলে মুসলিম নারীর জন্য হবে চরম দুঃখের কারণ। তিনি উপলব্ধি করে ছিলেন সে সময়ে মুসলিম নারী হিন্দুনারী শিক্ষা থেকে ছিল অনেক পশ্চাৎপদ। তাই মুসলিম নারী জাতিকে শিক্ষায় যোগ্য করে গড়ে তুলতে না পারলে নারী জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের অগ্রগতিতে নেমে আসবে অভিশাপ। ফলে তারা পুরুষদের কাছে হবে চরম নির্যাতনের শিকার। বেগম রোকেয়া তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে পরিষ্কার বুঝে ছিলেন নারী শিক্ষার গুরুত্ব কত প্রয়োজন। নারী ইসলাম শিক্ষায় জ্ঞান অর্জন করতে পারলে তার সংসার জীবন হবে সুখের

www.amarboi.org

এবং আনন্দের। শিক্ষিতা নারী স্ত্রী হিসেবে তার স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম খেদমত ও হৃদয় স্পর্শ ব্যবহার দ্বারা আত্মনিয়োগ করতে পারলে তাদের দাম্পত্য জীবনে গড়ে উঠবে নির্মল প্রেমভালবাসা এবং সুখের ধর্মানুরাগ। ধর্মজ্ঞান অনুভূতি দিয়ে নারী স্ত্রীর ভূমিকায় ইসলামী সংস্কৃতিকে আত্মচেতনার বিশ্বাসে লালন করতে পারলে তাদের সংসার জীবন যাত্রায় বিরাজ করবে সুন্দর পরিবেশ। একারণে প্রয়োজন নারীদের বুদ্ধিবৃত্তির পুষ্টিসাধন।

সংসার মাঝে গৃহধর্ম বড়ই কঠিন জায়গা। এখানে সুখদুঃখ, আপদ-বিপদ, হাসিকান্না নিয়ে জীবনের খেলাঘর। সংসার পরিবেশে নানা কারণে অনেক সময় অনেক কিছুতে জটিলতা সৃষ্টি হয়। তখন সৃষ্ট দোষত্রুটিযুক্ত ঘটনার সমাধান দিতে একজন শিক্ষিতা মহিলাকে তার জ্ঞানশক্তি দান করতে হয়। তখন ইসলাম ধর্মজ্ঞান আলোয় এ সবের মিমাংসা হয় সহজ। এ কারণে বলা হয়েছে সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। নারীর সংসার জীবন ইহকাল ও পরকালের জন্যই সবকিছু। বস্তুতঃ এটি তার অগ্নীপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কার্যস্থল এবং এখান থেকে সে সঙ্গে নিয়ে যায় তার পরকালের জন্য সাধন অসাধন কার্যফল। এ কারণে সংসার জীবনে নারী জাতীর বিভিন্ন সমস্যার কথা উপলব্ধি করে বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সংগ্রাম করে গেছেন আমরণ।

তেজস্বিনী রোকেয়া ঘুমন্ত নারী সমাজ নয় একটা জাগ্রত সমাজ দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি দেখেছেন পরিবারে অশিক্ষার কারণে বেশির ভাগ মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা অঙ্গনে প্রবেশ অধিকার ছিল না। পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েদেরও রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনগত এবং শিক্ষাগত অধিকার অর্জন দেখতে চেয়ে ছিলেন বেগম রোকেয়া। মহিয়সী রোকেয়ার নারী মুক্তি ভাবনা সীমাবদ্ধ থাকলেও সম্পূর্ণ পুরুষ শাসিত পরিবেশ ও সমাজ থেকে বেড়িয়ে আসাটাই ছিল একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। মুসলিম সমাজে বেগম রোকেয়া এক নামে পরিচিত। কারণ তাঁর নারীবাদ প্রসঙ্গটা ছিল একটা তোলপাড় করা নারী শিক্ষা আলোড়ন।

শিক্ষাহীন নারীজীবন একটি মানসিক সমস্যা এবং দুর্গতির আর একটি দিক। এককালে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের বিপন্ন অবস্থা ছিল বড়ই করুণ।

www.amarboi.org

শিক্ষার মানদণ্ডে দেশের নারী সমাজ আজও অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে বলে অশিক্ষিতা নারী জাতি পুরুষ প্রধান কিংবা পুরুষ শাসিত সমাজের হাতে নারীদাসত্ব অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এই শোচনীয় অবস্থার কথা বেগম রোকেয়া একদিন হাড়েহাড়ে বুঝেছিলেন বলেই নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি তাঁর বাস্তব জীবনে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে জনমত গড়ে তোলার ডাক দিয়েছিলেন এবং এজন্যে তিনি করেছেন অনেক কিছু।

নারীশিক্ষার জন্য আর একটা বড় দিক হচ্ছে নারী তার নিজ অধিকার রক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণে সাধ্যমতো সক্ষম হবে। শিক্ষার কাজ হচ্ছে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি এবং নৈতিক আদর্শ দ্বারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ক্ষমতা অর্জন। শিক্ষা নারীকে তার সৌভাগ্যের পথে প্রতিষ্ঠিত করে বিজয়ের গৌরব এনে দিতে পারে।

সমাজে অশিক্ষিত বিবাহিতা নারীর জীবনে অনেক সময় নেমে আসে দুর্ভোগ। বিয়ের পর স্বামীর ঘরে সুখের সংসার পেতে জীবনের সুন্দর স্বপ্ন দেখে সব নারীই। কিন্তু দিন না যেতে তাদের জীবনে আরম্ভ হয় লাঞ্ছনার নাটক। নবজীবন সংসারে লম্পট স্বভাব স্বামীর নির্যাতন বিনামেঘে বজ্রপাতের মত যৌতুকের দাবীতে স্ত্রীকে দুঃখ দৈন্যের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় দীর্ঘদিন ধরে। সংসার জীবনে কোন কোন ভোগলিপ্সু স্বামীর নিষ্ঠুর অত্যাচারে স্ত্রীকে প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয় শিউলি ঝরা ফুলের মত।

যৌতুকের লোভলালসার বশঃবর্তী হয়ে কোন কোন প্রবঞ্চক স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আর একটা নতুন বৌ ঘরে তুলার ফন্দিফিকির করতে থাকে সব কিছু উপেক্ষা করে। স্বামীর সহচর হয়ে সংসার করতে এসে সময় না যেতেই স্বামীর বাড়ীতে যৌতুক চক্রান্তের শিকার হয়ে অনেক সময় মরণশায়িত হতে হয় রূপযৌবনা পত্নিকে।

স্বামীর জীবনে স্ত্রী হচ্ছে শোভাকর ভূষণ এবং সৌন্দর্যের প্রতীক। সত্য বলতে কি স্ত্রী আল্লাহর নেয়ামত এবং পুরুষের কাছে জীবনরত্ন। মহান আল্লাহ পাক হাওয়া (আঃ) কে সৃষ্টি করে হযরত আদম (আঃ) কে স্ত্রীরত্নরূপে উপহার দেন। একারণে পৃথিবীতে যত রত্ন আছে তার মধ্যে স্ত্রী রত্নই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। নির্জীব এবং সজীব সকল রত্নের সঙ্গে স্ত্রী রত্নের কোন তুলনা হয় না। ইসলামে স্ত্রী রত্নকে সকল রত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

www.amarboi.org

জ্ঞানের অভাবে এক শ্রেণীর ঘাতকেরা একথা বোঝে না। যে স্বামী তার স্ত্রীকে ভালবাসে এবং সত্যিকার জীবন সঙ্গী হিসেবে তাকে পেতে চায় সে আল্লাহর ভালবাসার মাঝে বেঁচে থাকে। হৃদয়ের ভালবাসা হচ্ছে অঙ্গীকারের সমতুল্য। ইহা একটি ধর্মীয় প্রতিজ্ঞা। স্ত্রীর প্রতি ভণ্ডস্বামীর ভালবাসা কেবল মুখের কথা। সেখানে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও হৃদয়ের ভালবাসা থাকে না। যে স্বামী যৌতুকের অতৃপ্ত লোভে স্ত্রী হত্যা করে আল্লাহর বিধানে দোজখ তার জন্য স্বাভাবিক ঠিকানা এবং যালিমের উপর আছে আল্লাহর অভিশাপ।

একজন শিক্ষিতা এবং সাহসী মহিলা তার জ্ঞান মেধাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারলে সে তার স্বামী পরিবারের সকল অপশক্তিকে পরাভূত করতে সক্ষম হবে। যৌতুকের অভিশাপ থেকে নারী নিজেকে রক্ষার জন্যে মুক্তি সংগ্রামে জয়ী হয়ে নিজ সম্মান রক্ষা করতে পারবে। শিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীর সংসারে যৌতুক নির্যাতনের হীন ষড়যন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে জয়যুক্ত করতে পারবে যখন তার জ্ঞানই হবে মুক্ত কণ্ঠশক্তি। কারণ শিক্ষা শক্তিহীনকে শক্তি যোগায়। শিক্ষা মানুষের জ্ঞানের বিকাশ এবং বিস্তার ঘটায়। শিক্ষা মানুষের মানবিক ও নৈতিক দিকগুলো উন্মুক্ত করে দেয়। শিক্ষিতা নারী তার স্বামীর সংসারে দূষিত আবহাওয়ার পরিবেশ এবং মন্দ আচরণগুলো বুঝে নিয়ে যৌতুক জুলুম থেকে নিজেকে রক্ষার জন্যে পথের সন্ধান করে নিতে পারবে। তখন তার শিক্ষাই তাকে এই পরপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য আলোর পথের সন্ধান এনে দেবে।

বর পরিবার যখন বধূকন্যার কিংবা কন্যা পরিবারকে ভয়ভীতি অথবা অন্যায় চাপ প্রয়োগের দ্বারা নগদ অর্থ কিংবা দামীদামী আসবাবপত্র অথবা মূল্যবান সম্পদ সামগ্রী প্রদানে বাধ্য করে তখন সেটাকে বলা হয় যৌতুক। মুসলমান সমাজে বিবাহকালিন নিয়মে যৌতুক ব্যবস্থা ইসলাম ধর্ম মতে গ্রহণ যোগ্য নয়। তবে কন্যাপক্ষ যদি নিজ ইচ্ছায় মেয়ের সুখময় জীবনের জন্য বর পরিবারে অনুরূপ কিছু পাঠায় তখন এটা যৌতুক না হয়ে হয় উপহার। বিবাহ উত্তরকালে উপহার দেওয়া নেওয়া ইসলামে ধর্মহানি নয়। আপোষে দেওয়া নেওয়ার ইচ্ছায় আছে জীবনানন্দ, গৃহশান্তি এবং দাম্পত্য প্রেমসুখ। তেমনি অনিচ্ছার আড়ালে লুকিয়ে থাকে অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা এবং আর্থিক পীড়ন। মুসলমান সমাজে বিবাহ পণপ্রথা একটি অশিষ্টাচার আচরণ।

www.amarboi.org

বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা একটি ধর্ম বিরোধ কার্যকলাপ। অর্থলোভী পরিবারে যৌতুকের দাবী নিয়ে অহরহ ঘটে নির্মম যৌতুক জ্বালা যা কিছুতেই বাগে আনা যায় না। এখানে আর একটা কথা, তা হচ্ছে যৌতুক আদায় না করে শরিয়তকে নাপাকমুক্ত রাখা স্বামী পরিবারের পবিত্র দায়িত্ব। সুতরাং সংসারধর্ম মাঝে বান্দার ধর্মকর্ম অপবিত্র অবস্থায় থাকলে কোন ইবাদত আশ্রয় দাতা আল্লাহর কাছে গ্রহণ যোগ্য হয় না।

যৌতুক দাবীর প্রধান কেন্দ্রস্থল লোভলালসা পুষ্ট অশিক্ষিত স্বামী পরিবার। প্রকৃত পক্ষে এর মূল উৎস বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ। বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ হিন্দু সমাজের পাশাপাশি যুগবৎ বসবাস কারায় কালক্রমে উহা সংক্রামক ব্যাধিরূপে মুসলমান সমাজ পরিবারে অনুপ্রবেশ ঘটে। মুসলমান পরিবার এই কুপ্রথাটিকে পরের ধনে পোদ্দারী করার মত রেওয়াজ নিয়মে গ্রহণ করে নিয়েছে বেশ পাকাপোক্ত করে। প্রতিবেশী হিন্দু জাতির ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং নানা কুসংস্কার যা ইসলামে শরীয়ত বিরুদ্ধ। এগুলো মুসলমান সমাজে অনুপ্রবেশ ঘটে কালক্রমে তা দেশাচার প্রথার সাথে মিশে গেছে।

যৌতুক প্রথা মুসলমান সমাজ পরিবারে একটি ঘৃণিত লোভের নিন্দনীয় কুচক্র ব্যবস্থা। মধ্যবিত্ত পরিবারে পেটচিন্তা লোকেরাই যৌতুক গ্রহণে অধিক আগ্রহী। অন্যদিকে বিত্তশালী উভয় পরিবারে তাদের যৌতুকের আকাঙ্ক্ষা বলতে কিছুই তাকে না। তাছাড়া খান্দানি পরিবারে যৌতুক গ্রহণ একটা নিকৃষ্ট কার্যকলাপ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। যৌতুক প্রথা কেবল মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত লোভী পরিবারে বিরাজ করে। এ কারণে তাদের সংসার জীবনের শেষ পরিণাম হয় বড়ই ভয়াবহ।

অভাবী সংসারের অভাব থেকে আসে লোভ। লোভ থেকে আসে ভোগ এবং ভোগলিপ্সা থেকে সৃষ্টি হয় মানব মনের পাপাচার। লোভ হচ্ছে নির্লিপ্ত ডাকাত চরিত্রের মত এক প্রকার নগ্ন আচরণ। ডাকাত যেমন গৃহে ভয়ভীতি, নির্মম অত্যচার কখন বা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে লুটে নেয় গৃহকর্তার কষ্টার্জিত অর্থসম্পদ। ঠিক একই কায়দায় ঘরে ডাকাত পড়ার মত লিপ্সু স্বামীপক্ষ বধূকন্যাকে জিম্মী করে অর্থ সম্পদ যৌতুক হিসেবে লুটে নেয় কন্যাবাড়ী থেকে। যৌতুক লোভী স্বামীর লোভলালসার ক্ষুধা হিংস্র নেকড়ের আক্রমণ অপেক্ষা আরও ভয়াবহ। যৌতুক লোভীরা নিজ শ্রম প্রচেষ্টায় ভোগ্যসম্পদ

www.amarboi.org

অর্জন না করে ওৎ পেতে অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে বিয়ের পর কীভাবে তার শূন্য ঘরকে যৌতুক সামগ্রী দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে ভরে তুলবে মনের মত করে। তবুও তাদের লোভের স্বার্থ সব সময় অতৃপ্তই থেকে যায়। এ কারণে সুখের প্রয়াসে এবং মোহের ঘোরে তারা অনেক সময় বিপাকে পড়ে দিশেহারা হয়। ইসলাম অবৈধ ভোগবিলাস কখনো সমর্থন করে না। ভুললে চলবে না, পাপমন্যতার সুখভোগ এক দিন না এক দিন দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বেফায়দা ভোগের মোহ হচ্ছে ছলনাময়ী যা অভাব নীতির কারণে তাদের হয়রানির মধ্যে আবদ্ধ রাখে। এজন্যে এই বিপাক থেকে বাঁচার একমাত্র খোলা পথ ইসলাম শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন যা ধর্মের সত্যটাকে সব সময় মনের মাঝে কার্যকর হিসেবে জাগিয়ে রাখে। ইসলামধর্মে আছে সামাজিক ও মানবিক আদর্শ, আছে কর্তব্যবোধ এবং আত্মমর্যাদা। জ্ঞান অর্জনে মানুষের মর্যাদা হয় অনেক বড়। আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান, বিচারশক্তি এবং বিবেক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। বিবেকের কাজ ন্যায় ও সত্যকে গ্রহণ এবং অন্যায়কে প্রত্যাখান। এজন্যে অন্যায়ের অপর নাম পাপ। বস্তুতঃ যারা পাপকর্মে লিপ্ত থাকে তারাই পাপাচারী। দেহের সাথে ছায়ার যেমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তেমনি অন্যায়ের সাথে পাপের একই মিলন সাধন। তারা একই ভাবে সকল সময় পাপের সাথে মিলে মিশে অবস্থান করে। তা কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না।

মুসলমান সমাজে যে পরিবারটি জ্ঞানান্ধ হয়ে জীবন যাপন করে সেখানে যৌতুক প্রথা ব্যধিরূপে পীড়ন দেয় লালিত আকারে। শিক্ষা মানুষের নৈতিক, মানবিক এবং ন্যায়বোধ গুণগুলো সমাজ পরিবারে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্যে শান্তির পথ দেখায়। তখন সমাজে যৌতুক ব্যধি নিরসন হয় লোভের পরিবর্তন ঘটিয়ে।

ইসলামের দৃষ্টিতে যৌতুক প্রথা নিঃসন্দেহে সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ যা ইসলামের বিধি অনুসারে নিষিদ্ধ। সমাজ পরিবারে ধর্মচর্চা থাকলে যৌতুকের পাপ প্রবণতার পরিবর্তে তাদের বিবাহ জীবনে এনে দেয় সুখ শান্তির পরিবেশ। লোভলালসার আকাঙ্ক্ষা ইসলাম কখনও সমর্থন করে না। কারণ ইসলাম হচ্ছে একটি স্বচ্ছ সমাজ ব্যবস্থা। স্বীকার করতে হয় সমাজ

www.amarboi.org

পরিবারের লোকেরা যৌতুকের আকাঙ্ক্ষাকে দমন করতে না পারলে পরবর্তীতে তাদের অন্যান্য আকাঙ্ক্ষাগুলো দমন করাটা দুরুহ হয়ে পড়ে।

মুসলমান সমাজে ধর্মশিক্ষা থাকলে যৌতুক লাঞ্ছনা দূরীভূত হয়ে ফিরে আসে দাম্পত্য জীবন যাত্রায় অনাবিল প্রেমানন্দ। তখন তাদের দাম্পত্য জীবন হয় নির্মল এবং সংসার জীবন যাত্রায় বিরাজ করে নিত্যদিনের কল্যাণ। ইসলামধর্ম মানুষকে সত্যের পথে অনুপ্রাণিত করে লোভলালসা থেকে নিবৃত্ত রাখে। এ কারণে পরিবারে সুশিক্ষা এবং ধর্মীয় প্রভাব একীভূত হলে স্বামীস্ত্রীর সংসার জীবনে গড়ে ওঠে যৌতুকমুক্ত সুন্দর দাম্পত্য জীবন।

মধ্যবিত্ত দরিদ্র পরিবারে মেয়েদের বিয়ের বয়স হলে বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ীতে এসে অনেকের জীবনে নেমে আসে কালো অধ্যায়। স্বামীর বাড়ীতে মানব অধিকারের পরিবর্তে তাকে ভোগ করতে হয় যৌতুক লাঞ্ছনার চরম যন্ত্রণা। সে তার দরিদ্র পিতামাতার সংসার থেকে যৌতুকের অর্থ আনতে ব্যর্থ হলে স্বামীর সংসারে সবার কাছে হয়ে পড়ে একটা অলুক্ষণে জঞ্জাল নারী এবং চিহ্নিত শত্রু।

বিয়ের পর মেয়েরা স্বামীর সংসারে স্ত্রী হয়ে আসে দৈহিক এবং মানসিক সুখ শান্তির বুক ভরা আশার স্বপ্ন নিয়ে। প্রত্যেক স্ত্রীই প্রতিদিন প্রতিক্ষণে মনে করে স্বামীর সংসারটা তার বেঁচে থাকার একমাত্র আশ্রয়স্থল। এরই মাঝে থাকে তার দাম্পত্য জীবনে স্বামীর ভালবাসা, স্নেহ মমতার সন্তান সন্ততি। এগুলো তার বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং শান্তি লাভের প্রেরণা। কিন্তু যৌতুকের কারণে বিভ্রান্তি ঘটলে স্বামীর সংসারে সে মনে প্রাণে ভেঙ্গে পড়ে। স্ত্রী হিসেবে স্বামীর বাড়ীতে এসে তার সকল সুখের স্বপ্ন যৌতুক অত্যাচারের কারণে একেবারে উল্টোটা ঘটে যায়। সংসার জীবনে যৌতুকের অত্যাচার তার কাছে বিষাক্ত ক্ষতের মত সামীল হয়ে পড়ে। তখন সে তার স্বামীর বাড়ীতে কাতর যন্ত্রণায় নিজেকে নিয়ে ছটফট করতে থাকে। চোখ, কান, মুখ বন্ধ করে সহ্য করতে হয় অমানবিক অত্যাচার। অত্যাচারের ভয়ে মুখে প্রতিবাদের কথা বলতে সাহস হয় না। হতাশা এবং নিরাশা তাকে ক্রমেই যেন গ্রাস করে ফেলে। নির্যাতনের শিকার হয়ে তখন সে তার বাঁচার আশা-আকাঙ্ক্ষার দাবী হারিয়ে ফেলে। বেঁচে থাকার মানসিক শক্তি হারিয়ে পাপে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত

www.amarboi.org

তাকে বেছে নিতে হয় আত্মহত্যার পথ। তখন তার কাছে বেঁচে থাকা একটা বিড়ম্বনা হয়ে পড়ে।

স্ত্রী স্বামী কর্তৃক বিতাড়িত হলে তাকে কে দেখবে? কে তাকে আশ্রয় দেবে? তখন জগৎটা তার কাছে হয়ে পড়ে নিষ্ঠুর এবং দুখঃভোগের লীলাক্ষেত্র। এমনই শোচনীয় অবস্থায় সে জীবনের স্পন্দনে স্পন্দনে হতাশায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে তার মন দমলেও শিক্ষিতা মেয়েদের ক্ষেত্রে পরিত্রাণের পথটা কিন্তু পরিষ্কার। তারা স্বামীর বাড়ীতে নির্যাতনের শিকার হলেও সেখান থেকে বেরিয়ে এসে পিতৃনির্ভর কি ভ্রাতৃনির্ভর না হয়ে বেঁচে থাকার জন্যে জীবিকা অর্জনের একটা উপায় করে নিতে পারে।

পরিস্থিতিজনিত কারণে অনেক সময় অনেক মুসলমান মেয়েরা আর্থিক কষ্টে পড়ে পেটের দায়ে ঘরের বাইরে কাজ করে অর্থ উপার্জন করে। একজন মুসলিম নারী জীবিকার জন্য যদি কাজ করতে চায় ইসলামী তরিকায় সে তা করতে পারে। এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা মূলক কোন দলিল প্রমাণ নেই। এমতাবস্থায় নারী ইসলামের শরীয়ত অনুযায়ী পর্দায় থেকে কর্মক্ষেত্রে এমন ভাবে কাজ করবে যাতে সে একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত পুরুষদের সাথে কথার সংস্রবে না আসে এবং কোন অশ্লীলতা তাকে যেন স্পর্শ না করে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার উপার্জন এবং দৈহিক আচরণ হারাম না হবে সেপর্যন্ত সে তার কাজের জন্য বাইরে যেতে পারবে। তবে নারীকে তার মর্যাদা এবং নিরাপত্তা রক্ষার্থে শরীয়াহ্ সমর্থিত পোষাক পরিধান করতে হবে।

নারী তার কর্মক্ষেত্রে ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করতে পারলে নিশ্চয় সে আল্লাহর অনুগ্রহ পাবে। ইসলামের শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী উপার্জন করলে ধর্মের পবিত্রতা রক্ষিত হয়। তার মধ্যে ন্যায়বোধ এবং সজাগ বিবেক থাকলে সেখানে দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা থাকে না। এজন্য প্রয়োজন ইসলামধর্ম শিক্ষা যা তাকে সত্যের পথ দেখাবে এবং কর্মঘর্ম ভারাক্রান্ত সময়ে অপরাধ থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। নারী তার দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলি পবিত্র কাজে ব্যবহার করতে পারলে তার মানসিক পবিত্রতা মনের উপর ক্রিয়া করবে। মানসিক স্নিগ্ধতা ধরে রাখতে পারলে সেটাই হবে

www.amarboi.org

নারীর কর্মক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ পালন। কারণ মানুষের সব কিছুর ভিতরে আল্লাহর বিকাশ এবং প্রকাশ বিদ্যমান।

অপর পক্ষে আল্লাহ পাক পুরুষদের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, "তোমাদের হৃদয়ের কামনায় ও চোখের অভিলাষে জেনা করো না। তোমরা আমার সমস্ত হুকুম স্মরণ কর ও পালন কর এবং তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পবিত্র হও। আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ।" (এই কথাটি তৌরাত গ্রন্থে ২৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে)।

নির্যাতিতা নারী সমাজের জন্য আর একটা কথা বলতে চাই তা হলো, মেয়েদের সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও তাদের হাতের কাজ শিখানোর দিকে বাবামায়েরা পরিমিত নজর দিলে জীবিকার জন্য উপার্জনের পথটা হয় অনেক সহজ। এ কারণে অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার চেয়ে ব্যবহারিক বিদ্যার গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। আল্লাহর সত্যকে অনুস্মরণ করে মুসলিম নারীজাতি জীবিকার জন্য উপার্জন করলে তাতে কোন দোষ থাকে না। আজকাল মেয়েদের বিভিন্ন প্রকার হাতের কাজ শিখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার সাথে গৃহ সজ্জার সুরুচি কাজ এবং পোষাক তৈরীর নানান আধুনিক ও সৌখিন হাতের কাজ শিখে নিতে পারলে স্বামীর বাড়ী রোষবহ্নিতে তাদের দগ্ধ হবার সম্ভাবনা থাকে না। পীড়িত মনে নিরাশ না হয়ে পরবর্তী জীবনে বাঁচার অধিকার নিয়ে সে বাঁচতে পারবে সুখের তৃপ্তিতে। হাতের কাজ শিখে কাজ জুটলে জীবিকার ভরসা নিশ্চিত হয়। প্রয়োজন বোধে মেয়েদের কুটির শিল্পের কাজ শিখিয়ে উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। তাদের শ্রম নির্ভরশীল করতে পারলে উপার্জনক্ষম হওয়াটা হবে সহজ। মেয়েরা যদি প্রশিক্ষণ দ্বারা বিভিন্ন হাতের কাজে দক্ষতা অর্জন করতে পারে তাহলে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ মিলবে। শখের কাজ থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা স্বামীর বাড়ীর নির্যতন থেকে অনেক আনন্দের। তখন পরজুলুম আর থাকে না। সামনে থাকেনা অন্ধকার। ধীরে ধীরে দুঃখের মনে বইতে থাকে সুখের বাতাস এবং নারী নির্যাতনের বিপরীতে ফিরে পাবে নতুন জীবন। তখন পৃথিবীটা তার কাছে নতুন হয়ে ফিরে আসবে।

শিশু মেয়ে হয়ে জন্মের পর তাকে সঠিক সময়ে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া নির্ভর করে পিতামাতার দায়িত্বের উপর। তাদের মেয়েকে অপদার্থ কিংবা

www.amarboi.org

অযোগ্য না রেখে শিক্ষার মাধ্যমে তাকে বেঁচে থাকার সুযোগ তৈরী করে দেওয়ার দায়িত্ব বাবামায়ের। প্রয়োজনে তার জীবিকার বিষয়টা ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে মেয়ের অভিভাকদের। স্কুলের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী তাদের মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে বাধ্য করতে হবে। বড় কিছু হওয়ার জন্যে নয়, বেঁচে থাকার জন্যে কমপক্ষে সে যেন প্রয়োজনে নিজেকে সাহায্য করতে পারে। অর্জিত শিক্ষার উপর নির্ভর করে সে যাতে বাঁচতে পারে অন্ততঃ সেই অবস্থাটুকু তার মধ্যে থাকতে হবে। যাতে করে সে পেটে খেয়ে বেঁচে থাকার বাস্তব সমাধানটুকু করে নিতে পারে।

শেষে একটা কথা বলতে চাই, বই পড়ুয়াদের জীবন হয় সুখের। অর্জিত শিক্ষা যখন মনের ভেতরে শক্তি যোগায় তখন তার অন্তরস্থ মনোবলই তাকে বাঁচতে শেখায়। তখন তার মাঝে সৃষ্টি হয় আত্মবিশ্বাস। এক পর্যায়ে সে তার মৃত্যুর মাঝে জীবন দেখতে পায়। সচেতন মন নিয়ে সে নিজেকে আর ধ্বংস করতে চাইবে না। তখন বাঁচার জন্যে সে নতুন করে জীবন খুঁজে পাবে এবং মনে পাবে শক্তি সাহস।

যৌতুক প্রথা প্রতিকারের উপায় হিসেবে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র উভয় দিক থেকে ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে গড়ে তুলতে হবে যৌতুক বিরোধী আন্দোলন। ইসলামের নীতি অনুসারে যৌতুক বিরোধের পক্ষে প্রধান ভূমিকা রাখতে হবে সরকারকে। কারণ সরকার দেশের জনগণের রাষ্ট্রীয় অভিভাবক। তাই জাতীয় অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে সমাজের সকল অনাচারের প্রতিকার সরকারকেই করতে হবে। দেশে নারী আইন তৈরী করে সরকার হাতগুটিয়ে বসে থাকলে দেশের নারী মুক্তি কখনও সম্ভব নয়। আইনের বইয়ে আইন আবদ্ধ থাকলে দেশের নারী কল্যাণও সম্ভব হয় না। দরকার আইনের কঠোর এবং সঠিক প্রয়োগ। একথা সবাইকে স্মরণ রাখতে হবে দেশের অসামাজিক প্রথা এবং অন্যায় আচরণগুলো পরিত্যাগ করানো সরকারের কোন করুণা নির্ভর দায়িত্ব নয়। পক্ষান্তরে এটা সরকারের সত্যসন্ধি নৈতিকতায় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব।

নারীরাও মানুষ তাই তাদের মানব অধিকার রক্ষা, পারিবারিক এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, ইসলামী সংস্কৃতিতে নারী অধিকার বাস্তবায়ন এবং রাষ্ট্রে নারী স্বাধীনতা রক্ষা এসবের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে দেশের

www.amarboi.org

সকল মানব অধিকার সংস্থা, ইসলামী সংগঠন, নারী সংগঠন সংস্থা এবং সর্বোপরি দেশের সরকারকে। সরকারকে গঠনমূলক ভূমিকা নিয়ে সমাজে যৌতুক প্রথা নির্মূল করতে হবে কঠোর হাতে। যেহেতু যৌতুক প্রথা একটা সমাজিক সমস্যা তাই সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে সমাজের অগ্রদূত হয়ে সামাজিক আন্দোলনে। সামাজিক রূপরেখার প্রসার কল্পে মুসলমান সমাজে পুরাতন চিন্তাধারার পরিবর্তন এনে ইসলামী আদর্শের সঙ্গে সমাজের নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী মানুষের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে এবং সত্য চেতনায় তাদের ধর্মজ্ঞানচক্ষু উন্মোচন করাতে পারলে যৌতুক প্রথা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারবে। তখন বাংলার মুসলিম রমণীকুল স্বতঃস্ফুর্তভাবে সমাজ নিরাপত্তার আনন্দ উৎসাহে স্বামীর ঘরে সুখের নীড় বেঁধে জীবনের মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারবে।

ইদানিং সময় ভেদে দেশের কোন কোন অঞ্চলে যৌতুক প্রথা বিলোপের কিছুটা অগ্রগতির আলো লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই সাফল্যের কার্যফল নারীমুক্তি সংগ্রামের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার অমর আত্মাকে অন্ততঃ কিছুটা হলেও বেহেশতি শান্তি দিতে পারবে।

সকল কর্তব্য কাজে ন্যায়পরায়নতা রক্ষা করা মুসলমান জাতির প্রতি আল্লাহর নির্দেশিত বিধান। এই বিধান উপেক্ষা করার অর্থ আল্লাহর আদেশকে অমান্য করা। মুসলিম সমাজে আল্লাহর বিধান অমান্য করে যৌতুক গ্রহণ সবার জন্য হারাম করা হয়েছে। কোরআন মজিদ যখন আল্লাহর সকল বিধানকে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছে তখন একান্তভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যৌতুক প্রথার বিলোপ সাধন মুসলমান সমাজের উপর স্বীকৃত দায়িত্ব যা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা সাবধান বাণী। মনে রাখতে হবে বিধান অমান্যকারীদের শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ তাদের বিচার করবেন। তাদের শাস্তি দেবেন।

www.amarboi.org

ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ও মুসলিম সমাজ

নবীজীর ওফাতের পর তেরশ সাল পর্যন্ত মুসলমানেরা জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় এককালে বিশ্ব জয় করে নিয়েছিল কিন্তু পরবর্তী পর্যায় রাজা বাদশারা নিজেদের ভোগবিলাসে মত্ত থাকায় জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন স্তব্ধ হয়ে গেল। ইসলামী চিন্তাবীদ আবুল হাসিম বলেন "এক কালে মুসলমানেরা খেজুর পাতার চাটাইয়ে যে জ্ঞান অর্জন করেছিল তা পরবর্তীতে বাদশাহী সোনার গালিচায় হারিয়ে গেল।" আস্তে আস্তে মুসলমানেরা নিরক্ষরতার দিকে আগাতে থাকায় তারা জ্ঞান চর্চা একবারে ভুলে গেল। শেষ পর্যন্ত ইসলামের যশটুকুও ধূলোয় মিশে যায়।

এই উপমহাদেশে প্রাক ব্রিটিশ যুগে এদেশে মাদ্রাসা মক্তবে আরবী এবং ফার্সী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হোত এবং এর পাশাপাশি উর্দুর সাথে অবহেলিত বাংলা শিক্ষা ব্যবস্থা নামে মাত্র ছিল। আরবী, উর্দু বিশেষ করে ফার্সী শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিত লোকেরাই সেকালীন বাদশাহী দপ্তর চালাতো। তাদের ঠাঁইও মিলতো এই শাহী দরবারে।

পরবর্তীতে মুসলমানদের মাদ্রাসা শিক্ষার ভাবনা চেতনা অনেক মুসলমানদের মধ্যে বিকাশ ঘটতে তাকে। সময়টা ছিল ইংরেজ শাসন আমল। ওয়ারেন্ট হেস্টিংস তৎকালীন সময়ে বাংলার গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালীন বেশ কিছু সংখ্যক প্রগতিশীল মুসলিম মনীষীগণ অনেক চিন্তা ভাবনা করে ১৭৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হেস্টিংস সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে কলকাতায় মুসলিম তথা উন্নত ইসলামী মাদ্রাসার আবেদন জানালেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে অক্টোবর মাসে মুসলমান ছাত্রদের জন্য ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্র তৈরীর নামে আলেয়া মাদ্রাসা অর্থাৎ একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে হেস্টিংস সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল কাজী ও মুফতী পদসমূহের জন্য কর্মচারী পদ সৃষ্টি এবং সরবরাহ করা। কারণ মুসলমানদের জন্যে দরকার মাদ্রাসা শিক্ষা। এই আলেয়া মাদ্রাসার ব্যয় ভার

www.amarboi.org

গভর্নর নিজেই বহন করতেন। দুঃখের বিষয় কলকাতায় এই আলেয়া মাদ্রাসায় সর্বমোট আটজন অধ্যক্ষই ছিলেন ইউরোপীয় অমুসলমান। তাঁরা প্রত্যেকেই ১৮৫০ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ সর্বমোট ৭৭ বছর উক্ত আলেয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে বহাল ছিলেন। তাঁরা কোন দিনই মুসলমানদের শুভাকাংখী ছিলেন না। তাঁরা ইসলামী শিক্ষার নামে মুসলমানদের সংকীর্ণতার বেড়াজালে জড়িয়ে রেখেছিল মুসলিম ধ্বংসের চক্রান্তে। ইসলামী শিক্ষাকে গৌণ অবস্থায় স্থান দিয়ে মুসলমান জাতিকে পিছনে অর্থাৎ দূরে অনেক দূরে রাখার জন্যে ইউরোপীয় ইংরেজী তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা চালু করে ইসলামী শিক্ষায় ভরাডুবির প্রয়াসে মুসলমানদের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ রেখে ইউরোপীয় শিক্ষা এই উপমহাদেশে জোড়েসোরে আসন গেড়ে বসে। ফলে ইউরোপীয় সভ্যতা ক্রমে ক্রমে এদেশে মুসলিম সভ্যতায় অভিশাপের জাল বিস্তার করতে থাকে।

মাদ্রাসা শিক্ষা চালু হওয়ার পরবর্তীতে লর্ড কর্ণওয়ালিস কাজী ও মুফতী পদগুলো বিলোপ করে দেন। তখন মাদ্রাসা শিক্ষকদের জীবন পথে জীবিকার বড় ধরনের বাধা দেখা দিল। তাদের চাকরি প্রাপ্তির আশা বিলুপ্ত হয়ে গেল। তখন তারা মোল্লা এবং আলেম হিসেবে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। উদ্দেশ্য ঐ সব অঞ্চলে গণ্ডমূর্খ মুসলমানদের ধর্মজ্ঞান দান করে নিজেদের অন্ন সংস্থান করা। তাদের ঝুব্বা ঝোলায় একটু আরবী, একটু ফার্সী, তার সাথে কিছুটা ভেজাল বাংলা মিশানো পণ্য নিয়ে অর্থ উপার্জনের আগ্রহটা ছিল ধর্ম ব্যবসায় বেচাকেনায় বিনিময় মূল্য। এভাবে গতানুগতিক ভাবে স্বল্প ধর্মজ্ঞানকে পুঁজি করে এই উপমহাদেশে তথা অবিভক্ত ভারতে সাধারণ মুসলমান ব্যক্তিদের কাছে তারা ধর্ম শিক্ষার আবেদন পেশ আরম্ভ করতে থাকে। এই আবেদনে তারা যথেষ্ট কামিয়াবও হয়েছিল। গ্রীষ্মের প্রখর রোদে মৃতপ্রায় উদ্ভিদ বর্ষার পানিতে যেমন প্রাণ সঞ্চার করে তেমনি সবুজে শোভিত হয়ে উঠলো এই মোল্লা, মুফতি, মোকাদিম ও মৌলুভী সাহেবরা। গ্রামের খানকা ঘরে আশ্রয় করে নিয়ে আরবী মিশ্রণ অশুদ্ধ বাংলা শিক্ষাদানের কাজে প্রচেষ্টা চালিয়ে পরিশ্রম করতে লাগলো এই মোল্লা, মুফতি, মোকাদিম ও মৌলুভী সাহেবরা। তাদের কথ্যবাংলা ভাষায় আরবী, ফার্সী শব্দের প্রচলন শুরু হয়েছিল মুসলিম যুগ থেকে। একারণে মুসলমান সমাজে আচার আচরণে আরবী ফার্সী ব্যবহার হোত অবাধে।

www.amarboi.org

ভারতে ইংরেজ জাতির আবির্ভাবের পূর্বে এবং পরেও বাংলা ভাষায় অজস্র আরবী ফার্সী শব্দের মিলন ঘটিয়ে মৌলুভী মুফতি সাহেবরা ছেঁড়া বাংলা, ফাটা বাংলা এবং এঁটো বাংলায় কথা বলতো। এভাবে ভাষা ব্যবহারে তাদের জীবিকা সংস্থান হলেও গ্রামের ছেলে মেয়েদের তেমন উপকার হয়নি। আরবীর সাথে বাংলা শিক্ষা এটাই ছিল লেখাপড়ার পদ্ধতিগত নিয়ম। আরবী ভাষায় তারা দক্ষ হলেও বাংলা ভাষায় ছিল খুবই দুর্বল এবং শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও ছিল কাঁচা জ্ঞান। এখানেও বালিকা শিক্ষায় ছিল বড় বাধা। এই সব মৌলুভী সাহেবদের কাছে মেয়েদের পাঠিয়ে শিক্ষা গ্রহণ অশিক্ষিত পিতামাতারা কোনক্রমে মেনে নিতে পারেনি।

মোল্লা, মৌলুভী ও মুফতিদের কাজ ছিল যাতে মুসলমানী জীবন শরীয়ত মোতাবেক চলে তার দিকে লক্ষ্য রাখা। তখন থেকে মোল্লাতন্ত্রের অস্তিত্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তদানীন্তন মুসলমান সমাজও এই মোল্লাতন্ত্রের প্রতি স্বীকৃতি জানায়। মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনকে সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রণ করাও তাদের কর্তব্য কাজ হিসেবে গণ্য হোত। তাদের সীমিত জ্ঞান দ্বারা মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষা ও ধর্মীয় কালচারের উন্নয়ন করা, এটাই ছিল তাদের একটা উদ্দেশ্য। তারা 'গ্রামে-গঞ্জে মুসলমানদের ধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার ফতোয়া দিত। সমাজে তেমন কোন সমস্যা কিংবা কারো অসুখ বিসুখ দেখা দিলে তারা পানিপড়া, তেলপড়া, নুনপাড়া খাইয়ে দু'পয়সা আয় রোজগার করে নিত। তারা বিয়েশাদী পড়াতো, মসজিদে ইমামতি করতো, মুর্দার জানাজা পড়াতো। মুসলমানী জীবনে খবরদারী করার কাজটাও তাদের হাতেই ছিল। ক্রমে ক্রমে তারা পীর ফকিরে রূপান্তরিত হয়ে স্বার্থ হাসিলের জন্য সাধারণ মুসলমানদের মুরিদ প্রচেষ্টায় মাঠে নেমে পড়ে। এরপর থেকে বাংলার মুসলমানেরা বিপথগামী হতে লাগলো। মুসলমানদের অশিক্ষার কারণে প্রতিবেশী হিন্দুয়ানী প্রভাব এবং বহু কুসংস্কার পালনে বাংলার মুসলমানেরা অভ্যস্ত হয়ে পরে। হিন্দুয়ানীতে মুসলমানেরা কালক্রমে হিন্দুদেরও ছাড়িয়ে যেতে বসে। সমাজে সিন্নি বিরতণ, তবরুক দেওয়া থেকে আরম্ভ করে পীর পূজা, করব পূজা, পীরের নামে দর্গা তৈরী করে তার সামনে মাটির তৈরী দুলদুল মূর্তি সাজিয়ে সন্ধ্যায় চেরাগ বাতি জ্বালা সবই মুসলমান সমাজে তথাকথিত ধর্মীয় রেওয়াজ হিসেবে স্থান দখল করে বসে।

www.amarboi.org

ব্রিটিশ সভ্যতার যুগে মুসলমানেরা তখনও সংকীর্ণতার চক্রে আটকে ছিল, ফলে তারা শিক্ষার দিকে না ভাল করে বাংলা ভাষায় উৎকর্ষ সাধন করতে পারলো, না ইংরেজী সাহিত্যকে নিজেদের স্বার্থে গ্রহণ করলো। তখন তারা না হলো হোমের না যজ্ঞের। মাতৃভাষা বাংলা এটুকুও প্রায় ভুলতে বসলো।

তৎকালীন সময়ে ফার্সী এবং উর্দু ভাষা মুসলমানদের কাছে ছিল অনেক উঁচু দরের ভাষা। তাদের ধারণা ছিল ইংরেজি ভাষার ফাঁদে পড়লে মুসলমানদের ধর্ম হারাতে হবে। তখন এক শ্রেণীর মুসলমানেরা মনে করলো যারা বাংলা ভাষা নিয়ে গর্ব করে কিংবা বাংলা শিখতে চায় তাদের উপবাসে দিন কাটাতে হবে। তাদের জীবিকার অভাব কোন দিন দূর হবে না। এমন কি তাদের মধ্যে অনেকে বাংলায় লেখাপড়া করা হারাম বলে ফতোয়া দিত। তখন মুসলমানেরা পরে গেল এক দুর্যোগময় অবস্থায়। বাংলা, উর্দু, আরবী ও ফার্সী সব ভাষাগুলো একে একে প্রসার গতির কালস্রোতে ভাটা পড়ে যায়। তখন মুসলমানেরা কোন ভাষাটা সুন্দর করে আয়ত্বে নিতে পারেনি। কালের অমোঘ পরিবর্তনে প্রাচীন ভাবধারায় সেই মুঘলযুগের পতনের সাথে আরবী, উর্দু, ও ফার্সী শিক্ষা বিলীন হতে লাগলো।

এরপর এসে গেল ব্রিটিশ রাজদণ্ড আমল। তারা ফুর্তির সঙ্গে রাজত্ব করতে শুরু করে দিলো ভারতের মাটিতে। ১৭৫৭ সালে সদ্য রাজ্যহারা বাংলার মুসলমানেরা যখন ইংরেজ জাতিকে ঘৃণায় ধিক্কার দিয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছিল তখন ঐসব এলাকার প্রতিবেশী হিন্দু জাতি ইংরেজ জাতির বিজয়কে অভিনন্দ জানিয়ে রাজনৈতিক এবং সামাজিক ফায়দা লাভের উৎস হিসেবে ইংরেজদের খুশিমনে গ্রহণ করে নিয়েছিল। শুরু হলো ইংরেজ আমল। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধীরগতির পরিবর্তন আসতে আরম্ভ হলো। যখন ইংরেজ আমল চালু হলো তখন ব্রিটিশরা ভারতে নিজেদের আধিপত্যের বিস্তার ঘটিয়ে ইংরেজি শিক্ষা চালু করার দিকে নজর দিতে থাকে। ইংরেজদের মাতৃভাষা ইংরেজী হওয়ায় ভারতে তাদের ভাষা সমস্যা দেখা দেওয়ায় ভারত বাসীদের বিলেতের ভাষা শিখানোর জন্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন আসতে লাগলো। সূচনা হলো নব যুগের। তখন এই উপমহাদেশে ইংরেজী শাসন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় প্রথম থেকে

www.amarboi.org

আধুনিক শিক্ষা এবং মুসলমানের ধর্মীয় শিক্ষার পার্থক্যের দূরত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকায় তারা সংকীর্ণতার চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষে ইংরেজদের স্বার্থে দেশ পরিচালনার জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে চালু হলো ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা। দেশ পরিচানলায় অফিসে, কোর্ট কাচারীতে কর্মচারী চাহিদা মেটাবার জন্যে ভারতে ইংরেজী স্কুল স্থাপন করে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ঘটে। এই সূচনার পর ভারতে বেশ কয়েকটা খৃষ্টান মিশনারীদের তৎপরতায় মাদ্রাজ ও বঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার পথ প্রশস্ত হতে থাকে। ব্রিটিশ সরকারের ইংরেজী শিক্ষা চালু করার পিছনে প্রধানত মোট তিনটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ সরকারী দপ্তরে ভারতীয় কর্মচারী পদ পূরণ, দ্বিতীয়তঃ ইংরেজদের বেসরকারী অফিসসমূহে লোক নিয়োগ দ্বারা অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন এবং তৃতীয় কারণ ভারতবর্ষে খৃষ্টান ধর্ম প্রচার ও প্রসার ঘটানো। এই তিনটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতে বিলিতী স্বভাবের বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি।

ইংরেজ সরকার ১৭৯২ সালে ভারতের বেনারসে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করলে তার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি আসে রাজা রামমোহন রায়ের নিকট থেকে। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার চেয়ে ইংরেজী শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে লর্ড আমহার্স্ট সাহেবের নিকট একটা লিখিত আবেদন পেশ করেন। রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম ১৭৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে। কোন এক সময় তার বংশে এক সতীদাহ দেখে তিনি বড়ই মর্মাহত হয়ে স্বগৃহ ত্যাগ করে তিব্বতসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে হিন্দু শাস্ত্র, ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টান ধর্মে জ্ঞান লাভ করেন এবং সেই সাথে তিনি সংস্কৃত, আরবী, গ্রীক, ফার্সী, হিব্রু এবং ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সর্বান্তঃকরণে ইংরেজ শাসককে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন যার ফলে তাঁর সহযোগিতায় ইংরেজী শিক্ষায় প্রসার বহুলাংশে বিস্তার লাভ ঘটে। এই সুবাদে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মিশনারী কলেজ, বিশপস্ কলেজ, হুগলীর শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট কলেজ স্থাপিত হয়। এ ছাড়া ভারতের মাদ্রাজ ও নাগপুরে অনেককটা মিশনারী শিক্ষায়তন ও কলেজ স্থাপিত হয়। এর পরবর্তীতে বোম্বাইয়ে উচ্চ বর্ণ হিন্দুদের জন্যেও একটি কলেজ স্থাপিত হলে এই কলেজে কেবল ব্রাহ্মণদের প্রবেশাধিকারই

www.amarboi.org

ছিল। অপরপক্ষে মিশনারী স্কুল কলেজে কোন মুসলমান ছাত্ররা শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রবেশ করতো না। বিশেষ করে ঐ সময় হিন্দু যুবকরাই পাশ্চত্য শিক্ষায় ঝুঁকে পড়ে শিক্ষা গ্রহণের সকল সুযোগ সুবিধা সর্বতোভাবে লাভ করেছিল। তখন মুসলমানদের অবস্থা থাকলো তাদের অনেক পিছনে। ঐ সময় বিহার এবং উত্তর প্রদেশে বেশির ভাগ জমিদার ছিল মুসলমান। তাঁরা ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধতা করে ছিলেন বেশ জোরেশোরে। বিহারের স্থানীয় মুসলমান জমিদার এবং জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্রিটিশরা ইংরেজী শিক্ষা চালু করে ছিল। এ কারণে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতে ব্রিটিশ সরকারের একশ বছরের শাসন কাজে পূর্ণ বিকাশ ও বিস্তার লাভ করার পর ১৮৫৭ সালে আধুনিক উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বঙ্কিম বাবু ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতকধারী যুবক এবং মুসলমান যুবক দেলওয়ার হোসেন ১৮৬১ সালে হুগলী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকরা যাতে স্বাধীনভাবে অর্থকারী পেশায় যোগদান করতে পারে সে দিকে আত্মনির্ভরশীল মনমানসীকতা গড়ে তোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ছিল। যুবকদের পরীক্ষায় পাশে উপযুক্ত করে তোলা এবং পরীক্ষা গ্রহণ পূর্বক তাদের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ছিল। ভারতীয় শিক্ষিত কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দিতে না পারলে ভারতের প্রশাসন কাজে ব্যাঘাত ঘটবে এটা ব্রিটিশরা ভাল করেই বুঝেছিল। শুধু তাই নয় ভারতীয়দের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্বের মনোভাব ইউরোপীয় আদর্শে মিলন ঘটবে। ইংরেজরা প্রথমে ভারতীয়দের কেরানীবিদ্যা শিক্ষায় প্রলুব্ধ করে চাকরির বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করে এই সকল শিক্ষিত যুবকদের নিয়োগ দান করতো। ইংরেজরা তখন ভাল করেই বুঝেছিল মুসলমানদের জীবনে জীবিকার চাহিদা বেশী। উদরের চিন্তা মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনের রুটি-ডালভাতের ক্ষুধা বিমোচনের চাহিদাই ছিল প্রধান।

ইংরেজ শাসন আমলে এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অধীনে মুসলমানেরা চরম দুর্দশায় পতিত ছিল। ইংরেজরা মুসলমানদের সাথে কোন

www.amarboi.org

প্রকার সাহায্য সহযোগিতা না করে কেবলই তদের দ্বিধা-সন্দেহের চোখে দেখতো। ব্রিটিশরা মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিলে বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের ভদ্র চাকরির আশা একেবারে লোপ পেয়ে যায়। সকল সরকারী অফিসে মুসলমানেরা নগণ্য সংখ্যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও পালাপর্ব উপলক্ষ্যে কোন মুসলমান বান্দার ছুটির কোন বরাদ্ধ ছিল না। ক্রমে ক্রমে ধীর গতিতে ছোট বড় সব রকম চাকরি মুসলমানেদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের দেওয়া হোত। কেবল সরকারী চাকরি থেকেই বঞ্চিত করা হয়নি বরং শিক্ষার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল মুসলমানদের। ইংরেজরা ভারতে রাষ্ট্রিয় অফিসসমূহে মুসলমানদের চাকরি দিতে ভয় ও সন্দেহ করতো কারণ ব্রিটিশরা মনে করতো মুসলমানদের সিপাহী বিদ্রোহের পর তাদের কোন প্রকার সুযোগ দেওয়া সুবুদ্ধির কাজ নয় বলে মনে করতো। এই একমুখো নীতির ফলে মুসলমানেরা একশ বছরের অধিক কাল পর্যন্ত নিজ দেশে পরবাসী হয়ে তাদের বেঁচে থাকতে হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা যায় ব্রিটিশরা প্রথম অবস্থায় মুসলমানদের হাত থেকে বাংলার মসনদ দখল করে লওয়ার পরবর্তীকালে আবারও দিল্লীর মুসলমানদের বাদশাহী সিংহাসন বলপূর্বক ছিনিয়ে লওয়ার পর থেকে মুসলমানদের প্রতি গভীর সন্দেহ করে আসছিল।

ভারতীয় মুসলমান সৈন্যরা দুর্গতিগ্রস্থ অবস্থার কারণে ইংরেজদের প্রতি অসন্তোষ্ট হয়ে পড়ে। তারা পেশাগত ভয় বিসর্জন দিয়ে এক সময় বিদ্রোহ করে বসলে মুসলমান জাতি ইংরেজ শাসকের কাছে হয়ে পড়ে চরম চক্ষুশুল। তখন ভারতের প্রত্যেকটি শিক্ষিত মুসলমান ব্রিটিশদের কোপানলে দগ্ধ হতে থাকে নানাভাবে। বলা বাহুল্য মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের সন্দেহ ও সংশয়ের আর একটা কারণ ছিল ভারতে পুনরায় মুসলমান শাসন কায়েম করার স্বপ্নবিষ্ট খায়েশ। মুসলিম শক্তি ও মুসলিম সমাজ যাতে পুনরায় মাথা তুলতে না পারে তার ক্ষীয়মান সম্ভাবনা ধূলিসাৎ করে দেয় ব্রিটিশ সরকার। এ কারণে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের কেবল ক্রোধোন্মত্তই নয় বরং শক্তি প্রয়োগ দ্বারা সকল সময় মুসলমানদের উপর কঠোর উৎপীড়নও চালিয়ে যেত। বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতি নীলকর সাহেবদের অমানবিক নির্যাতনের কাহিনী ছিল বড়ই নির্মম। তখন পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হিন্দুদের সাথে

www.amarboi.org

ব্রিটিশরা ঘনিষ্ট ভাবে মিশে গিয়ে তাদের মনতুষ্টি দ্বারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে নিতে থাকে অতি বুদ্ধিমত্তার সাথে। পক্ষান্তরে এই সুযোগ বুঝে শিক্ষিত হিন্দুরাও তাদের সুখ-সুবিধায় যত্নবান হয়ে নিজেদের ভাগ্য গড়ে নেওয়ার কৌশল পেতে বসে। তখন মুসলমানদের বাঁচামরা সমস্যা দেখা দিলে কিছু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মধ্যে অন্নবস্ত্রের চাহিদা প্রকট হয়ে ওঠে। তখনও মুসলমানদের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ যেমন কমেনি তেমন ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহও বাড়েনি। এমনতর অবস্থায় মুসলমানদের শিক্ষার সুযোগ লাভের পথ প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ে।

ইংরেজী শিক্ষার প্রতি উদাসীন থাকার ফলে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে না পারার কারণে ঐ সময় ভারতীয় মুসলমানেরা তাদের আয় রোজগারে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধায় অনেক পিছিয়ে পড়ে। ইংরেজী শিক্ষা তথা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ না করার জন্য ভারতে অন্যান্য জাতি সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানেরা কোনভাবেই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছিল না। এছাড়াও ইংরেজী শিক্ষার দাপটে মুসলমানরা তখন কোণ ঠাসা হয়ে পরে। এই চরম দুর্দিনে তাদের সাহায্য করার জন্য মুসলিম চিন্তানায়ক ও সংস্কৃতির অগ্রদূত হিসেবে এগিয়ে আসেন নওয়াব আব্দুল লতিফ, উত্তর ভারতের সিংহ পুরুষ স্যার সৈয়দ আহমদ সেই সাথে যোগদেন সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ ব্যক্তিরা। তিনারা মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ এবং ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা করার জন্যে উৎসাহ দিতে থাকেন। ফলে মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক নব জাগরণ। মুসলমানদের শিক্ষা এবং চাকরির অধিকার রক্ষার চেষ্টায় তাদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে সচেতনা বোধ সৃষ্টি হতে থাকে। খান বাহাদুর আবদুল লতিফের উদ্যোগে মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলকাতায় হিন্দু কলেজটি প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং একই সাথে মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটা নির্দিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন।

নওয়াব আব্দুল লতিফ মুসলমান সমাজের অগ্রগতির জন্য মুসলিম শিক্ষা সমস্যার বিষয় ভাল করেই উপলব্ধি করে ছিলেন বলেই তিনি কলকাতার হিন্দু কলেজটির নাম বদলিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ করে মুসলমান ছাত্রদের আধুনিক শিক্ষার পথ সুগম করে দিয়ে ছিলেন। ফলে মুসলমানদের

www.amarboi.org

মধ্যে সৃষ্টি হয় এক নব চেতনার জাগরণ। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ না করা পর্যন্ত মুসলমান সমাজে কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা দূর করে শিক্ষার আলোক পথে নিতে না পারলে মুসলমানেরা অনাগ্রসরতায় থেকে যাবে, একথা নওয়াব সাহেব পরিষ্কার বুঝে ছিলেন। নওয়াব আব্দুল লতিফের আর একটা উল্লেখযোগ্য দিক ছিল ১৮৬৩ সালে মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তাদের অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে সচেনতা বৃদ্ধি করা ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস কমিয়ে এনে পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইংরেজদের সাথে মিলন ঘটানোই ছিল এই সোসাইটির অন্যতম কাজ। এরপর তিনি মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক কলেজ স্থাপনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানান। ফলশ্রুতি হিসেবে কলকাতায় মুসলমান ছাত্রদের জন্য ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে নওয়াব আব্দুল লতিফ ১৮৭২ সালে নিজ খরচে এবং কিছুটা সরকারী সাহায্যে মফস্বলে কয়েকটা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই সব মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাও চালু করা হয়। ১৮৭৩ সালে আব্দুল লতিফের চেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার হুগলী কলেজের যাবতীয় ব্যয় বহন করার সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং হাজী মহসীনের প্রদত্ত তহবিলের অর্থ বাংলার মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যয় করা হবে। এটাও সরকার মেনে নেন।

মুসলমান সমাজে সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে হুগলীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. এবং বি.এল ডিগ্রী লাভ করে লণ্ডন থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে দেশে ফিরে এসে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। কর্মজীবনে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল ছিলেন। এক সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবেও কাজ করেছেন। মুসলমানদের শিক্ষার জন্য সৈয়দ আমীর আলীর অবদান ছিল অপরিসীম।

মুসলমান সমাজে সর্বক্ষেত্রে দুঃখ দুর্দশা দেখে মুসলমানদের পুনরুদ্ধারের জন্য স্যার সৈয়দ আহমদের আবির্ভাব ঘটে। তিনি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিট্রিশ শাসন আমলে তিনি ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য থাকাকালীন তাঁর কাজের

www.amarboi.org

স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি মুসলমানদের শোচনীয় দুঃখ দুর্দশার অবস্থায় বড়ই ব্যথিত হয়ে পড়েন। তিনি ঐ সময় মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ এবং একই সাথে ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা করার উপদেশ দেন। স্যার সৈয়দ আহমদ একদিকে ব্রিটিশ সরকার অন্যদিকে ভারতীয় মুসলমান এই দু'য়ের মধ্যে সৌহার্দ্যের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। ভারতীয় মুসলমানদের মনকে মানুষ করার কাজে তিনি অনেক অবদান রেখেছেন।

স্যার সৈয়দ আহম্মদ মুসলিম সম্প্রদায়ের পাশ্চত্য শিক্ষা এবং শিক্ষার ভাবধারার প্রসার ঘটানোর জন্য ১৮৬৪ সালে গাজীপুরে একটি ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৭৫ সালে আলীগড়ে মোহমেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। দু'বছর পরে স্কুলটি কলেজে উন্নীত হয় ফলে এই সন্ধিক্ষণে সকল মুসলমান ছাত্রদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধুনিক শিক্ষার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। এখানে মুসলমান ছাত্ররা আধুনিক কলা, বিজ্ঞান শিক্ষা ছাড়াও মুসলিম সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মিলনে এই আলীগড় তাদের ঐক্যের সেতুবন্ধন রচনা করে। ফলে মুসলমানের আধুনিক ভাবধারা ও চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে। পরবর্তীতে এই কলেজ তাদের রাজনৈতিক জীবনেও প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জিলার অন্তর্গত দেওবন্দ নামক স্থানে স্থাপিত হয় বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "দারুল উলুম মাদ্রাসা।" আহমদ রেজা খান সাহেব দেওবন্দ মাদ্রাসার মূল প্রতিষ্ঠাতা। এই মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষাকদের সম্মিলিত কর্ম তৎপরতা থেকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক যে আন্দোলনটি গড়ে ওঠে তা পরবর্তীতে একটি বাস্তব জিহাদের রূপ লাভ করে। তিনি ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর আলীগড় আন্দোলন মুসলিম সমাজে এক নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে।

ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রথমে প্রভাব ঘটলো বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে। তখন ইংরেজদের রাজভাষার কদর ছিল অনেক বেশী। শিক্ষিত হিন্দু যুবকেরা ইংরেজদের প্রলোভনে পড়ে ইংরেজি রাজভাষার রাস্তা দিয়ে চলতে

www.amarboi.org

লাগলো। বিলেতী বিদ্যাশিক্ষা ও সভ্যতাকে অবলিলাক্রমে প্রথমে বরণ করে নিলো হিন্দু বাঙ্গালীরা। হিন্দু নব্য শিক্ষিত যুবকেরা ব্রিটিশদের ইউরোপীয় সংস্কৃতি তাদের মনের মাঝে স্থান দিতে কুণ্ঠা করেনি। নব্য রাজনৈতিক ও বিলেতী কালচারের মূল্যবোধে বর্ণ শিক্ষিত হিন্দুদের রুচির বিকার ঘটলো। পাশ্চাত্য কালচার ও চিন্তাধারায় অনুশীল এবং হিন্দু মনমানসে বিকৃত অনুকরণ প্রবণতা ক্রমেই তাদের সমাজে বিস্তার লাভ করে বসে। নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের হিন্দু যুবকেরা দেহে বিলেতী পোষাকে, মুখে বিলেতী ভাষা, হাবভাবে এবং ঢংঢাং চালচলনে ইংরেজীয়ানায় রূপ নেয়। হিন্দু সমাজে বিলেতী হাওয়ার গন্ধে মাতামাতির জোয়ার বইয়ে দেয়। তারা খৃষ্টান ধর্মকে গর্বের বিষয় বিবেচনা করতে থাকলো। অনেকে খৃষ্টান ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তর ঘটালো। মহেশ চন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণ মোহন, মধুসূদন দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিরা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে ব্রিটিশ সভ্যতা ও কালচারকে কেবল অনুসরণ করেছে তা নয় বরং ইউরোপীয় উৎসাহে অনুকরণও করেছে পুরোপুরি। ফলে এই হিন্দু সমাজে ধীরে ধীরে ইউরোপীয় সভ্যতার রূপ বদলাতে থাকে। তখন এই নব্য শিক্ষিত হিন্দু সমাজে আহারে বিহারে, বসনে ভূষণে রীতিনীতি ও ধ্যান ধারণায় সব কিছু যেন রাতারাতি বদলে গেল। আধুনিক নব্য যুবেকরা ধূতি ছেড়ে ধারণ করলো মাঞ্জা করা ফুলপ্যান্ট শার্টকোর্ট সাথে ম্যাচকরা গলায় সুন্দর টাই। বিলেতী স্যুটের প্রতি তাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। পাশ্চাত্যের দেহ সজ্জায় বিলেতী পোষাক ব্যবহারে ফ্যাশন সভ্যতার মাপকাঠি হয়ে পড়লো। তাদের খাবার আসন পিঁড়ির স্থলে টেবিল চেয়ারে বসে খানাপিনা প্রথা চালু হয়ে পড়লো। তখন এক শ্রেণী বর্ণ হিন্দুদের পরনে থাকলো মিহি বুননের ফিনফিনে কালো পেড়ে কোঁচানো ধূতি, গায়ে গিলেকরা মসলিন কাপড়ের পাঞ্জাবী, চরণে কানপুরী পাম্পসু নয়তো ব্রাহ্মণী চটি। আবার কারো কারো চরণে চীনা বাড়ীর জুতা পড়ে বেতের ছড়ি হাতে দিনের বেলায় চলাফেরা করতো আর রাতের বেলায় ইংরেজ সাহেবদের সাথে বারাঙ্গনাদের আখরায় নাচগান, গীতবাদ্য শ্রবণ করে আনন্দ রসে রাত কাটাতো।

যখন ইংরেজী যুগ দ্রুত ধাবমান হচ্ছে তখন মুসলমান ধর্মনেতারা তাদের ধর্মশাস্ত্র থেকে অর্জিত বিদ্যাকে পণ্য হিসেবে বিক্রি করে পেট চালাতে লাগলো। হিন্দুদের নব্য বিলেতী কালচারের সাথে মুসলমানদের

www.amarboi.org

কালচারের তফাতটা ছিল দিন থেকে রাতের পার্থক্যের মত। ইংরেজ সভ্যতার উত্তরোত্তর পরিবর্তনের ফলে মুসলমান সমাজে এদের মনোভাবের অবস্থানটা ছিল অনেক পুরানো। একারণে মুসলমানী ভাবধারা অপরিবর্তিত অবস্থানের জন্যে ইসলামী কালচারকে ক্রমেই দুর্বল করে ফেলে। ফার্সী উর্দু মিশ্রিত অশুদ্ধ বাংলা জানা মুসলমানেরা তাদের চিরাচরিত পোষাকের কোন পরিবর্তন আনতে নারাজ ছিল। তারা আচকান শেরাউনী পোষাক হিসেবে ধরে রাখলো। একারণে ইংরেজরা তাদের ওপর মোটেই খুশী হতে পারলো না। ইংরেজ যুগে যারা যত বেশী মত পরিবর্তন করেছে তাদের বলা হোত "মর্ডান প্রগ্রেসিভ"। মুসলমানদের যেটুকু পরিবর্তন এসেছে তা কেবল তাদের পেটের দায়ে। তখন ভারতীয় হিন্দু মহাজন শ্রেণীদের দম্ভদাপট এবং বর্ণব্রাহ্মণ হিন্দুদেরও পরিকল্পিত চক্রান্ত ছিল মুসলমানদের শিক্ষা অঙ্গন থেকে বিতাড়িত করা। তখন থেকে এই হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলমান সমাজের লোকেদের যবন এবং ম্লেচ্ছ ধারণা জ্ঞানে দূরে সরিয়ে রাখতো। হিন্দু মতাদর্শে ম্লেচ্ছ অর্থ অপবিত্র। মুসলমানদের অপবিত্র জ্ঞানে সর্বতোভাবে পরিহার করে হিন্দু জাতি এদের সংস্পর্শে আসতো না। মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের বিরূপতা, বিতৃষ্ণা, অবিশ্বাস এবং সন্দেহ এতোই প্রকট হয়ে পড়লো যার ফলে হিন্দু সমাজের পাশে মুসলমানদের বসবাস করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের প্রাণের মিলনের টান ছিন্ন হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে বসলো।

মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের মনন সংকটের আর একটা মুখ্য কারণ উল্লেখ করতে হয়। ইংরেজ শাসন আমলে ইংরেজদের অনুগ্রহ পুষ্ট শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু শ্রেণীর লোক এবং হিন্দু জমিদার এদের বলা হোত বাবু। তারা ছিল ভদ্র লোক, তাই হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায় লোকেরা বাবু নামে খ্যাত। তখন বঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমানদের পেশা ছিল কৃষি। তারা ছিল হিন্দু বাবুদের জ্যোত জমির চাষাভুষা। এ জন্য মুসলমানদের অবস্থান ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক পিছনে এবং নীচে। মুসলমানেরা শত শত বছর ধরে হিন্দুদের পাশাপাশি বসবাস করে একই ক্ষেতের ফসল, একই বৃক্ষের ফল, একই নদীর জল, একই সূর্যের আলো ভোগ করে এবং একই ভাষায় কথা বলে এক সাথে পাশাপাশি মানুষ হলেও প্রতিবেশী হিন্দু জাতির মনুষ্যোচিত আচরণে ছিল ঘৃণা এবং বিভেদ বিচ্ছেদ। এজন্য কোন মুসলমানের বর্ণ

www.amarboi.org

হিন্দুর সাথে উঠাবসা ছিল সামাজিক সংকট ও ধর্মীয় নিষেধ। একজন মুসলমানকে হিন্দু বাবুর সাথে দূরে থেকে কথা বলতে হোত এবং কার্যক্ষেত্রে কোন মুসলমান আভিজাত্য বাবুর স্মরণাপন্ন হলে শেষে বাবুর হুকোর জলটুকুও ফেলে দিতে হোত তার জাত রক্ষার জন্যে। ব্রিটিশ যুগে এটাই ছিল বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমাজের সমাজ অনুশাসন।

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজরাই হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বীজ বপন করে গেছে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দীর্ঘকালের সাম্প্রদায়িক পাপের দেওয়ালের ব্যবধান গড়ে দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্টি করেছে সাম্প্রদায়িক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব। এরপর থেকে মুসলমানদের প্রতি গজিয়ে উঠলো হিন্দু জাতির ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার রোষানল। মুসলমানেরা বাংলায় শত শত বছর ধরে বাস করলেও সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা মুসলমানদের ভারতবাসী না ভেবে ভাবতো আবরবাসী। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ হিন্দুরা মুসলমানদের কোন সময় ভারতবাসী বলে স্বীকার করতো না। সকল সামাজিক মেলামেশায় হিন্দুরা মুসলমানদের বিদেশী ম্লেচ্ছ ভেবে দূরে ঠেলে রাখতো। মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের নিষ্ঠুর মনোভাবের শাসন নীতি কঠোর হলেও মুসলমানদের সান্নিধ্য ত্যাগ করে বর্ণহিন্দু জাতি সম্প্রদায়ের ধর্ম এবং আত্মার পবিত্রতা রক্ষাটা ছিল আরও ভীষণ ও মর্মান্তিক।

ইংরেজ শাসন আমলে সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে সব অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে তা কেবল মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজেই সাফল্য বয়ে এনেছে। ১৮০০ সালের প্রথম দিকে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে তখনও নারী শিক্ষা ছিলনা বললেই চলে। মুসলমান সমাজের মত হিন্দু নারী শিক্ষা ব্যাধি আকারে মানবতার কলংক রূপে হিন্দু সমাজে বিরাজ করতো ধর্মীয় কুসংস্কার। উদাহরণ টেনে বলতে হয় ঐ সব কলংকের কয়েকটা মর্মান্তিক ঘটনা। তখন হিন্দু সমাজে বিরাজমান সতীদাহ, গঙ্গাজলে মানতের সন্তান নিক্ষেপ, রথচক্রতলে জীবন আত্মহুতি, কালী মন্দিরে নরবলী, কন্যাদায়ে পণ প্রথায় বিবাহ ভঙ্গ হলে নিজ কন্যা হত্যা এসব ছিল হিন্দু সমাজ দেহে বিষাক্ত ক্ষতের মত চরম অভিশাপ।

এ ভাবেই প্রাচীন হিন্দুধর্মে ছিল নানা কুসংস্কার এবং ধর্ম গোড়ামী। তাদের ধর্মের মাঝে অনেক কিছুই ছিল অমানবিক যা সভ্য সমাজের জন্য

www.amarboi.org

বড়ই বিশ্রী ব্যাপার এবং মর্মান্তিক ঘটনা। তাদের ধর্মের দোষ ত্রুটিগুলো শোচনীয় অবস্থার আলোকে আনা হলে ব্রিটিশ সরকারকে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন দ্বারা তা নিষিদ্ধ করতে হয়েছে। আইন প্রণয়ন করে বিধবা বিবাহকে কার্যকর করতে হয়েছে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের আইনের বিধান বলে। ব্রিটিশ সরকার হিন্দু জাতির ধর্ম-বিকৃতি দূরীভূত করে এবং ধর্ম অত্যাচার থেকে রক্ষা করে তাদের মাঝে সামাজিক এবং মানবিক স্বস্তি দান করার কারণে ইংরেজরা ছিল হিন্দু সমাজে মর্তের দেবতা।

ব্রিটিশ শাসক ভারতে নিজ স্বার্থে আধুনিক শিক্ষা তথা ইংরেজী শিক্ষা চালু করলে বাঙ্গালী হিন্দু যুবকদের বাংলা শিক্ষা ছেড়ে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের মোহ সৃষ্টি হয়। ইংরেজদের আবির্ভাবের প্রভাবে হিন্দু সমাজে সব কিছুর রাতারাতি পরিবর্তন আসতে লাগলো। কিন্তু মুসলমান সমাজে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের কোন আগ্রহ ছিল না। তখন মুসলিম নারী শিক্ষার অবস্থা ছিল যবনিকাপাতের মত মর্মে আঘাত। মুসলিম সমাজে শিক্ষা গ্রহণে অনীহার অন্য আর এক কারণ ছিল মুসলমানদের দর্শন মতবাদ। তারা শিক্ষার নামে ইংরেজ জাতির সাথে মিশে যেতে যেমন রাজি ছিল না তেমনি হিন্দুত্বের মধ্যে বিলীন হতেও ছিল অপ্রস্তুত। তখন ইংরেজ মানস ভিত্তিক চিন্তায় ব্রিটেনের জাতিয়তায় দহরম মহরমে মুসলমানদের দেখা দিল চরম বিরোধ। এ কারণে মুসলমান নারী শিক্ষার সুযোগ লাভের পথও ছিল কণ্টকাকীর্ণ।

ইংরেজ যুগের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে নারী জাতি বিশেষ করে মুসলিম নারী জাতির কোন ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। ইংরেজরা ভারতে প্রথম কেবল পুরুষ শিক্ষার দিকে নজর খবরদারী করে ইংরেজী শিক্ষা চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল কেবল তাদের স্বার্থে। ব্রিটিশ কোম্পানী আমলে ১৮৩০ সালের পূর্বে বাংলাদেশে তখনও কোন বালিকা বিদ্যালয় ছিলনা। নিম্ন শ্রেণীর দু'চারটে পাঠশালা কলকাতার কোন কোন অলিগলির এলাকাগুলোতে দেখা যেত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বেথুন সাহেবের প্রচেষ্টায় বেথুন সাহেবের নামে ১৮৫০ সালে বেথুন বালিকা স্কুল স্থাপিত হয় কেবল উচ্চ বর্ণ হিন্দু বালিকাদের জন্য। পরে এটি বেথুন কলেজে উন্নিত হয়। হিন্দুমেয়েরা পালকিতে কিংবা ঘোড়ায় টানা টমটম গাড়ীতে চড়ে এই কলেজে ক্লাস করতে আসতো। উনিশ শতকে এই একটি মাত্র মহিলা কলেজ ছিল সারা বাংলাদেশে। অবশ্য নারী শিক্ষা সম্বন্ধে

www.amarboi.org

হিন্দু সমাজে ছিল একচ্ছত্র ভোগাধিকার এবং মহিলা শিক্ষা বিস্তারে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন একথা আগেই উল্লেখ করেছি। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে কলকাতায় গৌরীবাড়ীতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল কেবল হিন্দু বালিকা শিক্ষার জন্যে।

কলকাতায় মহিলা বেথুন কলেজ স্থাপিত হলেও মুসলমান মেয়েদের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। এ সময় মুসলমান নারী শিক্ষার জন্যে বাইরে থেকেও কোন তোড়জোড় দেখা যায়নি। ঐ সময় পুরুষ শিক্ষার সূত্রপাত হয় মধ্যযুগ থেকে। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান পড়ুয়া ছাত্র ছিল না বললেই চলে, হাতে গুণা মাত্র দু'একজনের সন্ধান মিলতো সারা বাংলা জুড়ে। দেখা যায় মুসলিম পুরুষ শিক্ষার অতি সামান্য উন্নতি হলেও মুসলিম নারী শিক্ষা এগিয়ে যাবে এমন কোন বিশেষ তথ্য মেলে না। পরবর্তীতে দু'একটা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও সেখানে মুসলিম বালিকা শিক্ষার কোন উদ্দ্যোগ ছিল না। কারণ ছিল ইংরেজী শিক্ষা। এ কারণে এখানেও মুসলমান মেয়েদের বিদ্যা শিক্ষায় প্রবেশাধিকারে অনেক অন্তরায় ছিল। বেনিয়াদের ইংরেজী ভাষা শিক্ষা মুসলমানদের জন্য হারাম। এই ধর্মান্ধতার কারণে মুসলমান সমাজে কুসংস্কারটা ছিল বেশ বড় ধরনের প্রত্যক্ষ আক্রমন। সে সময় মুসলমান নারীশিক্ষা নারীর পক্ষে পাপাচার হিসেবে গণ্য হোত। ধর্মীয় কুসংস্কারই ছিল নারী শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। (সূত্রঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তন অধ্যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক আমল।)

সময়টা ছিল ব্রিটিশ শাসন আমলে মধ্যযুগের অনেক পরে হলেও মুসলমানেরা তখনও বাংলা এবং আরবী ভাষায় ছিল অনেক দুর্বল অথবা যারা আরবী এবং বাংলা ভাষায় পূর্ণতা লাভ করেছিল হয়তো তারা এ দিকে মনোনিবেশ করেনি। বেশী দিনের কথা নয় ব্রিটিশ শাসন আমল অবসানের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একজন ইহুদি তখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী এবং ইসলামীয়াতের প্রধান ছিলেন Dr. J. W. Fuck, তিনি ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই পদের জন্য উপযুক্ত মুসলমান শিক্ষাবীদ থাকলেও বৃটিশ সরকার কোন স্বীকৃতি না দিয়ে একজন ইহুদিকে এই পদ মর্যাদা দিয়ে ছিলেন। (সূত্রঃ অশিক্ষা পৃষ্ঠা-১৮, লেখক মোহাম্মদ সুজাত আলী)

www.amarboi.org

দিল্লীর মুসলমান শাসক গোষ্ঠীর রাজ ভাষা ফার্সী থাকা সত্ত্বেও কোরআনের অনুবাদ ফার্সীতে হয়নি। হযরত শাহওয়ালি উল্লাহ দেহ লভী (রহঃ) যখন ১৭৩৮ সালে কোরআন প্রথমে ফার্সীতে অনুবাদ করেন তখন এক শ্রেণীর আলেমগণ প্রতিবাদের ঝড় তোলেন এবং বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়ে পড়েন। এই ইসলামী শিক্ষায় তৎকালীন মুসলমানেরা অনীহা দেখিয়ে নিজেদের চারিত্রিক ও মানসিক দুঃখ দৈন্যতায় নিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল। ভারতবর্ষে মুঘল আমলে রাজভাষা ছিল ফার্সী। ব্রিটিশ সরকার ১৮৩৭ সালে ভারতের রাজভাষা ফার্সী বিলুপ্ত করে ইরেজী ভাষা চালু করলে তৎকালীন মুসলমান সমাজ এই ইংরেজী ভাষা গ্রহণ করতে পারেনি। ইংরেজ আমলে একশ বছরের অনেক পরেও বাঙ্গালী মুসলমান মাতৃভাষায় লেখাপড়ায় অনেক পশ্চাৎপদ ছিল। আরবী মুসলমানদের একটি অন্যতম ভাষা। পবিত্র কোরআন গ্রন্থের আরবী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ বিষয়ে তখনও কোন মুসলমান এগিয়ে আসেনি।

ঢাকার অদূরে নরসিংদী জেলার গিরিশ চন্দ্র সেন একজন অমুসলমান মনীষা। তিনি ১৮৪৩ সালে নরসিংদী থানার পাঁচদোনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গিরিশ সেনের পিতার নাম মাধব সেন। গিরিশ সেন তিন ভাই ও দুবোনদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ। তিনি সংস্কৃতি ভাষায় একজন সুপন্ডিত হয়েও আরবী, ফার্সী এবং উর্দু ভাষায় ছিলেন পারদর্শী। তিনি ইসলাম ধর্মে মোট ২২টি পুস্তক রচনা করেছেন এবং সুদীর্ঘ ছ'বছর অকান্ত পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় পবিত্র কোরআন শরীফ ১৮৮৬ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। এরপর তৎকালীন আরবী শিক্ষিত মৌলভী, মৌলানা এবং মুসলিম অনুবাদকারীগণ গিরিশ চন্দ্র সেনকে "মৌলানা" আখ্যায়িত করেন। ঐ সময় মুসলমান আলেমগণ যা পারেনি ঠিক তখনই অমুসলিম গিরিশ সেন এই মহতি কাজটি সুচারু ভাবে সম্পাদন করে মুসলমানদের হাতে তুলে দিলেন বাংলা অনুবাদ কোরআন শরীফ। তখন মুসলমান আলেমগণ আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করলেও মাতৃভাষা বাংলায় ছিল অনেক দুর্বল। বর্তমানে অনেক মুসলিম আলেমগণ আরবী ভাষার কোরআনকে নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে সুন্দর বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে আরবী না জানা মুসলমানদের ঘরে ঘরে বাংলা কোরআন পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য এটা ধর্মীয় সাফল্যের একটা উজ্জ্বল দিক এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

www.amarboi.org

অনেকের মতে অর্থ না বুঝে কোরআনের শব্দ পাঠ করা নিরর্থক। তাঁরা মনে করেন অর্থ না বুঝে তোতাপাখির মত কোরআনের শব্দ পাঠচয়ন অর্থহীন। আসলে এই ধরনের কথাবার্তা আলেমগণের মতে সঠিক নয়। সূরা বাকারার তফসিরে উল্লেখ আছে কোরআনের শব্দ না বুঝে পাঠ করলেও এর মধ্যে সওয়াব আছে। শব্দ এবং অর্থ উভয়ই সম্মিলিত আসমানি গ্রন্থের নাম আল কোরআন। সুতরাং কোরআনের শব্দ তেলাওয়াত করাও একটা এবাদত। তবে নিজ মাতৃভাষায় কোরআনের অর্থ অনুবাদসহ বুঝে পড়লে আরবীর বাংলা অর্থ হৃদঙ্গম করা যায়। তখন অন্তরের মাঝে অর্থ জানার আনন্দে নতুন অনুভূতি জেগে ওঠে। কোরআন তেলাওয়তে আছে অফুরন্ত সওয়াব। কোরআন বুঝে পড়ার মূল কারণ কোরআনের সত্যিকার নূর ও বকরত লাভ। কোরআনের শব্দ চয়নে নিখুঁত কৌশল সবই কোরআনের গুরুত্ব বহন করে। অর্থ না বুঝে কোরআন পাঠকারীর কোন গুনাহ্ হবে না। কোরআনে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান উল্লেখ আছে। মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা, কবর এবং কবর সংক্রান্ত বিষয়, পার্থিব এবং পরলৌকিক জীবনের সকল বিষয় আল কোরআনের অর্থ না বুঝে অজ্ঞতানুসারে যিনি কোরআন পাঠ করেন তিনি নেকী অর্জনের অধিকারী হবেন। সুতরাং যে ভাবেই হোক কোরআন পাঠ সকল সময় পুণ্য বিধান।

সুদীর্ঘ সময় ধরে আরবী শিক্ষাবীদদের অকান্ত প্রচেষ্টায় আরবী কোরআন বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তারই একটি বিবরণ এখানে উল্লেখ করা হলো।

ভাষা	সন	অনুবাদকের নাম
লাতিন	১৬১৭	জোসেফ প্রেট্রিয়ারক
ফরাসী	১৬৮৮	ডিউ বিয়ার
ইংরেজী	১৬৮৮	বেন্ডাল টেলর
ফার্সী	১৭৩৮	শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী
স্পেনীয়	১৮৭৫	বেনিডো মাভগনিওনভো
উর্দু	১৮৮৬	আবদুল কাদির
বাংলা	১৮৮৬	গিরিশ চন্দ্র সেন
ডাচ	১৯০৫	কাসিমার সিক, উলম্যান, জিউইল

www.amarboi.org

পাঞ্জাবী	১৯১১	গুরুদিৎ সিং
হিন্দী	১৯১৬	আব্দুল কাদির
ইতালী	১৯১৭	আকুইলিও ফ্রেকাসি
গুজরাতী	১৯৩০	সুফিমির মুহাম্মদ ইয়াকুব
তেলেগু	১৯৩৮	চিলুকুনি নরায়না রারু
তামিল	১৯৫০	আবদুল রহমান
উড়িয়া	১৯৫১	শেখ মনসুর
অসমীয়া	১৯৫৭	তাহের উল্লাহ
মলয়ালম	১৯৬১	সি, ডাব্লু, আহম্মদ
গুরমুখী		নূর মহাম্মদ

ইদানিং কালে আল কোরআন অনেকগুলো ভাষায় অনুদিত হয়েছে। নবীজীর মাতৃভাষা ছিল আরবী এবং কোরআনের মূল ভাষাও আরবী। জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর অবিকল বাণী আরবী ভাষায় নবীজীর কাছে পৌঁছে দিতেন। কিন্তু ইসলামের প্রসার বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন দেশে আরবী না জানা মুসলমানগণ অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হন। আরবী ভাষায় আল-কোরআনের পাতায় পাতায় মহান আল্লাহ পাক কি বলেছেন তা বুঝার ক্ষমতা পৃথিবীর কোটি কোটি আরবী না জানা মুসলমানদের কাছে অজানা থেকে যায়। এজন্য পরবর্তীকালে অনেক মনীষীগণ কোরআনকে অনেকগুলো ভাষায় সঠিক অনুবাদ করে গেছেন যার একটা তালিকা উপরে বর্ণীত হয়েছে। কোরআন মানব জীবনে ইসলামের পূর্ণ জীবন বিধান। মহাগ্রন্থ আল কোরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে প্রথম সূরা বাকারা। বাকারা শব্দের অর্থ গরু এবং শেষ সূরা নাশ। নাশ শব্দের অর্থ মানুষ অর্থাৎ পশু দিয়ে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে মানুষে। এর তাৎপর্য মহান আল্লাহই ভাল জানেন। মহান আল্লাহ কোরআন গ্রন্থে অনেক ক'টি সূরার সর্বপ্রথমে পবিত্র কোরআনের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ এবং এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বিভিন্ন সূরার মাধ্যমে আমাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। এই কোরআন গ্রন্থে কোথাও কোন সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। ঐ সকল সূরার প্রথমে আল্লাহ বলেছেনঃ "এ সেই গ্রন্থ, এতে কোন সন্দেহ নাই। সাবধানীদের জন্য এ (গ্রন্থ) পথ নির্দেশক" সূরা (বাকারা আয়াত-২)।

www.amarboi.org

"বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট হতে এ গ্রন্থ অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নাই" (সূরা সিজদা- আয়াত-২)।

"এ গ্রন্থ পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে- যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর ও শক্তিশালী।" (সূরা মুমিন, আয়াত- ২)।

"এ অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ, এ এক গ্রন্থ আরবী কোরআন রূপে অবতীর্ণ, এর বাক্যসমূহ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বিশদরূপে বিবৃত হয়েছে।" (সূরা হামীম সিজদাহ, আয়াত-২)

"সুস্পষ্ট গ্রন্থের শফত। আমি এ অবতীর্ণ করেছি কোরআন রূপে আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার। এ গ্রন্থ মহান, সারগর্ভ আমার নিকট সংরক্ষিত ফলকে আছে।' (সূরা যুখরোখ, আয়াত ২)

"সুস্পষ্ট গ্রন্থের শফত নিশ্চয় আমি এ কোরআন অবতীর্ণ করেছি এক আশিষপূত (শবে কদর) রজনীতে আমি তো সতর্ককারী।" (সূরা দোখন।)

প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যায় বিশ্বমুসলিম জাহানে কোরআনকে নিয়ে অনেক গবেষণা, পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং চুলচেরা বিশ্লেষণও করা হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে আমরা গর্ব এবং প্রতিজ্ঞা নিয়ে বলতে পারি এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোরআনের কোথাও কোন মিথ্যা, অসঙ্গতি কিংবা ভুল প্রমাণিত হয়নি। এমনকি কোরআনের মধ্যে মিশ্রিত অস্পষ্টের প্রমাণও কোথাও কিছুই নেই। সুতরাং আল কোরআন সম্পর্কে আল্লাহপাক এরশাদ করেন, "এ গ্রন্থ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।" (সূরা জাযীরা এবং সূরা আহক্বাফ, আয়াত-২)

"নিঃসন্দেহে কোরআন বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ।" (সূরা শোয়ারা, আয়াত ১৯২)।

মহান আল্লাহ্পাক আরও এরশাদ করেন, "যদি আমি এ কোরআন পাহাড়ের ওপর নাজিল করতাম, তবে তুমি দেখতে পাহাড় আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যেত।"

মানব জীবনের এমন কোন দিক নাই যা আল কোরআনে মহান আল্লাহ আলোকপাত করেননি। কোরআন এমন একটা গ্রন্থ যা পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত

www.amarboi.org

কোন গ্রন্থে কোরআনের ন্যায় বিশাল পটভূমিকা লেখা হয়নি। এ গ্রন্থে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে বর্ণনা দেওয়া আছে। কোরআন মসুলমান জাতির জন্য একটি সংবিধান। আল্লাহ্ পাক যদি আল কোরআনে আমাদের জন্য কেবল নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব, যাকাত বিষয়ে আদেশ, নির্দেশ এবং উপদেশ দিতেন তাহলে এ কোরআনে হয়তো ত্রিশটি পারার প্রয়োজন হোত না। আল কোরআন হচ্ছে মুসলমান জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সকল মুসলমান যাদের আরবী ভাষা জানা নেই তাদের উচিত নিজ মাতৃভাষায় অনুদিত কোরআন সংগ্রহ করে বুঝে পড়ে, শিখে এবং জেনে নিজ জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করা। বস্তুতঃ এতে ঈমানী আকিদা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি পরকালের পাথেয় সংগ্রহের উপায়ও হয় সহজ সান্নিধ্য।

সাধারণ পাঠাকের কাছে কোরআন বিষয়ক সামান্য কিছু উল্লেখ করলে পাঠকের উদার মনে হয়তো পুণ্যাভিলাসের কৌতূহল সঞ্চার হবে। তখন এটাই তার জীবনে বয়ে আনবে ধর্মীয় কল্যাণ এবং অন্তরে পাবে মধুর আস্বাদ। কোরআন পবিত্র মানুষ হওয়ার পবিত্র গ্রন্থ এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ নির্দেশিকা। এই আসমানি গ্রন্থে আল্লাহ্ মানব জীবনের প্রতিটি বিষয়ে সুন্দর এবং সহজ ভাবে বর্ণনা করেছেন। সমগ্র কোরআন দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে পর্যায়ক্রমে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাজিল হয়েছে। কোরআনের প্রথম প্রকাশ হয়েছিল রমজান মাসের কোন এক রজনীতে। এই মর্যাদাপূর্ণ রজনীকে বলা হয় লাইলাতুল কদর। এই কোরআন মজিদের সম্বোধিত শ্রেণী হচ্ছে গোটা মানব জাতির সকল শ্রেণী। অশিক্ষিত, শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত এবং বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী পণ্ডিত সকলেই পবিত্র কোরআনের সম্বোধিত শ্রেণী। কোরআন সকল শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহর উক্তি দ্বারা সার্বিকভাবে মুগ্ধ এবং অনুগ্রহ পুষ্টে প্রভাবিত করে তোলে। এই আল কোরআন ঐশী সত্যের আকর্ষণ শক্তি দিয়ে সকল শ্রেণীর মানুষকে ধর্মীয় মর্যাদায় উন্নীত করে তোলে সকল সময় চমৎকার ভাবে।

জীবনকে সহজ করা এবং পরকালের সাফল্য অর্জনের জন্যই এই কোরআন। আল কোরআন আমাদের জীবনকে রক্ষা করার জন্য একটি আশ্চর্য হাতিয়ার। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি ত্রিশ পারা কোরআনের

www.amarboi.org

একশ চৌদ্দটি ভিন্ন ভিন্ন সূরায় যে সব বাণী দিয়েছেন তা সুসংবাদ হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে পরিপূর্ণ উপলব্ধি করার জন্য কিঞ্চিৎ অংশ বিশেষ অতি সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

মুসলমানের সমাজ জীবন থেকে আরম্ভ করে সংসার জীবন, বিবাহ জীবন, স্ত্রী তালাক ও তালাক আইন, মুসলিম আইন, সন্তান লালন পালনে অভিভাবক হিসেবে মাতার দায়িত্ব পালনের সুন্দর নির্দেশ। পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নির্দেশ। শিক্ষা ও শিক্ষা পদ্ধতি, শাসন ও প্রশাসন আইন, অর্থনীতি, শ্রমনীতি। ক্রয় বিক্রয়ের নিয়ম বিধান, সকল প্রকার ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতিমালা, ঋণ এবং অর্থকরি লেনদেন, বন্ধকী কারবার। বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা, ওষুধ ও ওষুধ আবিষ্কার বিষয়ক গবেষণা। রাষ্ট্র জীবন ও ধর্মজীবনে ইহকাল পরকাল বিষয়ে সকল পরিবেশ ও পরিস্থিতি সবই ধারাবাহিক ভাবে আল কোরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা আছে। কিয়ামত সংঘটিতের ভয়াবহ বর্ণনা, দোজকের নিকৃষ্ট ও কঠোর শাস্তি, বেহেশতের অনন্ত সুখ শান্তি এবং আরাম আয়াশ জীবন সবই আল্লাহ পাক কোরআনের মাধ্যমে আমাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। আকাশ মন্ডলী, পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু, মানব-জ্বীন, জীবজন্তু সৃষ্টি। চন্দ্র সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র রাজির সৃষ্টি এবং তদ্বীয় উপকারিতা, সমুদ্র মহাসমুদ্র সৃষ্টি এবং এর উপকারিতা। পানি, মধু, মৌমাছি, দুধ, পাখি, মাছ ও সকল প্রাণী ও জীবজন্তু মানব জীবনে এসবের উপকারিতা। চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, খুন হত্যা, নরহত্যা এবং সকল প্রকার অন্যায় ও অনাচার বিষয়ে দণ্ডাদেশের বিধান, সীমা লংঘন প্রবৃত্তির পরিণতি। কোরআনে আরও উল্লেখ আছে মদ, জুয়া ঘুষ প্রভৃতির শাস্তি বিধান। নামাজ কায়েম, যাকাত প্রদান, আছে রোজা ও হজ্জব্রত পালনের বিধি নির্দেশ। দরিদ্র এবং অভাবীদের প্রতি দান খয়রাত ইত্যাদি বিষয়ে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা আছে। জেহাদে অংশ গ্রহণ এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিহত করার আদেশ দিয়েছেন মহান আল্লাহ। সকল নবীদের কাহিনী ও তাঁদের জীবনের বৈচিত্র্যময় ঘটনা উল্লেখ আছে আল-কোরআনে। আল-কোরআনে বান্দার প্রতি উল্লেখ আছে হাজার হাজার আদেশ, উপদেশ, নিষেধ, নির্দেশ এবং নানা ঘটনা বহুল কাহিনী যা গল্পের মত সুন্দর বর্ণনায় ভরপুর। বিশ্বের অনেক মানব সম্প্রদায় সর্বশক্তিমান এক আল্লাহকে বিশ্বাস না করে ঠাকুর

www.amarboi.org

দেবতাদের আল্লাহ জ্ঞানে এবং তাদের মনের নিছক কল্পনা ও বিশ্বাস অনুযায়ী ঐ সকল দেবদেবী মুর্তির উপাসনা করে। মুসলমান জাতি তাদের ঐ সকল ঠাকুর দেবতাদের গালি দিলে তারাও বিদ্বেষ পরায়ন ও ক্রোধভরে এক আল্লাহকে গালি দেবে যা আসমান জমিনের সর্ব শক্তিমান আল্লাহ কখনই তা পচ্ছন্দ করেন না। এরূপ আচরণ করা আল্লাহর নিষেধ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ এরশাদ করেন "এবং তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ডাকে তাদের তোমরা গালি দেবে না, কেননা তারা অজ্ঞান বশতঃ আল্লাহকেও গালি দেবে। (সূরা আনআম, আয়াত-১০৮)। যেহেতু আল কোরআন ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান সেহেতু মানব কল্যাণের সকল বিষয় বিশদভাবে বিবৃত করা আছে আল কোরআনের পাতায় পাতায়।

এককালে অর্থাৎ ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলমানেরা বিশ্বের বুকে ছিল কালজয়ী। মুসলমানদের ছিল ইসলামী দর্শন, আদর্শ এবং পুণ্যকর্ম। অন্তরে ছিল পবিত্র চিন্তা এবং গৌরব। এই সব শক্তি দিয়ে এক কালে মুসলমানেরা যেমন বিশ্ব জয় করে ছিল তেমনি আজও মুসলমান জাতিকে কোরআন কেতাবী শিক্ষার জৌলুসে বিজাতিদের মুখোমুখি হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে ঠাঁই করে নিতে হবে মুসলমানদের নিজ নিজ দেশে।

ব্রিটিশরা হিন্দু সমাজের ভবিষ্যৎ একথাটা ইংরেজ আমলে পাহাড়ে পর্বতে এবং আকাশে বাতাসে যেন ছড়ানো ছিটানো ছিল। হিন্দুরা ছিল একান্ত ইংরেজী প্রীতি মানুষ। তীক্ষ্ণবুদ্ধি হিন্দু বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকেরা ইংরেজদের মতো ইংরেজী ভাষায় অনড়গল কথা বলা এবং লেখায় ছিল কেতাদুরস্ত। ইংরেজ আমলে শিক্ষিত হিন্দুদের ইংরেজ জাতির প্রতি ঘনিষ্ঠ চেতনা বোধ থেকেই ইংরেজী ভাষাকে আপন করে নেওয়ার আগ্রহ এবং উদ্যম প্রকাশ পেয়েছে।

ইংরেজ শাসনকালে মুসলমানেরা অনেক কারণে ইংরেজী এবং বাংলা সাহিত্যে কোন উৎকর্ষ সাধন করতে পারেনি। মুসলমানেরা ব্রিটিশ যুগে সকল দিক থেকে বিতাড়িত হতে থাকায় তাদের ধর্মশিক্ষা টুকুও ধ্বংসের পথে আগাতে থাকে। তৎকালীন সময়ে ভারতের রাজরাষ্ট্রভাষা ফার্সী উৎখাত করে ইংরেজরা তাদের ইংরেজী প্রচলন করে। তারা মুসলিম আইন ব্যবস্থা রহিত করে দেশে ব্রিটিশ আইন প্রচলন করে মুসলিম ফৌজদারী আইন একেবারে

www.amarboi.org

বাতিল করে মুসলমানদের সব দিক থেকে বঞ্চিত করা হয়। তখন মুসলমানদের আরবী, ফার্সী এবং বাংলায় জ্ঞান চর্চা স্তব্ধ হয়ে যায়।

ইংরেজ জাতির ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস সবই হিন্দুরা নিজ সম্পদ হিসেবে সযত্নে আঁকড়ে ধরে বসে, ফলে মুসলমান সমাজ ইংরেজ শাসন নীতিতে বাঙ্গালীর বাংলা ভাষাটাও কঠিন সমস্যায় আটকে পড়ে। প্রাণহীন হয়ে পড়ে মুসলমানদের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। তখন মুসলমানদের সবকিছু ব্রিটিশ চক্রান্তের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যায়। অতঃপর এগুলি আস্তে আস্তে মুসলমান সমাজ থেকে হিন্দু সমাজে স্থান পেতে থাকায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুরা তাদের জীবনকে ইংরেজী আবহাওয়ায় বিকশিত করার জন্যে জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করতে থাকে। এতে তারা অনেক কিছু অর্জন করে নিয়ে জীবনচর্চার স্বাদ আনন্দকে স্বার্থক করে তোলে। ভাবতে অবাক লাগে ঐ একই সময় জ্ঞান বৈচিত্র্যের ডালি সাজিয়ে মুসলমান জাতির খেদমতের জন্যে এগিয়ে আসেন এক অমুসলমান জ্ঞান সাধক পুরুষ। তিনি ছিলেন বহু ভাষায় পারদর্শী। নাম গিরিশ চন্দ্র সেন যা আগের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি। তিনি মুসলমান জাতির প্রয়োজনে একান্তভাবে লেগে থাকলেন আরবী কোরআনকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার প্রয়াসে। তিনি আল্লাহর পাকবাণী কোরআনকে আরবী ভাষা থেকে বাংলায় সতর্কতার সাথে নির্ভুল অনুবাদ করে মুসলমানদের হাতে তুলে দেন। ইংরেজ শাসন আমলে মুসলমান সমাজে জনৈক আবদুল কাদির এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিদ্বয় হিন্দি, উর্দু এবং ফার্সীতে কোরআন অনুবাদ করে হিন্দি উর্দু ও ফার্সী ভাষীদের ইসলাম ধর্ম জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করে দেন।

কোম্পানী আমলে মুসলমানেরা শিক্ষার সকল অধিকার না পাওয়ায় তারা বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল অনাগ্রসর। কোম্পানী আমলে ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার এক রিপোর্টে জানা যায় বাংলা বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ এবং হিন্দু সংস্কৃত কলেজে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৭০৩৬ জন। তার মধ্যে এই চারটি প্রদেশে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র ৯০৭ জন। কলকাতা মাদ্রাসা ও হুগলী মাদ্রাসা এই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়া ছাত্র সংখ্যা বাদ দিলে দেখা যায় বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রত্যেক প্রদেশে গড়ে মাত্র ১৫৫ জন করে মুসলমান ছাত্র বিদ্যাশিক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ছিল। দুঃখে সাথে বলতে হয় ব্রিটিশ সরকার মুসলমান জাতিকে

www.amarboi.org

চরম দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করায় মুসলমান সমাজ ক্ষুধার তাড়নায় পতনের তলদেশে তলিয়ে যেতে বসে। একথা সত্য, খালিপেটে কেউ জ্ঞানী হতে পারে না। ক্ষুধার তাড়নায় সর্বগ্রাসী অভিশাপে মানুষ হীন পর্যায় নেমে গেলে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার পরিস্থিতিটা তাদের জন্য হয়ে পরে একটা বাস্তবহীন প্রচেষ্টা। তখন মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনে চাল-ডাল তেল-নুন চাহিদার সমস্যাটা হয়ে পড়ে বড়ই হতাশাব্যঞ্জক। ঠিক এমনি এক অবস্থায় মুসলমানেরা যখন বাঁচার তাগিদে আত্মরক্ষার জন্যে মাথা ঠুঁকে মরছে তখন ইংরেজদের সাথে কাছের প্রতিবেশি হিন্দুরাও যদি মানবতার টানে মুসলমানদের কিছুটা সুযোগের অংশ ছেড়ে দিতো তাহলে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রে শিক্ষা সংস্কৃতির ভোজে মুসলমানদের সাথে ব্রিটিশদের তিক্ততা এবং বিদ্বেষ হয়তো অতোটা পুঞ্জীভূত হোত না। তবে যা হয়নি তার জন্য অনুশোচনা নয় কিন্তু এই ঘাতক পরিস্থিতির জন্য মুসলমানেরা প্রস্তুত ছিল না মোটেই। এ কারণে জাতি সম্প্রদায়কে দায়ী করা অথবা বাক্যব্যয় করে দোষারোপ করাটা নিশ্চয় আমার কোন জ্ঞানদম্ভ নয়। ব্রিটিশরা দেশ ছেড়ে চলে গেলেও মুসলমান সমাজ দেহে ঢেলে দেওয়া বিষক্রিয়া যন্ত্রণার কাতরতা আজও পূর্ণ উপশম হয়নি। ব্রিটিশদের তৈরী আইনের ফাঁদ থেকে জাতি আজও মুক্তি পায়নি। মুক্তি পায়নি ইংরেজী কালচার থেকে। আজও এক শ্রেণীর দেশীয় শিক্ষিতরা ইংরেজদের ইংরেজী পোষাক না পড়লে তাদের গৌরব বজায় থাকে না। ব্রিটিশ নীতির নির্ভরতায় এরাই বিদেশী রুচিতে জয়জয়কার। পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধভক্তি তাদের বৈঠকখানায় আজও ঠিকে আছে।

ব্রিটিশ শাসন আমলে সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা বাংলা ভাষায় লেখাপড়া করাটা আদৌ পছন্দ করতো না। কেবল উর্দু, ফার্সী ভাষার মধ্যে বেঁচে থাকাটাই ছিল তাঁদের চিন্তাদর্শন। এভাবে মুসলমানেরা ফার্সী উর্দু ভাষাকে অশুদ্ধ বাংলার সাথে একত্রিত করে নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে আনে বাংলা সাহিত্য জগতে। মুসলমানেরা বাংলা চর্চা না করার হেতুতে বাংলা সাহিত্য জগতে তাদের কোন অবদান না থাকলেও যতটুকু চর্চা হয়েছে সেটা কেবল তাদের পুঁথি সাহিত্য চর্চা।

বাঙ্গালী মুসলমানেরা আরবী এবং বাংলা ভাষায় দুর্বল থাকার কারণে কোরআনের অনুবাদ তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তখন একশ্রেণীর হিন্দু

www.amarboi.org

পণ্ডিত ব্যক্তিরা বাংলা শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যের ঐতিহাসিক বিপ্লব সাধন ঘটিয়ে বাংলা সাহিত্যকে নব যৌবনে এগিয়ে নিয়ে আসে। তারই ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের আরবী কোরআন সর্ব প্রথম একজন হিন্দু পণ্ডিত বাংলায় নির্ভুল অনুবাদ করে বাঙ্গালী মুসলমানদের কাছে আরবী কোরআনের বাংলা অনুবাদের মর্মবাণী পৌঁছে দেন। এরপর থেকে বাঙ্গালী মুসলমানেরা অনুধাবন করতে পারলো জীবনের সকল কার্যক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র অমূল্য বাণী কুরআনই ইসলামের শক্ত মেরুদণ্ড। এর আগে কুরআন ফার্সী, উর্দু ভাষায় অনুদিত হলেও সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমানদের পক্ষে তার মর্মবাণী বুঝা কখনই সম্ভব ছিল না। অনুদিত বাংলা কোরআন বাঙ্গালী মুসলমানেরা হাতে পেয়ে অন্তঃকরণে উপলব্ধি করতে পারলো ইসলামের আদর্শকে রক্ষা করতে হলে ইসলামের দাবী নিজ মাতৃ ভাষায় কোরআন পাঠে মুসলিম সংস্কৃতি এবং সংহতিকে অপরাজেয় শক্তিতে লালন করতেই হবে। এই কোরআন গ্রন্থ মুসলমান জাতিকে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকার জ্ঞানের সন্ধান দিয়ে অজেয় করে রেখেছে ইসলামের সকল বিধি ব্যবস্থায় চমকপ্রদ ভাবে। ইসলামের মতাদর্শে প্রকৃত মুসলমান হতে হলে পবিত্র দেহ, পবিত্র চিত্তভক্তির সাথে কোরআন পাঠ মুসলমান জাতির জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য। কোরআনের মর্মবাণী তাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং কোরআনের শিক্ষা থেকে উপকার লাভ করতে হবে কারণ কোরআন ইহকাল এবং পরকালের একমাত্র বিস্ময়কর পথ। কোরআন পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম আসমানী মহাগ্রন্থ এবং মুসলমান জাতির কাছে এক নতুন সৃষ্টি,। কোরআন সমগ্র মানব জাতির কাছে করুণা স্বরূপ এবং জ্ঞানের আকর। এই কোরআনই হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডের প্রতিকার। ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) বলেন, কোরআন কেবল পাঠ করবে এই উদ্দেশ্যে কোরআন অবতীর্ণ হয়নি। ইহার উপদেশ অনুসারে মানুষ চলবে এবং কাজ করবে। এই উদ্দেশ্যে করুণাময় আল্লাহ কোরআনকে ইহজগতে পাঠিয়েছেন। একারণে কোরআন সকল মানুষের কাছে করুণা স্বরূপ এবং বিস্ময়কর মহাগ্রন্থ যা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য অনুশাসন।

www.amarboi.org

বিশ্বমুসলিম সভ্যতা ধ্বংসের কিছু কথা

পৃথিবীটা আল্লাহর সৃষ্টি। এই মহাপৃথিবী কবে সৃষ্টি হয়েছে তা কেবল তিনিই জানেন। আর কেউ না। ইবাদতের জন্যে আল্লাহ্ এই পৃথিবী সৃষ্টি করেন। ইবাদত অর্থাৎ জীবনে শান্তির জন্যে সব কিছু। এজন্যে নিখিল বিশ্ব মাঝে এই মানব পৃথিবীটা উপযুক্ত মানব ব্যবস্থা অর্থাৎ মানব কল্যাণে সৎকর্ম-ধর্ম। মানব জীবনের সকল কাজে আল্লাহর আনুগত্যই হচ্ছে ইবাদত অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছানুসারে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করাই হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত। ভিন্নরূপে বলতে গেলে ইবাদত হচ্ছে ইসলাম ধর্মের সকল কার্যবলী পরিমাপের মাপযন্ত্র।

শতশত দেশ নিয়ে এই বিশ্বজগৎ। নানা জাতিধর্ম নিয়ে ভরে আছে প্রত্যেকটি দেশ ও জনপদ। কোনটা শক্তিশালী এবং কোনটা ধনশালী এমন একটি পরাক্রমশালী দেশ বিশ্বমাঝে রয়েছে যার নাম উত্তর আমেরিকা। জীবনের উপলব্ধি নিয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দাপটে কখনও কখনও তাদের সাথে মুখোমুখি হতে হয় অনেক ছোট বড় দেশকে।

এই উপমহাদেশে ইরাক আক্রমণ আন্তর্জাতিক এবং ইসলামী দৃষ্টিতে ছিল একটা হৃদয় ঘাতক কলঙ্ক কাহিনী। ইরাক আক্রমণ সর্বনাশা নিষ্ঠুর পরিকল্পনায় ছিল অতি জবরদস্ত আক্রমণ। শত্রুপক্ষ নানা অজুহাতে ইরাক আক্রমণের কৌশলী ফন্দি এঁটে ঈর্ষার আধিপত্য নিয়ে প্রথমে শুরু করে সাদ্দাম বিরোধী তুমুল প্রচারণা। তখন সাদ্দাম হোসেন ছিল ইরাকের প্রেসিডেন্ট। যুদ্ধ আসন্ন দেখে তিনি অনেক খানি চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন একজন সাহাসী রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর ছিল আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস। যুক্তবাহিনীর বাগদাদ আক্রমণ সাদ্দাম হোসেনকে বেশ ভাবিয়ে তুললেও তিনি নিরুৎসাহ হননি। জাতির এই মহাবিপদের দিনে অন্ধকার ঘনিভূত হবার পূর্বেই তিনি দেশের সকল ধর্মসম্প্রদায়কে একযোগে মুক্তিসংগ্রামে শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হওয়ার আহবান জানান। তিনি দেশবাসীকে এক হওয়ার নির্দেশ দিলেন দেশনেতা হিসেবে। দেশবাসীকে অস্ত্রধারণ করতে আহবান জানালেন এবং মোকাবিলার জন্য সৈন্যদের প্রস্তুত রাখলেন।

www.amarboi.org

সেনারাও ইসলামের নামে শহিদ হতে সদা প্রস্তুত থাকার জন্যে আনুগত্যের সাথে জীবন মরণ শপথ নিলেন।

কালবিলম্ব না করে প্রতিপক্ষের সাঁজোয়াশক্তি এসে গেল ইরাকের ভূখন্ডে। কালের কবলে করাল গ্রাসে পতিত হলো ইরাক দেশটি। সাত সমুদ্র তেরনদী পার হয়ে মার্কিনীরা যেভাবে আফগানিস্তান আক্রমণ করেছিল পরবর্তীতে ইংগমার্কিনীদের ইরাক আক্রমণ ছিল একই ছক্কাপাঞ্জা গুটির চাল। আরম্ভ হলো দুর্বলের ওপর সবলের কঠিন আঘাত। শত্রু সেনারা তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করে সব কিছু ধ্বংস করতে করতে অগ্রসর হতে থাকে বাগদাদের কেন্দ্রস্থলের দিকে। শত্রুরা ভয়ংকর চেহারায় দেশটাকে গ্রাস করে। ইরাকের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সবকিছু নিঃস্ব করে বিশ্ব দরবারে বাহবা কুড়িয়ে ক্ষমতার গর্বে গর্বান্ধ হয়ে পড়ে।

অতি আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত ইহুদি নাসারা সেনাদের সাথে ইরাকী ফৌজের যুদ্ধ খালি হাতে যুদ্ধের নামান্তর মাত্র। আত্মরক্ষার জন্যে ইরাকী ফৌজিদল প্রচন্ড বাধার মুখে আক্রমণ প্রতিহত করলেও শত্রু সেনারা অগ্নিবৃষ্টির মত বোমা বর্ষণে বাগদাদ শহরকে করে দেয় ধ্বংসস্তূপের লীলাভূমি। যুদ্ধে ইরাকের বহু ধনসম্পদ ও জ্ঞান ভাণ্ডার লুট করে নিয়ে যায় তাদের নিজ দেশে। ইরাকের তেল সম্পদকেও করায়ত্ত্ব করার জন্যে লুটতরাজ নেশায় ছিল সমর পাগল।

ইরাকের সেনাদল যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে শহিদ হয় দেশ রক্ষার সেবায়। বুক পেতে গুলি খেয়ে শহিদ হয় কাতারে কাতারে হাজার হাজার ইরাকী মানুষ। পঙ্গু নারী পুরুষ এবং অসহায় শিশুদের যন্ত্রণাকাতর চীৎকারে ইরাকের আকাশে বাতাসে নেমে আসে বেদনার কালো ছায়া। পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকা অসহায়রা পায়নি চিকিৎসা, ক্ষুধার আহার, পায়নি পিপাসার পানি। দেশের ইমারত, বাড়ীঘর, ইসলামী সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বড় বড় পাঠাগার, মূল্যবান প্রাচীন যাদুঘর সবই হয়ে পড়ে ইরাকের ধ্বংস যজ্ঞের লীলাক্ষেত্র। শত্রু সেনারা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ করে ধূলিস্যাৎ করে মাটিতে মিশিয়ে একাকার করে দেয় নিষ্ঠুর আক্রমণে। বাগদাদ এসে গেল ওদের হাতের মুঠোয়। ইংগমাকির্নীদের অগ্নিতপ্ত প্রচণ্ড আঘাতে দেশের সবকিছু চুরমার হয়ে যায়। ফলে ইরাক তখন দুঃখের সাগরে

www.amarboi.org

ভাসতে থাকে। ইরাকের মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে বেদনার হাহাকার। সারা ইরাক জুড়ে মানবতার আর্তচীৎকারে দেশের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বিভীষিকার করাল ছায়া। রাতের আঁধারে ইরাকের প্রকৃতি নীরবে কেঁদে বেড়ায়। ঘাসের উপর রাতের শিশিরবিন্দু বেদনার ছায়ায় বিলীন হয়ে যায়।

যুগের ঐতিহ্যাসে ইরাক একটি গণতান্ত্রিক দেশ। সার্বভৌমত্বের অধিনে রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে ইরাক মুসলমানদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ইরাক দেশটি ইরাক বাসীদের আত্মপ্রতিষ্ঠায় নিজ জন্মভূমির দেশ। ইংগমার্কিনীরা ইরাক আক্রমণ করলে ইরাকীরা তাদের মাতৃভূমি রক্ষায় জীবন মরণ পণ নিয়ে ধর্ম জিহাদে সংগ্রাম করে চলে ঐকান্তিক ভাবে আল্লাহর পথে। প্রিয় মাতৃভূমি রক্ষার জন্য ইরাকের জনগণ প্রতিনিয়ত জান মালের নিরাপাত্তা হীনতায় যখন ভুগতে থাকে তখন তারা প্রাণদৈন্যে না ভুগে কঠোরভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। প্রতিক্রিয়াশীল ইরাকের শাসন ব্যবস্থা উত্তেজনায় ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে। লড়াই বাধে। লড়াই চলতে থাকে। সুসজ্জিত জাঁকজমকপূর্ণ ইরাকের বিরাট বাগদাদ শহরটি শূন্যতায় খাঁখাঁ করতে থাকে। যুদ্ধাঘাতে অসংখ্য পরিবার হয় বিধ্বস্ত, হাজার হাজার শিশু হয় অনাথ। বাগদাদের অলিগলি আর্তনাদে হয়ে পড়ে মুখর। কত মর্মস্পর্শী ও প্রলয়ংকারী ধ্বংস লীলার বাগদাদ শহর! যারা বেঁচে থাকলো তারা দমলো না। সমগ্র বাগদাদে ব্যাপক অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়লো, ছড়িয়ে পড়লো শত্রু সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহের আগুন।

শক্তিধর শত্রুরা ইরাকের বিরুদ্ধে যেসব মিথ্যা অভিযোগ প্রচার করেছিল তা কার্যতঃ বিশ্ববাসীকে হকচকিয়ে দেয়। কারণ প্রচারে তেমন খাঁটি কিছু ছিল না। বাকী মিথ্যাটুকু দেরীতে হলেও প্রমাণিত হয়েছে। হলে হবে কি, কিছুই থেমে থাকলো না। অল্প সময়ের মধ্যে আধুনিক সমর শক্তি এসে যায় ইরাকের অভ্যন্তরে। ইরাকীদের সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে শত্রু সেনারা সন্ত্রাস দমনের ধুয়া তুলে ধ্বংসযজ্ঞ উম্মাদনায় মত্ত হয়ে পড়ে। যুদ্ধ কৌশলের অভাবে, সমর শক্তির অভাবে, রণাঙ্গন সেনাদের চোখে যুদ্ধজ্যোতির অভাবে বিজয়ের আশা শেষ হয়ে যায়। সামরিক শক্তির ভারসাম্য হীনতার কারণে বাগদাদের পতন হয়। সাদ্দাম হোসেন শাসন ক্ষমতা হারায়। শত্রু সেনারা

www.amarboi.org

ঝাঁপিয়ে পরে ইরাকের সর্ব ক্ষেত্রে। তখন ইরাকবাসী তাদের কাছে হয়ে পড়ে নিজ দেশে পরবাসী।

মনে পরে সেদিনের বাংলার কথা। যেমনটি ঘটেছিল বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে। তখন পাক হানাদার বাহিনীদের ভাষা ছিল "হামলোক মুক্তি দুশমন খতম কারনে আয়া।" পরিশেষে বাংলার মানুষ পাক বাহিনীদের কাছে এভাবেই হয়েছিল নিজ দেশে পরগৃহবাসী। কিন্তু সময় সব কিছুর ফায়সালা করে দেয়। কথায় বলে ধর্মের ঢাক বাতাসে বাজে। তারাও রেহাই পায়নি বাংলার মাটিতে। শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজয় হয়েছে। পরাজয় হয়েছে তাদের ক্ষমতা শক্তির। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে অপমানিত হয়ে তাদের বাংলা ছাড়তে হয়েছে মুখে কলংকের চুনকালি মেখে। বাংলার মাটিতে মরতে মরতে বেঁচে যাওয়া পাক সেনারা হৃর্ৎপিণ্ডের ধুকপুকানি জীবন নিয়ে বাংলা ছেড়েছে গভীর ব্যর্থতার এবং অপমানের গ্লানি নিয়ে। সেই মুহূর্তে তাদের মনের যন্ত্রণা, হৃদয়ের যন্ত্রণা, চোখের যন্ত্রণা কেমন ছিল কেবল তারাই বুঝেছে তাদের দুর্ভাগ্যজনক ট্রাজেডির অভিজ্ঞতা নিয়ে।

কোন দেশ শক্তিতে বেড়ে উঠে বড় হলে অনেক ক্ষেত্রে তাদের মূল্যবোধের ফাটল ধরে। বুশ সাহেব ছিলেন বিশ্বঘটনার একজন ব্যক্তিত্ব। তাঁর ক্ষমতার দাপট ছিল অনেক বেশী। তাঁর ইরাক আক্রমণ ইতিহাসের পাতায় হয়তো সভ্যতার কলংক হিসেবে নজির হয়ে থাকবে। ইরাকে ইরাক সভ্যতার কবর হলো। মানবতার সাধনাকবজ ইরাককে রক্ষা করতে পারলো না।

একজন খ্যাতিনামা ব্যক্তি লর্ড জটলাও সাহেব বলেছেন "মানুষের মধ্যে ভালো কাজ ও মন্দ কাজ বোঝার মত জ্ঞান যখন থেকে এলো এবং মানুষ যখন থেকে অন্যকে ভাল কাজের প্রেরণা দিতে শিখলো এবং মন্দ কাজের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে শিখলো তখন থেকে মানব সভ্যতার চাকা চলতে শুরু করলো।" ইরাক আক্রমণের সময় বুশ সাহেবের এই সত্যটি হয়তো তাঁর চেতনা থেকে বিচ্যুতি ঘটেছিল। আগ্রাসনের নেশায় তিনি জেঁকে বসে ছিলেন আধিপত্য বিস্তারের আকাংখায়। যুদ্ধাঘাতের শক্তি একে একে তছনছ করে দেয় ইরাকের সৌন্দর্য এবং সভ্যতার সমাহার। কারণ যাই হোক তা নির্ণয় করা দুরূহ নয়। এই সত্যটাই এখানে ফুটে উঠেছে যে, শক্তির

www.amarboi.org

হস্তক্ষেপের ফলেই ইরাক হয়ে পড়ে একটা শক্তিহীন রাষ্ট্র।

প্রসঙ্গের দাবী নিয়ে একটি ন্যায় মনস্ক উক্তি উল্লেখ করছি, ডেল কার্নেগী তাঁর "সাফল্য লাভের সহজ উপায়" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন যে, মিঃ ফ্রান্সিসিস বেকন বলেন, "স্বাধীনতা বিনষ্ট করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করাটা একটা আশ্চর্য রকমের আকাঙ্ক্ষা। নিজ আত্মশক্তিকে বিসর্জন দিয়ে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করাটাও একটা অত্যাশ্চর্য আকাঙ্ক্ষা। বলা যায়, এই আশ্চার্য আকাঙ্ক্ষা মানুষ খুব কমই করে থাকে। ইহা একটি স্বার্থবশের আকাঙ্ক্ষা মাত্র এবং বিরুদ্ধবাদী হীনমন্যতা।"

নওশেরোয়া বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বাগদাদ এলাকায় একটা বাগান তৈরী করেছিলেন। ফার্সী ভাষায় বাগান অর্থ বাগ এবং ইনসাফ অর্থ দাদ এ থেকেই মূলশব্দ বাগদাদ। তাই শহরটির নাম হয়েছে বাগদাদ। খলিফা হারুন আর রশিদের পুত্র খলিফা মামুন আর রশিদ এই সুযোগ্য পুত্র মামুন আর রশিদের পরদাদা আবু জাফর মনসুর ইরাকের বর্তমান রাজধানী শহর স্বহস্তে বাগদাদের ভিত্তি প্রস্তর ১৪৫ হিজরীতে স্থাপন করেন। খলিফা মামুন আর রশিদের সময় "আসারুদ দাওল" নামক গ্রন্থে লেখা আছে এককালে বাগদাদে ত্রিশ হাজার মসজিদ এবং দশ হাজার হাম্মামখানা ছিল। হাজার হাজার কবি, ধর্মগুরু, সাহিত্যিক, গবেষক এবং বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞপণ্ডিত ব্যক্তিরা দূর দূরান্তর থেকে এসে কালক্রমে বাগদাদের গোরস্থানে শায়িত আছেন। বাগদাদের গোরস্থানে ইসলামের গৌরব অস্তমিত হয়েও তা উজ্জ্বল হয়ে আছে আজও। ইমাম মুসা কাজেম, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, হজরত যুনায়েদ, হজরত মারুফ কুরলী প্রমুখ মনীষীদের মাজার এই মহানগরী বাগদাদে অবস্থিত।

জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় এককালে অনেক বড় বড় কলেজ বিদ্যমান ছিল এই বাগদাদ শহরে। ইসলামের এই প্রাচীন শহরটি আজ ধ্বংস স্তূপের নগরী। অতীত কালের মতো এ কালের কথা চিন্তা করলে বলা যায় সাজানো গোছানো সুন্দর বাগদাদ আগের মতো আর নেই। এককালে প্রাচীন বাগদাদ ছিল সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু। এখন তা রূপ নেয় দুঃখের শহরে। যুগে যুগে ইরাকের মাটিতে একই ব্যাপার ঘটে গেছে বলে ইরাক বাসীদের জীবন স্পন্দন ক্রমেই যেন গতিহীন হয়ে পড়ে।

www.amarboi.org

আগে যা ঘটেনি এখন তা ঘটেছে।

বিশ্বের সকল অমুসলমান দেশ উভয় উভয়ের পরস্পর বন্ধু। তারা সব সময় নিজেদের প্রতিপত্তি কামনায় থাকে লিপ্ত এবং তাদের আগ্রাশন মনোভাব একই রকম। যুগের চেহারায় শাস্ত্রবাক্যের মত উভয়ে হৃদয়তান্ত্রিক। আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে কয়েকবার এরশাদ করেছেন, "হে বিশ্বাসীগণ, ইহুদী ও খৃষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে"। (সূরা মায়েদা আয়াত-৫১)। অতএব আল কোরআনের এই আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় ইরাকের যে বিশ্বাসঘাতক মুসলমান লোকটি বুশ ঘোষিত অর্থ পুরস্কার লাভের মোহে ইহুদি ও খৃষ্টানদের সাথে সহায়তা করে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে দখলদারী শত্রু সেনাদের কাছে ধরিয়ে দেয় এবং সাদ্দামের দুই সন্তানকেও শেষ পর্যন্ত জীবন দিতে হয় ইহুদী নাসারাদের হাতে। সেই ঘাতক লোকটি কোরআনের বিধান মতে ইহুদীদেরই একান্ত দলভুক্ত ব্যক্তি। আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইরাকের এই ব্যক্তিটি ইসলামের চিহ্নিত শত্রু হিসেবে বিবেচনা করা ন্যায়সঙ্গত।

পক্ষান্তরে দেখা গেছে দুনিয়ার সকল অমুসলমান কেউ মুসলমানদের বন্ধু নয়। সবাই এক রংয়ে পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়। একই রংয়ে নিজেদের রাঙ্গিয়ে তোলে। একই সুরে কথা বলে, একই আবর্তে, একই ধারায়, একই তালে ধেয়ে চলে রক্ত পিপাসার চরিতার্থে। সুযোগ বুঝে এরা ইসলামী দেহে থাবা মারে দস্যুতার দাপটে। তারা বীভৎস চিত্তে যমদূত মূর্তি নিয়ে নিষ্ঠুর অত্যাচারের নেশায় অন্যের স্বাধীন ভূখন্ডে অবৈধ প্রবেশ ঘটিয়ে সমর উৎপীড়ক হয়ে শুরু করে নরহত্যা এবং মত্ত হয় লুটের উন্মাদনায়।

ইরাক দেশটি সব সময় ছিল ধন সম্পদে এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রাচুর্যে ভরা। বহু কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, জ্ঞানী, বিশ্বপথিক ও বিদেশী বণিক এখানে এসে ধন সম্পদের এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রাচুর্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন। একারণে বহু বিদেশী ইরাকে এসেছে লুটের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। প্রাচীন কাল থেকে অনেক মুসলামান এবং অমুসলমানদের নজর নিবদ্ধ ছিল ইরান এবং ইরাকের তেল খনির দিকে, আবার কারো বা

www.amarboi.org

লোলুপ দৃষ্টি আরবের স্বর্ণখনির দিকে।

আজ থেকে প্রায় সারে সাতশ বছর পূর্বে হালাকু খান বাগদাদ দখল করার সময় নির্বিচারে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালিয়ে শিশু নারী পুরুষ হত্যা করে ইরাকের মাটিতে রক্তের বন্যা বইয়ে খুনে লাল করে দিয়েছিল। জ্ঞান বিজ্ঞান ধ্বংস করে বাগদাদ নগরীকে পৈশাচিক ধ্বংস যজ্ঞে পরিণত করে তোলে এবং বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম আঘাত হেনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বই ফুরাত নদীতে ফেলে দেওয়ায় নদীর পানি একেবারে নীল হয়ে যায়। অতীতে এভাবে অনেক রাজাবাদশারাও ছিল সমর লুণ্ঠনপ্রিয় এবং ভাগ্যান্বেষী রাজ্যলিপ্সু। তারাও রাজ্য জয়ের নেশায় গ্রাম, শহর অর্থাৎ সমগ্র দেশটাকে মরুভূমিতে পরিণত করে দেশের সম্পদ লুটে নিয়ে তাদের সমরঝোলা ভর্তি করে নিয়ে যায় নিজ দেশে। এককালে তৈমুরও তার খোঁড়া পা নিয়ে দুনিয়া জয় করার স্বপ্ন দেখে ছিলেন। এজন্য তিনি দুর্দমনীয় সমর লিপ্সায় মত্ত হয়ে আক্রমন করে ছিলেন চীন, মঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, ভারত প্রভৃতি বহু দেশ।

ইরাক ইসলামের একটি ঐতিহ্যময় প্রাচীন দেশ। ইরাকের মুসলমানদের একটা গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আছে। এখানে আছে ইসলামী সালতানাত, ইসলামী শোভায় ঐতিহ্যরূপ, আর আছে ইসলামী শক্তির কবর, অনেক পীর আউলিয়াদের কবর। হযরত আলী (রাঃ) কবর, নবীজীর স্নেহের নাতি ইমাম হাসান (রাঃ) কবর, ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) কবর, ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) কবর। ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) কবরের পাশে প্রাচীন গোরস্থানে বাবউল শেখ নামক স্থানে বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) কবর। এই স্থানটি শেখের দেউরী নামেও পরিচিত। সেকালের সাবেক যুগে বাগদাদের লোকেরা বড়পীর সাহেবকে শেখ বলেই জানতো এবং ডাকতো। এখানে শুধু কবর আর কবর, আরও কত কবর। শত শত মসজিদ এবং পীর আওলীয়াদের মাজার বাগদাদ শহরকে শোভামন্ডিত করে রেখেছে। তাঁদের জীবনের সকল দিকগুলোই ছিল সাধনাপূর্ণ। তাঁরা ছিলেন পরম দয়াপুষ্ট। তাঁদের জীবনের আদর্শ ছিল পূর্ণ স্নেহ মমতায় ভরা পবিত্র জীবন, ভেতর থেকে ফুলের মত ফুটে উঠা পুণ্যময় জীবন। তাঁদের সত্যজীবন ছিল আত্মকরুণায় ভরপুর।

www.amarboi.org

মুসলমান হননের আর একটা সাম্প্রতিক কালের লোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়েছে হিন্দুস্থানের মৌলবাদী গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের ২০০২ সালের মার্চ মাসে। মৌলবাদী হিন্দুরা সরকারী মদদে গুজরাটে দুহাজারেরও বেশী মুসলমাদের নির্বিচারে হত্যা করে ধন্য হয়েছে। মুসলিম নারীরা হয়েছিল আক্রমনের বিশেষ শিকার। তাদের জীবন্ত পুঁতে ফেলার আগে সকল যুবতী নারীদের সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন করে আরম্ভ করে তাদের প্রতি সতীত্বনাশ ক্রিয়াযজ্ঞ। দলবদ্ধ ভাবে দিবালোকে খোলা আকাশের নীচে সকলেই গণশ্লীলতাহানী ঘটিয়েছে শত শত মুসলমান যুবতী নারীদের উপর। দুহাজারেরও বেশী নারী পুরুষ এবং শিশুদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। আবার অনেককে জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেলাও হয়েছে। তখন কেউ তাদের জীবন রক্ষায় এগিয়ে আসেনি। এরপর আরম্ভ করে গণলুটতরাজ, মুসলমানদের বাড়ীঘর, দোকান পাট, লুট করেই ক্ষান্ত হয়নি, লুটপাট শেষে মসজিদ সহ সবকিছু আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেয় এক শ্রেণীর উগ্র হিন্দুসম্প্রদায় লোকেরা। এতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত একেবারেই ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবে যুগে যুগে মুসলমানদের নিষ্ঠুর ধ্বংস লীলার শিকার হতে হয়েছে অমুসলমানদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে। (সূত্র ঃ বুকার পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতীয় লেখিকা এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক অরুন্ধতী রায়)

জনাব গোলাম আহমাদ মোর্তজা তাঁর "গুজরাট কাণ্ডের ভয়াবহ ইতিহাস" নামক প্রবন্ধে বলেন, "গুজরাটের গোধরাকে কেন্দ্র করে যে নিষ্ঠুরতম হত্যাকণ্ড ঘটেছে তা সারা বিশ্বের চরমতম বিস্ময়। পৃথিবীর মানুষ হিটলারের নাৎসী বাহিনীর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু গোধরা কাণ্ড সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনা ও তদন্তে নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের নিকট তুলনা বিহীন ও নিষ্ঠুরতম অত্যদ্ভুত হত্যাকাণ্ড"। (ভারতে বিভিন্ন সময় মুসলিম হত্যাযজ্ঞের লোমহর্ষ বহু কাহিনী জানার জন্য ভারতীয় লেখক গোলাম আহমাদ মোর্তজা সাহেবের "ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়" গ্রন্থটি সংগ্রহ করে পড়ার জন্য পাঠকদের কাছে আবেদন রাখলাম)।

প্রাচীন জারের কাহিনী কারো অজানা নয়। সে কাহিনী কত যে ভয়াবহ তা বর্গীর অত্যাচারও স্তব্ধ হয়ে যাবে। মুসলমানেরা যুগে যুগে বিভিন্ন সময় বিজাতিদের অত্যাচারের শিকার হয়েছে। রাশিয়া বিপ্লবের যুগে মুসলমানেরা নাস্তিকদের সাথে লড়েছে জারের পক্ষ হয়ে। বিপ্লবীরাই শেষ পর্যন্ত জয়ী

www.amarboi.org

হয়েছে কিন্তু এই জয়ের সাথে সাথে মুসলমানেরা হয়েছে কচুকাটা। বহু মুসলমানকে প্রাণ দিতে হয়েছে এবং জারের হাতেই মারা গেছে এক হাজারেরও বেশী মুসলমান। বিপ্লবীদের গুলি খেয়ে মারা গেছে প্রায় এক কোটি মুসলমান। তখন অবস্থা বেগতিক দেখে অনেক মুসলমান ভয়ে দেশ ছাড়তে লাগলো। এমন কি সীমান্তবর্তী দেশগুলোতে মুসলমানেরা পালিয়ে আফগান, ইরান, ইরাক, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। এইভাবে সোভিয়েত দেশের মুসলমানেরা সংখ্যায় পাঁচ কোটি থেকে প্রায় এক কোটিতে নেমে আসে। (সূত্র ঃ দেখে এলাম রাশিয়া, মোঃ আবদুল ওয়াহ্হাব)

অন্যদিকে অর্থনৈতিক চাপে পড়ে অনেক ক্ষীয়মান মুসলমানেরা পর্যায়ক্রমে কমিউনিষ্ট হয়ে গেল। অবস্থা বেগতিক, তখন তাদের পেট চলেনা, চাকরির বাজার বড়ই মঙ্গা, ক্ষেতে খামারে ওদের স্থানটুকুও থাকলো না। আবার ধর্মভীরু আলেমরা ছিলেন মসজিদ মাদ্রাসার ইমাম, মোয়াজ্জেম, মোদ্দাররেছ এবং খাদেম। তখন এই সকল আলেমরাই হয়ে উঠলো কমিউনিষ্টদের চরম চক্ষুশূল। প্রাণে বাঁচার জন্য তাদের দেশ ছাড়তে হলো। কমিউনিষ্টদের অত্যাচার ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো, ফলে রাশিয়ার প্রায় সকল মসজিদগুলো একেবারে বিলুপ্ত হয়ে ধর্ম শিক্ষার নামটাও মুছে গেল মুসলমানদের কাছ থেকে। জারের আমলে শুধু তুর্কীস্তানে ছিল সাতাশ হাজার মসজিদ। বর্তমানে এর কোনটারই চিহ্ন নেই। রাশিয়ায় বোখারা, আন্দজান, খোজন্দ, তাসখন্দ ও কাজাকিস্তান প্রভৃতি ইসলামী কেন্দ্রভূমিগুলোর উপরে কমিউনিষ্টদের চলেছে নিষ্ঠুর অত্যাচার। কোরআন থেকে কোরআনকে করা হয়েছে উধাত্ত। তখন থেকে কোরআন শিক্ষায় ঘটেছে সমাপ্তি। আজও সেখানে কোরআন এবং হাদিস গ্রন্থের কোন কপি ছাপার অনুমতি দেওয়া হয় না। রাশিয়ায় কমিউনিষ্ট মতবাদের গোড়াতেই রয়েছে ইসলাম বিরোধী প্রচারনা এবং ধর্মবিরোধী প্রপাগান্ডা। সেখানে ইসলাম শিক্ষার জন্য কোন মক্তব মাদ্রাসা আজও নেই। এমনকি ধর্মীয় পুস্তক, ধর্মীয় সাহিত্য, কায়দা বোগদাদী মতো ছোট রেছালাগুলো পর্যন্ত সবই জোরজবরদস্তি করে বজায়প্ত করে আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে কমিউনিষ্ট পন্থিরা।

এভাবে ধীরে ধীরে ইসলামের ধর্মশিক্ষা এবং সনাতনী বাণী নিস্তেজ হয়ে পড়লো রাশিয়ার মাটিতে কিন্তু ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটা সত্ত্বেও দু'একজন ধর্মভীরু মুসলমান লোকচক্ষুর অন্তরালে খুব গোপনে আল্লাহর আরাধনা

www.amarboi.org

করতো। এই আল্লাহ ভীরুরা সব সময় আতঙ্কে থাকতো কী জানি কমিউনিষ্টরা জেনে ফেললে আবার কোন মুসিবৎ এসে যায়, বেঁচে থাকার জন্য আত্মগোপন করে দুঃশ্চিন্তায় দিন কাটাতো পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে তাদের জীবন সোঁপে দিয়ে। যুগে যুগে এইভাবে ইসলামের চিন্তাধারাকে শেষ করার প্রয়াস পেয়েছে বিভিন্ন গোত্রের অমুসলমান জাতি।

মস্কোর প্রসিদ্ধ তাতারী মসজিদটি ছিল রাশিয়ার অনেক বড় এবং সুন্দর দোতলা মসজিদ। মসজিদটির নির্মাণ কাজ ছিল প্রাচীন মুসলিম স্থাপত্যের অনুকরণে। সারা মস্কো শহরে ছিল আরও এগারটি মনোরম মসজিদ। যুগের প্রবাহে রাশিয়ার প্রতিকূল মনোভাবের কারণে এখানকার প্রায় সকল মসজিদগুলো একে একে বিধ্বস্ত এবং বিলীন হয়ে যায়। বর্তমানে মস্কোর তাতারী মসজিদটি কেবল জুম্মার দিনে দরজা খুলে দেওয়া হয় জুম্মার নামাজের জন্যে। রাশিয়ার বোখারা শহরে এককালে ছিল ৩৬০টি মাদ্রাসা এবং ঐ মাদ্রাসাগুলোতে পঞ্চাশ হাজার ছাত্র লেখাপড়া করে ইসলাম ধর্মের উপর উচ্চ শিক্ষা লাভ করতো। বিভিন্নভাবে ধর্মের বিস্তৃতি ঘটিয়ে তারা ইসলামের আদর্শকে ধরে রাখতো। বোখারা শহরে ছিল হাজার হাজার মসজিদ এবং সংখ্যায় সংখ্যায় আলেম এবং কোরআনে হাফেজ। কালের বিবর্তনে মুসলমানদের চোখে মুখে ফুটে উঠে দারুণ বেদনার ছাপ এবং নিষ্ফল আর্তনাদ। তারা অসহায় নিরুপায়। নাস্তিকদের বল প্রয়োগের কারণেই ইসলাম ধর্মের নীতি নিয়মগুলো স্তব্ধ হয়ে যায়। ধর্ম শাস্ত্র পাঠও হয়ে যায় বন্ধ। বলপূর্বক মুসলমানদের প্রকাশ্য উপাসনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পীর দরবেশদের মাজার এবং গোরস্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এভাবে রাশিয়ার কমিউনিষ্ট বিপ্লবের পর মুসলমানদের ইসলাম ধর্ম পালনের সবকিছু স্তব্ধ করে দেয় রাশিয়ার নাস্তিক কমিউনিষ্টরা। (সূত্রঃ দেখে এলাম বাশিয়া, লেখক মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব।)

আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগের এক মর্মকোষের ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। ১৪৯২ সালে ১লা এপ্রিল তারিখে স্পেনের খৃষ্টান ধর্মের রাজা ফাডিন্যান্ড ও রানী ইসাবেলার নেতৃত্বে বিরাট খৃষ্টান বাহিনী মুসলিম রাজধানী গ্রানাডা আক্রমণ করেছিল। সংখ্যায় মুসলমানগণ ছিল তাদের চেয়ে অনেক কম। রাজা মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলেন নগরীর দ্বার খুলে দিলে গ্রানাডার সকল মুসলমানদের কোন ক্ষতি করা হবে না। প্রতিশ্রুতিতে বলা হয় সকল মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া হবে। তাদের মাল সম্পদ সম্পত্তি

www.amarboi.org

সবকিছু সংরক্ষিত থাকবে। সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং মসজিদসমূহ স্বাধীন থাকবে। প্রয়োজনে তাদের মুদ্রা সাহায্য দেওয়া হবে। নারী, শিশু সন্তানদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা হবে। রাজ্যের সকল মুসলমানগণদের সাথে দয়া, নম্রতা, সহানুভূতিশীল আচরণ করা হবে। নগরবাসীদের কোন রকম অপমান ও লাঞ্ছনা দেওয়া হবে না। রাজা ফার্ডিন্যান্ডের আশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে মুসলমানগণ নগরীর দ্বার খুলে দিয়ে মসজিদের ভেতর আশ্রয় নেয়। কিন্তু নগরে প্রবেশ করেই খৃষ্টানগণ তাদের দেয় অঙ্গিকার ভঙ্গ করে সকল নগরবাসী এবং মসজিদে আশ্রয় নেওয়া মুসলমানদের হত্যা করে নগরী দখল করে নেয়। মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের বোকা বানিয়ে কার্য সিদ্ধির এই লোমহর্ষক দিনটিকে "এপ্রিলফুল" আনন্দ জয় হিসেবে উৎযাপন করে থাকে খৃষ্টান সম্প্রদায় যা মুসলমানদের কাছে আজও বিভীষিকাময় বেদনার স্মৃতি হিসাবে বড়ই মর্মান্তিক ঘটনা। (এখানে উল্লেখিত ঘটনাগুলো সবই ক্রান্তিকালিন ঐতিহাসিক ঘটনা।)

যুগযুগ ধরে এই পৃথিবীতে দু'দলের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে সংঘাত সৃষ্টি হয়ে আসছে একের পর এক। পরস্পর বিরোধী ধারণার ভেতর দিয়ে চলছে সংঘাত এবং সংঘর্ষ। পৃথিবীর বয়স যত বাড়ছে, সেই সাথে বিশ্বের জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশ ও জাতি স্বার্থগত কারণে তারা ধ্বংসাত্মক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছে একে অন্যের সাথে। মানুষ আজ সভ্যতার শীর্ষে দাঁড়িয়েও পরস্পরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নত দেশগুলোর চাহিদার পরিসীমা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য এক দেশ আর এক দেশের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে।

অতীত কাল থেকে বিজাতিরা মুসলমানদের ইসলাম চ্যুত করার অপতৎপরতার শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্যাতনের স্পৃহা নিয়ে। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক সব দিক থেকে ওরা এমন ভাবে আক্রমণ করে যাতে মুসলমানেরা ধর্মীয় বন্ধন থেকে বিছিন্ন হয়ে তাদের ধর্মে অনুসারী হয়। তারা অনেক সময় মুসলমানদের দরদীবন্ধু সেজে ইসলাম ধ্বংসের জন্য ধীর গতিতে এগিয়ে যায়। একারণে অনেক দেশের মুসলমানেরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে না।

কোন কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজাতি দেশে সংখ্যালঘু মুসলমানদের শান্তিতে বসবাস করা খুবই দুঃসময়ের কারণ। নিদারুণ দুঃখভোগের সাথে

www.amarboi.org

এই সকল সংখ্যালঘু মুসলমানেরা তাদের নিজ দেশে জীবন যাপন করে। এটা তাদের জন্য একটা দুর্দিন। কোন সময় তাদের দুঃখের অবসান হয় না। সময়ের ব্যবধানে মুসলমানদের মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ, মাজার প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করা হয়। তাদের উগ্রচণ্ডী মেজাজের কাছে বিদ্বেষটা অনেক বড় বলে মুসলমান সমাজের নিরাপত্তা এবং শান্তি স্থাপনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। তখন মুসলমানেরা ভাগ্য দোষে পথের কাঙ্গাল হয়ে জীবন কাটায়। তাদের মসজিদ মুখো হওয়াটা বড়ই ভয়ের এবং উদ্বেগের কারণ। এমনকি তারা ইসলাম শব্দটাও শুনতে একাবরেই নারাজ।

মুসলমান জাতির পিতৃপুরুষের ইসলাম ধর্মটাকে সহ্য করতে না পেরে অনেকে মরিয়া হয়ে তেড়ে আসে ঐ সব অঞ্চলের সংখ্যালঘু মুসলমানদের শাস্তি দিতে। তখন তাদের পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার কোন উপায়ও থাকে না। তাদের মতাদর্শে দেশটা যেন কেবল তাদেরই। তখন মুসলমানদের অন্তর্জীবন নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। বাঁচার জন্যে সহানুভূতিশীল পরিবেশ না পেলে মাথা কুটে কুটে পরিশেষে হয়ে পড়ে ক্লান্ত। নির্বিশেষে উৎপীড়নের আঘাত সহ্য করতে করতে পরপীড়কদের কাছে হয়ে পড়ে জাতশত্রু। তখন এর পরিণাম হয় নিতান্ত মন্দ। ফলে তাদের জীবন যাপনের প্রচেষ্টায় দেখা দেয় ক্ষীণতা এবং প্রাণশক্তির ঘটে অভাব।

আর একটা বিষয়ে বলতে হয়, যখন তখন মুসলমানেরা অমুসলমানদের হাতে যত খুন হয়েছে তার কোনটাই গোপন থাকেনি। কালক্রমে তা সবই প্রকাশ পায়। বিজাতিদের দ্বারা ইসলাম ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে মুসলমানেরা সব সময় আতঙ্কে থাকে। ভীতির কারণে ক্রমেই তারা শোচনীয় হয়ে পড়ে। প্রাণে বাঁচার জন্যে তাদের ভাগ্যে ঘটে বিচ্যুতি। তখন তাদের দুঃখের অন্ত থাকে না।

মানুষের অভিজ্ঞতাই জ্ঞান; এই তাৎপর্যময় অভিজ্ঞতার মারফতে গড়ে নিতে হয় সতর্ক জীবন। সুতরাং অভিজ্ঞতার আলোকে আত্মবিশ্বাসের সবল মুহূর্তগুলো হচ্ছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

অতীত থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের মূলে রয়েছে নিষ্ঠুরতা। এই নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনার খেলা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। দুনিয়ার বুকে সকল বিজাতিরা সব সময় ছলকৌশলে হিংস্র মনোবৃত্তি নিয়ে যুগেযুগে মুসলমানদের উপর

www.amarboi.org

অত্যাচারের আঘাত হেনে ধ্বংস করেছে তাদের ঐতিহ্যময় স্থাপত্য, শিল্পকলা এবং জ্ঞান বিজ্ঞান। বিজাতি সম্প্রদায়েরা মুসলমানদের হতভাগ্য জীবন থেকে ইসলাম বিলুপ্তির অদম্য আক্রমণে লিপ্ত আছে যুগসন্ধি কাল থেকে। প্রত্যেকটি মুসলমান দেশে অমুসলমান জাতি দ্বারা যা ঘটে এবং ঘটছে তা সবই একইরকম বাইরে থেকে আসা বিপদ। বিজাতি সম্প্রদায় মুসলিম সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি সুপরিকল্পিত ভাবে ধ্বংস করে তাদের অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগ করে মুসলমান জাতির জীবনান্ত ঘটিয়ে পথের কাঙ্গাল বানানোর প্রয়াসে লিপ্ত থাকে ইসলাম যুগের প্রথম থেকে। বিজাতি শক্তি যখন কোন মুসলমান দেশ আক্রমণ করে তখন তারা আন্তর্জাতিক আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে অন্যের স্বাধীন ভূখন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই বিজাতি সম্প্রদায়ের দ্বারা বিশ্বশান্তি কখনও সম্ভব নয়। তাদের নিজ দেশে উৎপাদিত আধুনিক সমরাস্ত্রের শক্তি বিশ্ব মুসলমানদের কাছে অশেষ দুঃখদুর্গতি এবং বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং বর্তমানে মুসলমান জাতির পরিত্রাণের জন্য তাদের নিরাপত্তার ধারণা খুবই শঙ্কাগ্রস্ত। অনেক অমুসলমান দেশ মানব অধিকার লঙ্ঘন করে মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও সন্ত্রাস চালিয়ে মুসলমান জাতি এবং জাতির শিক্ষা সংস্কৃতি ধ্বংসের উন্মত্ততায় মেতে থাকে একযোগে। একারণে বিশ্বমুসলিম জাতি বর্তমানে একটি আহত জাতি।

জগতের অমুসলমান যারা শক্তির গর্বে মত্ত, তাদের ঘাত প্রতিঘাতের বিষময় সংঘাত ও সংঘর্ষ ক্রমেই ভীষণ আকারে উত্থিত। এ ধরনের আঘাতে কেবল মুসলমান দেশ পরাশক্তি দ্বারা একের পর এক আক্রান্ত হয় সুকঠিনভাবে। ফলে জাতির ভাগ্যে বয়ে আনে সর্বনাশের চরম দুর্দিন। অমুসলমান জাতি মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর নিষ্ঠুর উৎপীড়ন ও হত্যাকাণ্ডের রক্তবন্যা বইয়ে জাতিকে পঙ্গু করে মুসলিম রাষ্ট্রদেহের চেহারা পাল্টে দেওয়াটাই হচ্ছে তাদের সুপরিকল্পিত কৌশল। তাদের অন্তরপ্রকৃতির দৈত্যটা নিষ্ঠুরতার রূপ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলিম জাতির ঐশ্বর্যভান্ডার লুটের নেশায় এবং লুটে নেয় প্রাসাদের রাজসম্পদ এবং রত্নভাণ্ডার। তাদের শক্তিস্বরূপের মূল নীতি হচ্ছে মুসলমান দেশের স্বাধীন রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, শিল্পনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মত মুসলিম রাষ্ট্রশক্তিকে নির্মূল করে একটি মৃত জাতিতে পরিণত করে তোলাই তাদের সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা। বস্তুতঃ এটাই তাদের পরিকল্পিত ইচ্ছাশক্তির অতি বাহুল্যের প্রতিফলন। বাস্তব সত্যের দিকে লক্ষ্য

www.amarboi.org

করলে তাদের দ্বন্দ্বের কথাই এসে যায় তাদের আক্রমণের আকারে প্রকারে। তাদের আক্রমণের জালে আবদ্ধ হয়ে শোচনীয় অবস্থায় বাস করতে হয় মুসলিম জাতিকে।

অন্যদের রত্নমণ্ডিত দেশ আক্রমণ করে তারা খুশিতে টগবগিয়ে ওঠে। তাদের আক্রমণ ঠেকাবে কে? কে দেবে বাধা? হাঙ্গামা পোহাতে অন্য কোন দেশ এগিয়ে আসে না। সাহসও পায় না। পক্ষান্তরে মনে হয় তারাই যেন সব কিছুতে সর্বেসর্বা। পৃথিবীটা যেন তাদের জন্য। একারণে মুসলমানদের পক্ষ হয়ে কারো মুখে প্রতিবাদের কোন ভাষাও আসে না। এমনকি প্রতিবাদের জোরালো মনও থাকে না, যারা কিছু বলে একধাপ এগিয়ে তোষামোদের সুরেই কথা বলে। এই উপমহাদেশে সংঘটিত অপরাধের ইতিকথা নিয়ে অনেকে মাথা ঘামায়, অনেকে ঘামায় না। একথা সত্য, তবুও মুসলমানেরা অসীম ধৈর্য নিয়ে শত্রু নির্যাতন সহ্য করে আসছে যুগের প্রবাহমান সময়ের সাথে।

এককালে বিশ্বের মুসলমান জাতি ইসলামী আদর্শে ছিল ঈমানি শক্তির আধার। এই ঈমানী শক্তির প্রভাবে মুসলমানেরা বলিয়ান হয়ে জয় করেছিল দুনিয়ার বহুদেশ। ইসলাম একটা বলিষ্ঠ ধর্ম। দুনিয়ার সকল মুসলমান জাতি তাদের খন্ড খন্ড শক্তিকে একত্রিত করে বলিয়ান হয়ে গতিশীল কর্মতৎপরতায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারলে মুসলমান জাতি তাদের প্রাচীন গৌরব এবং শৌর্যবীর্য আবারও ফিরে পাবে।

বর্তমান বিশ্বে মুসলমান জাতি সংখ্যায় প্রায় এক'শ পঞ্চাশ কোটির কাছাকাছি। একতাই বল একথা বিশ্বমুসলিম জাতির অন্তরে ঠাঁট দিয়ে জেহাদি ডাকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে। ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হয়ে মুসলিম নিধন চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে একযোগে রুখে দাঁড়াতে হবে বিশ্বমুসলিম জাতিকে। সকল মুসলমান ভাই ভাই (কুল্লু মুসলিমিন্ ইখওয়াতুন) তাই অন্তঃবিদ্বেষ এবং কলহ হিংসা যদি কোথাও থেকে থাকে তা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে জেহাদে নামলে বিজাতি শক্তির চলমান আক্রমণ প্রতিহত করে সাফল্যের গৌরব অর্জন সম্ভব।

মুসলমান জাতির কঠোর পরিশ্রম করার বলিষ্ঠ শক্তি, অদম্য সাহস, পর্যাপ্ত অর্থসম্পদ এবং জ্ঞান বিজ্ঞান সবই আছে, নেই কেবল আধুনিক

www.amarboi.org

প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর মতো কর্মনিষ্ঠা উদ্যোগ। আধুনিক প্রযুক্তির অভাবে পরাশক্তির তুলনায় মুসলমান জাতি অগ্রযাত্রার পথ থেকে পিছিয়ে পড়ে আছে আজও। কিন্তু কেন পিছিয়ে আছে তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বর্তমানে বিশ্বমুসলিম জাতি জ্ঞানের মহাসাগর থেকে বহু দূরে দুর্বল অবস্থায় অবস্থান করছে যা চিন্তাবীদদের চিন্তায় ধরা পরে।

বিশ্বমুসলিম জাতিপতনের উদ্ভব দোষত্রুটিগুলো কোথায় এবং এর মূল উৎসগুলো খুঁজে বের করতে হবে যাতে বুঝা যায় কারণের কারণ এবং ক্ষতির উপকরণগুলো কীভাবে বিস্তার ঘটিয়ে মুসলমান জাতিকে চরম বিপদের মাঝে নিক্ষেপ করছে। আমাদের অভিজ্ঞাতা এবং দর্শন চিন্তা দিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখতে হবে কেন এ আগ্রশন ঘটেছে।

নবীজীর সময় থেকে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে ব্যাপকভাবে। ইসলামের পরিধি আজ সারা বিশ্বব্যাপী। অতীতে ইসলামের সুন্দর মনন ও জ্ঞান চেতনা নিয়ে যারাই ইসলামের দিকে চোখ মেলেছে তারাই পর্যায়ক্রমে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছে। বিশ্বমুসলিম জাতিকে নতুন করে বিজাতি সম্প্রদায়ের চক্রান্তের বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য শত্রু নিধনের শপথ নিতে হবে। ইসলামের শাসনাদর্শে বিজাতি শত্রুশক্তিকে দমনের জন্য প্রয়োজন বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলন। ভুললে চলবেনা, আল্লাহর কালাম এবং আল্লাহর শাসন ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি বের হয় না কিংবা ত্রুটি থাকে না এবং থাকতেও পারে না। বিশ্বমুসলিম জাতি পয়গাম্বরী শক্তি নিয়ে ন্যায়ের পথে সংগ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নামলে জয় সুনিশ্চিত।

দুনিয়ার মাটিতে মাত্র দুটো শক্তিই আছে। একটা ইসলামী শক্তি অপরটা অ-ইসলামী শক্তি। একটার ওজন ভারী হলে আর একটা হয়ে যায় হাল্কা। এককালে যতোদিন ইসলামী শক্তি মাথা উঁচু রাখতে সক্ষম ছিল ততোদিন অ-ইসলামী শক্তি ছিল দুর্বল। আজ ইসলামী শক্তির দুর্বলতার সুযোগে-অ-ইসলামী শক্তি তাদের বকেয়া কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিচ্ছে। এটাই হয়তো দুনিয়ার ইতিহাস।

এই দুরাবস্থা থেকে মুসলমান জাতিকে নিষ্কৃতি পেতে হলে বিশ্বের প্রত্যেকটি মুসলমান দেশকে একতাবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে উদ্যোগ

www.amarboi.org

গ্রহণ প্রয়োজন। বিশ্বের কোন অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর আঘাত এলে তা হয়ে ওঠে মুসলিম দেহে আঘাতী যন্ত্রণা। "দুনিয়ার মজদুর এক হও" শ্লোগানের মত এক কণ্ঠে সুর মিলিয়ে বলতে হবে "দুনিয়ার মুসলিম এক হও।" অমুসলমানদের জঘন্য আচরণের চক্রান্ত যতই প্রবল হবে বিশ্বমুসলিম জাতিকে আত্মরক্ষার জন্য ঐক্য গঠনে ততই দৃঢ় হতে হবে। বিশ্বের মুসলমান জাতি একদিন গগণ পবন প্রকম্পিত করে প্রমাণ করবে মুসলিম জাতি নিদ্রিত জাতি নয়, এক বলিষ্ঠ জাগ্রত জাতি। ইসলাম ধর্ম থেঁতো থুবড়ে আবদ্ধ থাকার ধর্ম নয়।

মুসলমান জাতি তাদের অশিক্ষা এবং অজ্ঞতার কারণে নিজ ধর্মকে অন্ধের মত চোখ বুজে আঁকড়ে ধরে থাকলে ইসলামের জীবন বিধান কখনও টিকে থাকবে না। মহান আল্লাহ্ কোরআন মজিদে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা বলেছেন, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিজাতিরা যদি জ্ঞান বিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধনে সফলকাম হতে পারে তবে বিশ্বমুসলিম জাতি তাদের সমকক্ষ হতে পারবে নাই বা কেন? মুসলমান জাতিকে বিশ্বদর্শিত হয়ে ইসলামের মূল আকিদায় পূর্ণ বিশ্বাসে বলিষ্ঠ শক্তি সঞ্চয় করে পরাশক্তির প্রতিযোগিতায় নেমে শত্রুকণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে হবে। খতম করতে হবে তাদের আত্মদাম্ভিকতা।

আমাদের নৈতিক এবং ঈমানী শক্তির দুর্বলতার সুযোগে দুশমনেরা মুসলমান হননের পথে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে একের পর এক। বিশ্বমুসলমানদের পরিস্থিতির কথা গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করে সকল মুসলমান দেশ ও জাতি তাদের মিলিত শক্তি নিয়ে জাতিক এবং আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় নিজেদের অস্তিত্বকে টিকেয়ে রাখতে হবে। এজন্য জাতিকে মনে রাখতে হবে কার্য-কারণ-নীতির দ্বারা জগতের সব কিছু সম্ভব। প্রযুক্তি ও জ্ঞান বিজ্ঞানকে অবহেলায় পিছনে ফেলে রাখলে মুসলিম জাতির প্রাণশক্তি হবে দুর্বল। প্রযুক্তি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা না থাকলে জাতির নৈতিক বল থাকে না। তখন সত্যানুসন্ধানে মুসলিম জাতির সংগ্রাম ও সংঘাত হবে ক্ষতবিক্ষত।

সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে হলে বিশ্বমুসলিম জাতিকে অনেক কিছু শিখতে হবে, জানতে হবে এবং বুঝতে হবে। শুধু বিজ্ঞান নয়, শুধু প্রযুক্তি নয়, শুধু যন্ত্রপাতি নয়, শুধু কলকব্জার ব্যবহার নয়- প্রজ্ঞা, জ্ঞান বিজ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা,

www.amarboi.org

সত্যের শক্তি, ইসলামের আদর্শে উন্নত চিন্তা ভাবনা এবং প্রগতির সহায়তা নিয়ে রচনা করতে হবে মুসলিম সাফল্য জয়ের ইতিহাস।

পৃথিবীর সুন্দর পরিবেশে মুসলমান জাতিকে টিকে থাকতে হলে পাশ্চাত্যের প্রভাব এবং তাদের কুচক্রের মায়াজাল ছিন্ন করে বাঁচতে হবে। বিশ্বমুসলিম দেশগুলো একে অন্যের সাথে নিজেদের অধঃপতিত কারণে নানাভাবে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে। তাদের এসব অপকর্মের খতিয়ান মিলিয়ে দেখে, বিভেদ ভুলে ঐক্যের সমাধানে আসতে হবে যাতে করে ইসলামের কৃষ্টি, ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মদর্শন এবং মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল পুনঃরায় শ্রেষ্ঠত্বে ফিরে আসে। ঐক্যের উদ্যোগ গ্রহণ এমনই হতে হবে যাতে বিশ্বমুসলিম জাতির সারা দেহে প্রাণ জেগে উঠে। হৃদয়ে জেহাদী অনুভূতি নিয়ে মুসলিম বীরোচিত বিশেষণে বিশেষিত হলে জাতি পরনির্যাতন থেকে মুক্তি পাবে।

বিশ্বের কোন কোন শক্তিধর দেশ যুদ্ধগন্ধে অবৈধ আক্রমণের নেশায় মেতে থাকে। আক্রমণকে প্রতিহত করে ইসলাম রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এবং সমর শক্তি অর্জন দ্বারা চাই অত্যাচারের অবসান। মুসলিম জাতির আত্মবিশ্বাসকে অটুট রেখে লড়াইয়ে লড়তে হবে। আঘাত আসা মানে বিপদ আসা তাই পরিত্রাণের জন্যে শক্ত হয়ে লড়তে হবে। বীরত্বশক্তির পরিচয় দিয়ে বনের বাঘ তাড়াতে হবে। মুসলমান জাতির এই চরম বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রত্যেকটি মুসলমান দেশকে হতে হবে আত্মপ্রত্যয়ের ধারক এবং বাহকের বৃত্ত রচনাকারী। তবেই বিশ্বমুসলিম শক্তি পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে।

আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ রসূল করিম (সঃ) এর সময় জগদ্বিখ্যাত রোমান ও পারস্য শক্তি সারা বিশ্বময় আধিপত্য বিস্তার করে ছিল। আপাত দৃষ্টিতে তাদের দুর্দম্য প্রতাপ দেখে মনে হয়েছিল এই জাতীয়তাবাদী শক্তি বোধহয় কোন দিন নিঃশেষ হবেনা। সে যুগে নৈতিক ও আদর্শিক শক্তিকে পুঁজি করে ইসলাম জগদ্বিখ্যাত রোমান শক্তিকে ম্লান করে দিয়ে স্বমহিমায় পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে ইসলামী আদর্শে সকল সমস্যার সমাধান দিতে পেরেছিল এই মুসলিম জাতি।

আল্লাহর নবী বলেছেন, গচ্ছিত সম্পদ আল্লাহর কোরআন ও রসূলের আদেশ মুসলমান জাতি দৃঢ়ভাবে ধারণ ও পালন করতে পারলে তাদের কোন পতন আসবে না। নবীর এই মহাসত্য বাণী স্মরণ করে বিশ্বমুসলিম জাতিকে

www.amarboi.org

আল্লাহ পাকের এজাযত প্রাপ্তির বাণী নিয়ে শত্রু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে শপথ নিতে হবে ইসলামের বিজয় গৌরব পুনরুদ্ধারে। ইসলামের গৌরবময় হৃতমর্যদা পুনরুদ্ধার করতে না পারলে মুসলমান জাতি নিজেদের পতন ডেকে আনবে। বিশ্বমুসলিম রাষ্ট্রনীতিবীদদের আন্তর্জাতিকতার ভাবরসে ইসলামী জাতীয়তাবাদকে বিপ্লবের চেতনায় জাগিয়ে তুলার শপথ নিতে হবে। তবেই ইসলামের পতন রোধ সম্ভব।

ইসলাম মুসলমানদের একটি ব্যবহার্য ধর্ম এবং বিশ্ব মুসলিম যখন একই নবীর উম্মত তখন একথা স্মরণ করে মুসলমান জাতিকে সমভাবনা চিন্তাচেতনা নিয়ে নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য শক্তি সঞ্চয় অপরিহার্য। জিহাদের মনোবল নিয়ে দুনিয়ার মুসলমানদের সংগবদ্ধ হয়ে শপথ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে কাপুরুষতা ইসলামে স্থান নাই।

প্রয়োজনে সকল মুসলমান জাতিকে এই সংকটময় অবস্থায় জাতিপ্রেম মিলনের অগ্রদূত হয়ে একযোগ কাজ করতে হবে। মুসলমান জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ইসলামের জাতশত্রুর বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ গড়তে হবে। সকল প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করতে হলে যা দরকার তা হচ্ছে বিশ্বমুসলমান জাতির একতাবদ্ধ শক্তি। জাতি একতাবদ্ধ হলে বাধা অতিক্রম করা হয় সহজ। মুসলমান জাতির শত্রুর শেষ নাই, এই শক্তিকে দমন করতে হলে বিশ্বমুসলিম জাতিকে সংঘবদ্ধ হতেই হবে।

শত্রুর আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা পেতে হলে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের ভেদাভেদ এবং পার্থক্য ভুলে ইসলাম প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির নিরাপত্তা নিশ্চিৎ করতে হবে। ইসলামের দুশমনেরা মুসলমান নারী পুরুষ শিশু নিধনের জন্য রক্ত মাতাল হয়ে নিরঙ্কুশ কাজ করে যুগযুগ ধরে। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন মজিদে এরশাদ করেন; "বস্তুতঃ যে আল্লার পথে সংগ্রাম করে সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক আমি শিঘ্রই মহা পুরস্কার দান করব।" (সূরা নিশা আয়াত-৭৪)।" তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য সংগ্রাম করবে না।" (সূরা নিশা আয়াত- ৭৫)।

যখন মুসলমানদের ইসলামী শক্তির মাঝে ধর্মহৃদ্যতায় দুর্বলতা দেখা দেয় তখনই তাদের অধঃপতন শুরু হয়। তাদের উপর দুর্বিপাক চড়াও হয়। দুঃখ লাঞ্ছনা সামনে এসে তাদের ঘায়েল করতে থাকে।

www.amarboi.org

এই মহাবিপদ থেকে উত্তরণের জন্য মুসলমান জাতিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মত একজাতিক ভাবাপন্ন সাদৃশ্যে আক্রমনের মূল সূত্রগুলি বুঝে নিয়ে একতাবদ্ধ হয়ে আক্রান্ত দেশের গণতন্ত্র রক্ষার্থে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র প্রধানদের একযোগে কাজ করতে হবে। আক্রান্ত মুসলিম দেশের ধ্বংস, হত্যা ও লুণ্ঠণ বন্ধের জন্য বিশ্বমুসলিম নেতাদের কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ ছাড়া ইস্পাত কঠিন মনোবল নিয়ে সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য।

মুসলিম জাতির শক্তি শিকড়ে রস জোগানোর জন্য মহাগ্রন্থ কোরআন এবং সত্য নির্ভর হাদিস হচ্ছে রস সিঞ্চনের উৎকৃষ্ট শক্তি। কোরআন হাদিসের মূল নীতি হল ইসলামের সকল বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক চিন্তাধারা সৃষ্টি করা। তখন এই সিদ্ধান্তের আলোকে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে জাতির বিপদের সময় প্রতিকারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা। বিজাতিদের সেচ্ছাচারিতা এবং তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি যাতে মুসলিম রাষ্ট্রদেহে আঘাত হানতে না পারে সেদিকে মনোযোগের দৃষ্টি দিতে হবে রাষ্ট্র প্রধানদের। ভুললে চলবে না তারা সকল সময় ইসলামের শৌর্যবীর্যের পরিপন্থী এবং এ খেলা দিন দিন যেন বেড়েই চলেছে।

আল্লাহর মহাগ্রন্থ কোরআন এবং নবীর হাদিস থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ধর্ম উপকরণগুলো নিখুঁত ভাবে অর্জন করে হিম্মতের সাথে সৃজনীশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে যাতে ইসলামীশক্তি বৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। ইসলামের সম্ভাবনাময় শক্তির উপর ভর করে মুসলমান জাতির ন্যায়বোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে মুসলিম জাতির সর্বগ্রাসী ক্ষতি রুখতে।

বর্তমানে বিশ্বমুসলিম সম্প্রদায়ের উচিত নিজেদের পতন রোধ করে বিজয় গৌরবের ইতিহাস পুনঃরুদ্ধার করা। মুসলমান জাতির রক্তপাত ও প্রাণ সংহার বন্ধ করা এটাই হতে হবে বিশ্বমুসলিম জাতির অঙ্গিকার। অতঃপর আমারা আশাবাদী একদিন অভূতপূর্ব মহান দৃশ্যের আর্বিভাব হবে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এরশাদ করেন, এই জাতির শেষ পর্যন্ত সেই পথেই সংশোধন হবে যে পথে এই জাতি প্রথমে সংশোধিত হয়েছিল।

www.amarboi.org

আলোর ছোঁয়ায় ইসলাম

একজন কর্মক্লান্ত মানুষকে চিত্ত আনন্দে বিভোর করতে হলে চাই মানব মনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই শ্রেষ্ঠ সম্পদটি হচ্ছে মনীষীদের পুঞ্জিভূত ভাষা। জ্ঞান সমৃদ্ধ গ্রন্থ পাঠে জ্ঞান বাড়ে, মন ভরে এবং একই সাথে শিক্ষা বিস্তারে পরিধিও বাড়ে। মানুষ আল্লাহর পরম চেতনা বিশিষ্ট সৃষ্টি। এ কারণে মানুষের পরম সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। বিশ্বের সব কিছুকে শীর্ষস্তরে তুলতে হলে প্রয়োজন জ্ঞান আহরণ। পাঠাভ্যাসই হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের প্রধান উৎস। বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠলে যেমন সময়ের সদ্বব্যবহার হয় তেমনি সত্যিকার বন্ধু হিসাবে বইকে জীবনের সাথী হিসেবে পাওয়া যায় সারাক্ষণ। বই মানুষের জ্ঞানের আকর এবং প্রকৃত বন্ধু। মানব বন্ধু অনেক সময় শত্রুরূপে একে অন্যের ক্ষতি সাধন করে থাকে। কিন্তু বইবন্ধুটি কোন সময় পাঠকবন্ধুর সাথে বেঈমানি করে না। জ্ঞানের জন্য বই সব সময় পাঠকের পাশে আনন্দের সাথী এবং জ্ঞানের উৎস। জীবনে কোন সময় দুঃখ কিংবা হতাশা এলে হাতের কাছের বইটি পড়তে থাকলে মনের মাঝে প্রশান্তির খোঁজ পাওয়া যায়। জ্ঞানের যেমন কোন শেষ নেই তেমনি অজানাকে জানার ইচ্ছারও কোন সমাপ্তি নেই।

জ্ঞান সমৃদ্ধ পৃথিবী পরিভ্রমণ না করলে জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। জ্ঞান অর্জনের জন্য পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক আমাদের প্রতি উপদেশ জারি করেছেন। জ্ঞান অর্জন কেবল বই পাঠে লাভ করা যায় তা নয় এবং জ্ঞান কেবলই যে শ্রেণী কক্ষে আবদ্ধ থাকে তাও না। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হতে হবে দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশের মধ্যে দেশ সৃষ্টি করা। বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞান শক্তিতে ফুটিয়ে তোলা। দেশ শিক্ষায় উপোবাসে থাকলে এমন রোগ দেখা দেবে যা পরিচয়ের ক্ষেত্রে কোন সম্মান থাকে না। তখন অবজ্ঞাই হয় দেশটির প্রাপ্য।

এই বৈচিত্র্যময় সুন্দর পৃথিবীটা জ্ঞানী মানুষের জন্য জ্ঞান দর্পণ। আল্লাহর সৃষ্টি এই অপরূপ পৃথিবী জ্ঞান আলোয় ঝলমল করছে। মানুষ বিরামহীন ভাবে জ্ঞানের জন্য সত্য অনুসন্ধানে এগিয়ে চলেছে যুগযুগ ধরে। আল্লাহর সৃষ্টি এই পৃথিবীতে মানুষ তার জ্ঞান শক্তি দ্বারা নব নব আবিষ্কার

www.amarboi.org

এবং উদ্ভাবন শক্তি দিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানকে অনেক উঁচু স্তরে এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের বিজয়ের মনোভাব না থাকলে জ্ঞান অর্জন সম্ভব হোত না। সাফল্যের প্রতি স্তরে জীবনকে কাজে লাগাতে হলে প্রয়োজন শিক্ষালব্ধ জ্ঞান অর্জন এবং তার অনুশীলন। এজন্য জ্ঞান গবেষণায় দরকার উন্নত মানের সমৃদ্ধ পাঠাগার। মুক্ত চিন্তা নিয়ে জ্ঞান সমৃদ্ধ ধরণীর অফুরন্ত সম্পদ অর্জনে আত্মনিয়োগ করতে পারলে মানব মনের জ্ঞান ক্ষুধার তৃপ্তি লাভ হয়।

মানুষকে তার চাহিদার জন্য সবকিছু অর্জন করে পেতে হয়। মানুষের জ্ঞান অর্জন এবং অর্থ উপার্জন এক চরিত্রের সনদ নয়। অর্থ উপার্জন পার্থিব জীবনের চাহিদা মিটিয়ে বাঁচার জন্য যেমন নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে তেমনি জ্ঞান অর্জন মানব মনের জ্ঞান তৃষ্ণার চাহিদা মিটাতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। জ্ঞান অর্জন, অর্থ উপার্জন অপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য শ্রম। মানুষের অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ব্যক্তি বিলাসিতা বেড়ে বাড়ি গাড়ি, আহার বিহার ও ভোগবিলাস সব কিছুর চাহিদা মিটায়। অধিক অর্থ উপার্জন অনেক সময় মদমত্তমাতঙ্গের মত তার জীবনকে উচ্ছৃঙ্খল পথে বিভোর করে রাখে। তখন তার কলুষময় জীবন চরিত্রে এনে দেয় সীমাহীন বিষাদের পাপ যন্ত্রণা।

ধন সম্পদ মানুষকে পার্থিব সুখ স্বচ্ছন্দে তৃপ্তি দিয়ে থাকে। মানুষের শ্রীবৃদ্ধি যতো বেশী হয়, সে ততো অধিক সম্পদের নেশায় সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অপর দিকে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পেলে সে কখনও বিপদগামী হয় না, অসামাজিক কাজে নিজেকে প্রলুব্ধ করে না, নিজেকে অসত্যের মাঝে নিক্ষেপও করে না। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি কেবল নিজেকে নিয়ে চিন্তা করে না, চিন্তা করে সমাজ, দেশ ও জাতিকে নিয়ে। জ্ঞানী লোকের চরিত্র হয় মহৎ। তাঁদের চরিত্রে থাকে প্রজ্ঞা, সততা, সংযম, আন্তরিকতা, ন্যায়পরায়নতা আর থাকে সদিচ্ছাভিলাষ। জ্ঞানী এবং ধার্মীক লোকেরা আত্মশুদ্ধি তথা ঐশী শান্তির কথা চিন্তা করে অনেক বেশী বেশী। বিদ্যানুরাগী এবং ধর্ম পরায়ন মানুষ ইসলামকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সঞ্জীবিত করে জ্ঞানতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় ছুটে বেড়ায় দেশ হতে দেশান্তর। যারা পুস্তক বিলাসী তারা জীবনে বেঁচে থাকার মূল্যবান সময়টুকু বই পাঠে অমৃত রসপানে নিজেকে মগ্ন রাখে। তারা জানে আল্লাহ সর্বজ্ঞানী তাই জ্ঞানের পথে চলা মানেই আল্লাহকে ভালবাসা। তারা আরও জানে অফুরন্ত জ্ঞান

www.amarboi.org

সম্পদের ভান্ডার কেবল আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত এবং তিনিই ইলেম শক্তির একমাত্র মালিক।

জ্ঞানে ধনী এবং যারা অর্থসম্পদে ধনী তারা উভয়ে জীবনের সাফল্য চায়। জ্ঞান মানুষের গর্বের সামগ্রী এবং ধনসম্পদ ধনীর অহংকারের বস্তু। এজন্যে অর্থের সাথে মেধার সম্পর্ক হয় না। জ্ঞানে ধনী ব্যক্তি নিজেকে অসামান্য বিবেচনা করেন কিন্তু সম্পদে ধনী ব্যক্তি নিজেকে অনেক বড় মনে করে নিজের কাছে আনন্দ পায়। জীবনে সাফল্যের জন্য একজন চায় অর্থকড়ি, অপরজন চায় জ্ঞানতরী। অর্থসম্পদ অর্জনে মানুষের বয়সের একটা সীমা আছে। বয়সে বার্দ্ধক্য এলে তখন সে দেহমনে ক্লান্ত হয়ে সংক্ষিপ্ত জীবনের নিরাপত্তায় দিন গুণতে থাকে। কিন্তু জ্ঞান অর্জনে বয়সের সীমারেখা দুলনা থেকে কবর পর্যন্ত। জীবনে প্রেরণা থাকলে সে তার জানার ইচ্ছাকে গতিময় করে জ্ঞান আহরণের জন্যে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে তার লক্ষ্যের পথে। জীবনে গতিময় শক্তি না থাকলে জ্ঞান লাভের প্রেরণা আসে না।

আল্লাহ পৃথিবী, সাগর, পাহাড়, পর্বত, উর্ধ্বে আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করে মানব শক্তির পদানত করে দিয়েছেন। এসব জয় করতে হলে মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা থাকতেই হবে। আল্লাহ্ পাক মর্যাদাপূর্ণ কোরআন গ্রন্থে জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা বলেছেন, প্রযুক্তি এবং তার উদ্ভাবনের কথাও বলেছেন। জ্ঞান অর্জনের মূল উৎস প্রধানত তিনটি। প্রথমটি হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দ্বিতীয়টি জ্ঞান সমৃদ্ধ পাঠাগার এবং শেষোক্তটি বিশ্ব পরিভ্রমণ। জ্ঞান না থাকলে মানুষ বাস করে পশুরাজ্যে। জ্ঞানের জন্য মানুষকে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা সবকিছু জয় করে নিতে হয়। এই জয়ের জন্য ইলেম শিক্ষা দ্বারা অর্জন কর নিতে হয় জ্ঞান সম্পদ।

বাঁচার জন্য বেশ কিছু আবশ্যকীয় বিষয় নিয়ে জীবনের কাঠামো তৈরী করে নিতে হয় এবং এই কাঠামোর সাথে খাপ খাওয়াতে হলে প্রয়োজন কাঠামোগত জ্ঞান। তা না হলে বিষয়টা মন্দের দিকেই পথ নেয়। জ্ঞানবোধটাই হচ্ছে মানুষের সমাজ সংস্কার জীবনের কর্তব্যবোধ। প্রকৃতপক্ষে জীবনকে শান্তিময় করার জন্য প্রয়োজন বিদ্যাশিক্ষা। এ কারণে শিক্ষা মানব জীবনের সভ্যতা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের সংহতি স্বরূপ। সুতরাং শিক্ষাই মানুষের সব চেয়ে বড় জীবনী শক্তি।

www.amarboi.org

শিক্ষা মানব জীবনের জন্য একটা ন্যায় সঙ্গত অধিকার। মুসলমান জাতির জন্য নিরক্ষরতা হচ্ছে মহাপাপ। আর এই পাপের হাত থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে পড়ালেখার মাধ্যমে বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞান অর্জন। এজন্য দরকার অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে বই পড়ার সুন্দর অভ্যাস গড়ে তোলা। পাঠাগার মানুষের জ্ঞান পিপাসার চাহিদা মিটাবার একটি অন্যতম জ্ঞানকেন্দ্র স্থল। পাঠাগারে নানা বিষয়ের উপর ভিন্নভিন্ন লেখকদের জ্ঞান সমৃদ্ধ বই সংরক্ষিত থাকে যা একক ব্যক্তির পক্ষে পারিবারিক গ্রন্থগার গড়ে তোলা অনেক সময় সম্ভব হয় না। পৃথিবীর বহু মহাপুরুষ মানবজাতির কল্যাণের জন্য জ্ঞান আহরণের কথা প্রচার করে গেছেন। প্রত্যেকটি নারীপুরুষ বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণে উদ্যোগী হলে নিরক্ষরতার অন্ধকার থেকে তারা আলোর পথে বেরিয়ে আসতে পারে। এজন্য তাদের হতে হবে বই মনস্ক। তবেই তাদের জ্ঞান পিপাসা ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে। তখন তারা চাইবে বই আরও বই।

বই পাঠের উদ্দেশ্য থাকে মূলতঃ দুটো। প্রথমটা জ্ঞানের উদ্দেশ্যে অপরটা আনন্দ লাভের জন্য। অনেকে বই পড়ে যেসব বই বাজারে বেশী কাটতি। সেসব বই তারা কেনে এবং পড়ে। জ্ঞানের জন্যে শ্রেষ্ঠ বই তারা স্পর্শ করে না কারণ ভালোর দিকে তাদের আকর্ষণ থাকে কম। জ্ঞান অনুশীলন কিংবা জ্ঞানেরচর্চা তাদের কাছে নিস্প্রয়োজন।

প্রকৃত পাঠকদের এমন সব বই নির্বাচন করা উচিত যে সকল বই পাঠে তাদের মনে দাগ কাটে, জ্ঞান প্রসারের জন্য তন্ময় হয়ে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। বাস্তবে এই শ্রেণীর পাঠকদের সংখ্যা অনেক কম। জ্ঞানে ধার্মিক হতে চাইলে ধর্ম জগতের ভাল ভাল বই পড়ে সুন্দর জীবন গড়তে হবে। এর ফলে ইহকাল ও পরকাল দুটোই হবে তাদের শান্তিময় জীবন। আল্লাহর ফরজ বিধান পালনের ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে এটা হবে তার জন্য মহতী কাজ। জ্ঞান অন্বেষণনের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তার জ্ঞান ভাণ্ডারকে করতে হবে পরিপূর্ণ যাতে করে আল্লাহ তাকে বেহেশতের পথে নিয়ে যায়।

সৃষ্টি ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে মানুষের মগজের ভেতরে যে জ্ঞান শক্তিটা নিহিত থাকে বই পড়তে পড়তে একদিন তার বিকাশ ঘটে। সামগ্রী পাঠাভ্যাসের জন্য বিভিন্ন জ্ঞান সমৃদ্ধ পুস্তকের পরিসর হতে হবে প্রয়োজনের তুলনায়

www.amarboi.org

আরও বেশী প্রয়োজন। জ্ঞানলব্ধ পড়াশুনা হচ্ছে শিক্ষা লাভের উপায়। সুতরাং জ্ঞানপ্রাপ্ত গর্বিত মানুষ হতে হলে পড়াশুনার বিকল্প নাই।

বই পাঠ অভ্যাসে মানুষের জ্ঞানের রাস্তা খুলে যায়। এজন্যে জগতের বুদ্ধিমানেরা বই পড়ে। বই তাদের কাছে অনন্ত যৌবনা। তাদের কাছে বইয়ের মৃত্যু নেই। যাদের জ্ঞান যত তীক্ষ্ণ তারাই কোন এক সময় যোগ্যতার উচ্চ শিখরে আসীন হয়। সমাজে শিক্ষিত মন পেতে হলে ঐ মনকে শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। এটাই হলো জীবনের সেরা নির্যাস।

সমাজে আর এক শ্রেণীর পাঠক আছে যারা বই পড়াকে পছন্দ করে না। কারণ তাদের মতে বই পড়তে গেলে মস্তিষ্ক দিশেহারা হয়ে পড়ে। বেশী বেশী বই পড়লে তারা মস্তিষ্কের কুলকিনারা হারিয়ে ফেলে। একারণে তাদের বাইরের অবস্থার চেয়ে ভেতরের জায়গাটা বেশ অন্ধকার।

শিক্ষার জন্য আল্লাহর নিকট থেকে সর্বপ্রথম নির্দেশ আসে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর কাছে। এ কারণে নবীজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ভাল করে বুঝে ছিলেন বলে তাঁর সময়ে কোন মুসলমান অশিক্ষিত থাকতে পারেনি। শিক্ষা মানুষের জ্ঞানশক্তি। মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান নির্ভর করে জ্ঞান সাধনার মৌলিক সত্তা এবং অন্তর্দৃষ্টি শক্তির ওপর। জ্ঞানের জন্য দরকার পাঠাভ্যাস এবং সেই সাথে থাকবে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার। যাবতীয় জ্ঞানের উৎস হচ্ছে বিদ্যাশিক্ষা। যারা শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে চায় তারাই পাঠাগারকে জীবনের একটি বড় অংশ মনে করে সত্যানুসন্ধানী হয়ে ঝকঝকে তকতকে মানুষ হতে পেরেছে।

কামাল আতাতুর শৈশব কালে বড়ই উৎসুক বালক ছিল। কথায় কথায় সে তার মায়ের কাছে কৌতূহলী মনে নানা প্রশ্ন করতো। আতাতুরের মা বলতেন ছোটবেলা কামাল আমাকে বড্ড জ্বালাতো যা অন্য পরিবারের ছেলেরা এতো জ্বালাতো না। মা স্বস্নিগ্ধ মনে ছেলের নানা প্রশ্নের উত্তর দানে কামালের জ্ঞান পিপাসার ইচ্ছা মিটাতেন। মা সব সময় পন্ডিত সুলভ কৌশলে ছেলের মনের নানান প্রশ্নের জবাব দিতেন। মা তার সন্তানকে একদিন বলে ছিলেন, "বাছা মন দিয়ে পড়াশুনা কর বড় হয়ে সব জানতে পারবে।" এককালে কামাল বড় হয়ে তুরস্কের অধিনায়ক হয়ে দেশ

www.amarboi.org

পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণ করে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ভালভাবে উপলব্ধি করে ছিলেন বলে কামাল পাশা মাত্র দশ বছর সময়ের মধ্যে তাঁর দেশ থেকে নিরক্ষরতা, কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূর করতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝে ছিলেন দেশ থেকে অশিক্ষা দূর করতে না পারলে দেশের মানুষ আত্মবিশ্বাস এবং মনুষ্যত্বের পথ হারিয়ে ধ্বংসের গর্ভে তলিয়ে যাবে।

আমাদের ধর্মগ্রন্থ ত্রিশ পারা কোরআনে শিক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ সর্বপ্রথম যে বাণীটি উচ্চারণ করেছেন তা হচ্ছে "পড় তোমার প্রভুর নামে।" এর কারণ হচ্ছে শিক্ষা যা একজন মানুষকে পূর্ণতা এবং পবিত্রতার রূপ দেয়। পবিত্র ত্রিশ পারা কোরআনের কয়েক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেছেন তিনি পৃথিবীতে সব কিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ সূরা ইয়াসিনে ৩৬ নং আয়াতে একথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় শিক্ষা এবং অশিক্ষা একটি জোড়া শব্দ। শিক্ষা হচ্ছে জ্ঞানালো এবং অশিক্ষা হচ্ছে অন্ধকারের প্রতীক। আলো এবং অন্ধকার এ দুটো যেমন ভিন্ন চরিত্রের স্বরূপ, তেমনি শিক্ষা এবং অশিক্ষা এ দুটো আলাদা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আলো এবং অন্ধকার একত্রে যেমন মিলন হয় না তেমনি শিক্ষা এবং অশিক্ষার মূলেও তদ্রূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিদ্যাশিক্ষা কত যে পবিত্র কাজ তা মুসলমান জাতিকে এর মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে হবে কারণ ইসলামধর্ম শিক্ষা ছাড়া পরকালের মুক্তির পথ সম্ভব নয়। হারাম হালাল, ন্যায় অন্যায় এবং কর্তব্য অকর্তব্য জানার জন্যে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে আমাদের সকলকে।

নবীজী এই ধরাধামে এসেছিলেন উম্মি অর্থাৎ নিরক্ষর হয়ে। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি উম্মি ছিলেন না। প্রত্যেকটি মানুষ জন্ম নেয় অশিক্ষিত হয়ে। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানলব্ধ বই পাঠে সে জ্ঞানী হয়ে ওঠে। নবীজী পরিপূর্ণ জ্ঞানশিক্ষা লাভ করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহর কাছে। তিনি এই পৃথিবীতে কোন ব্যক্তির কাছে শিক্ষা লাভ করেননি। কেবল আল্লাহই ছিলেন নবীজীর একমাত্র শিক্ষক। আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাইল (আঃ) নবীজীকে বিভিন্ন সময়ে বহুমুখী জ্ঞান শিক্ষা দিতেন।

বিশ্বের বুকে সকল জ্ঞান সাধকেরা সব সময় তাঁদের জ্ঞান সাধনা দ্বারা সত্যকে খুঁজে বের করে নেয়। তাঁদের কাছে সত্য যেমন মহা মূল্যবান

www.amarboi.org

সম্পদ তেমনি মূল্যবান গ্রন্থও তাঁদের জীবনের চিরসাথী। এজন্য পাঠাগার মানব জাতির জন্য একটি গ্রন্থজগৎ। যুগযুগ ধরে মানুষের জ্ঞানলব্ধ চিন্তাচেতনা রক্ষিত আছে পাঠাগারে। বই মানুষের জ্ঞানের আধারকে কাগজ কালিকলম দিয়ে ধরে রেখেছে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের সময় থেকে। বই পড়ার আনন্দ কত যে সুন্দর জ্ঞান পিপাসু পাঠকবর্গ তা ভালই বোঝেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলছেন ঃ "আমাকে জ্যান্ত মারতে চাইলে ছুরি, চাকু, পিস্তল, বন্দুক প্রয়োজন নাই। আমাকে বইয়ের জগৎ থেকে আলাদা রাখলেই চলবে।" বই পড়া কত যে মহৎ কাজ তা ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের উক্তি থেকে উপলব্ধি করা যায়। জগতে মানুষের কামনায় যত ভাল ভাল কাজ আছে তন্মধ্যে উত্তম কাজ হচ্ছে বই পড়া অভ্যাস। পাঠাগার হচ্ছে বই পড়ার অন্যতম আখড়া। বই পাঠে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির ব্যাপক প্রসার ঘটে উন্মুক্ত আকাশের মত। যে জাতি বই পাঠে যত বেশী অভ্যাস গড়ে তুলেছে সেই জাতি জ্ঞান-শাস্ত্রে অনেক বড় দার্শনিক হতে পেরেছে। জ্ঞানী লোকের জ্ঞানেশ্বর পাঠাগারে সংরক্ষিত থাকে বইয়ের পাতায় পাতায় যা ভাষা হয়ে প্রতিধ্বনিত হয় জ্ঞান পিপাসু পাঠকের কাছে।

পাঠাগার হচ্ছে অতীতের সাথে বর্তমানের সেতুরাস্তার সংযোগ স্থাপন। হাজার হাজার বছর পূর্বের মানুষ বেঁচে নাই কিন্তু তারা রেখে গেছে হরফের লেখায় তাদের জ্ঞান সৃষ্টি রচনা। একটি পাঠাগারে কারো প্রবেশ ঘটলে সে বুঝবে কী সম্পদ গচ্ছিত আছে জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে। প্রাচীন কালে পন্ডিত ব্যক্তিরা গ্রন্থনা সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন বলে সেই অতীত কাল থেকে অনেক জ্ঞান পিপাসু মানুষ নিজ অর্থ ব্যয়ে আপন গৃহে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভারত, চীন, মিশর প্রভৃতি দেশে এমন অনেক পাঠাগারের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ সকল পাঠাগারে সাধারণ মানুষ বই পাঠের কোন সুযোগ পেত না। প্রাচীন ভারতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি জ্ঞান সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল।

বর্তমানে প্রত্যেকটি স্কুল থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তাদের নিজস্ব গ্রন্থাগার রয়েছে। এই সকল গ্রন্থাগারে বিভিন্ন জ্ঞানের বই সংরক্ষিত সুব্যবস্থা পদ্ধতিতে আছে। মানুষের জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যক্তি উদ্যোগে পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জ্ঞান লাভের সুযোগ অনেক প্রসারিত হয়েছে।

www.amarboi.org

প্রাচীন কালে ভারতে টোলের পন্ডিতগণ পাঠদানের সময়ে ভিন্ন নিয়মে শিষ্যদের পাঠ দান করতেন। তখন মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ঘটেনি। সে সময় টোলের পন্ডিতগণ মুখে মুখে শিষ্যদের সংস্কৃত ভাষায় পাঠদান করতেন। এমন কি পরীক্ষার পদ্ধতিও ছিল মুখে মুখে। এর পরের যুগে তালপাতা, মাটির পাত্রে, শীলাগাত্রে, ভূজপত্রে লেখার নিয়ম চালু হয়। পরবর্তীতে কাগজ ও মুদ্রা যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে বিদ্যাশিক্ষা ব্যবস্থা পুস্তাকারে আত্মপ্রকাশ ঘটে। তখন থেকে সূচনা হলো আধুনিক যুগের।

সভ্য জাতির প্রাণ হচ্ছে একটি ভাল গ্রন্থাগার যা মানব কল্যাণে জ্ঞানজ্যোতি। পৃথিবীর বড় বড় দেশে সরকারী উদ্যোগে বড় বড় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সারা সোভিয়েত রাশিয়ায় দেশজুড়ে প্রায় চার লাখের মত লাইব্রেরী আছে। সমগ্র মস্কো শহরেই পাঠাগারের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। মস্কোর লেলিন পাঠাগারটি রাশিয়ার সর্ববৃহৎ পাঠাগার। এই পাঠাগারে বইয়ের সংখ্যা দু'কোটি সত্তোর লক্ষ। মস্কো শহরের বিশাল আঠারো তলা বিল্ডিংয়ে একসঙ্গে বার হাজার পাঠকদের বই পড়ার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। লণ্ডন, ওয়াশিংটন ও মস্কোর মত বড় বড় শহরে গবেষকদের পাঠাগার ব্যবহারের ব্যবস্থাটাও অতি আধুনিক। সোভিয়েট ইউনিয়নের পাবলিক লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা এক কোটি। ওয়াশিংটনের উইনাইটেড ষ্টেট অব কংগ্রেস লাইব্রেরীটি আমেরিকার সর্ববৃহৎ লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ছয়কোটি এবং নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা প্রায় তেষট্টি লক্ষ। যুক্তরাজ্যের ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা বাষট্টি লক্ষ। ফরাসী দেশের প্যারিশে বিবলি ওথেক ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গ্রন্থ সংখ্যা ষাট লক্ষেরও কিছু বেশী। এছাড়া রোমের বিবলি ওথেক ম্যাজিওনাল লাইব্রেরীতে গ্রন্থসংখ্যা কুড়ি লক্ষ, ভিয়েনা শহরে দি ন্যাশনাল বিবলি ওথেক লাইব্রেরীতে গ্রন্থ সংখ্যা পনের লক্ষ, সুইডেনের ষ্টকহোম শহরে রয়েল লাইব্রেরীতে গ্রন্থ সংখ্যা আট লক্ষ সত্তর হাজার, জাপানে টকিও শহরে ন্যাশনাল ডিন লাইব্রেরীতে গ্রন্থ সংখ্যা শাঁইত্রিশ লক্ষ, ভারতে কলকাতার আলিপুরে ন্যাশনাল লাইব্রেরী পশ্চিম বঙ্গের একটি বৃহৎ লাইব্রেরী। পৃথিবীর সকল বড় বড় জাতীয় লাইব্রেরীগুলো মানব জাতির জ্ঞান সমুদ্র যেন অথৈ পানির নীচে গভীর তলদেশ। ঐসব দেশের পাঠাগারে ছাত্রছাত্রী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সব বসয়ের পাঠানুরাগী এবং সকল পেশার

www.amarboi.org

মানুষ জ্ঞানের জন্যে সব সময় এখানে ভীড় জমায়। দেখলে মনে হয় সবাই যেন পাল্লা দিয়ে বইপাঠে নেশাগ্রস্থ। কোথাও কোন টুঁ শব্দ নেই। সকলে নিজ নিজ সিটে বসে পড়াশুনা করে নিঝুম নীরবে। পাঠকের দুচোখের দৃষ্টি কেবল বইয়ের পাতায় যেন নেশাখোরের তাকলাগানো আড্ডা। বাংলাদেশে ঢাকার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার, ঢাকার অন্যতম সেন্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরী এবং রাজীশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও খ্যাত।

(উল্লেখিত পরিসংখ্যানটি ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত "টিচার্স এ্যালবাম" নামক প্রতিবেদন থেকে লওয়া হয়েছে।)

জ্ঞানজগতে পাঠাগার জ্ঞানলাভের উত্তম কেন্দ্রস্থল হলেও জ্ঞানব্রতী মানুষের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞান তৃষ্ণার ইচ্ছাপূরণ অতৃপ্ত থেকে যায়। একটা বৃহৎ পাঠাগারে আবস্থান কালে জ্ঞানব্রতী মানুষটি নিজের জ্ঞানকে সমুদ্রতীরে ক্ষুদ্র বালুকণার মত অনুভব করেন যেমনটি অনুভব করতেন বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন। পৃথিবীর যেসব দেশে বড় বড় পাঠাগার আছে সেসব দেশের জাতি জ্ঞানলব্ধে অনেক প্রগতিশীল। কবির ভাষায় "থাকলো যারা পিছুর টানে কাঁদবে তারা কাঁদবে।" তখন এই ক্রন্দন হয়ে ওঠে পশ্চাৎগামী জাতির ব্যর্থ ক্রন্দন।

আমার ছাত্র জীবনে কোন এক সময়ে ঢাকাস্থ্ ব্রিটিশ কাউন্সিলে সদস্য ছিলাম। একদিন কাউন্সিলের লাইব্রেরীর গ্রন্থ বিভাগগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ অনেক বইয়ের সমাহারে একটা বইয়ের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম সেখানে। বেশ সাবধানে বইটা শেলফ্ থেকে বের করি। বইটা বেশ মোটাসোটা, সঠিক মনে নেই এর পৃষ্ঠা সংখ্যা কত হবে। তবুও যতদূর মনে হচ্ছে প্রায় চারশ পৃষ্ঠার বই। মলাটের উপর বড় অক্ষরে লেখা আছে "দি ব্রেন।" বুঝলাম এটা একটা ডাক্তারী বই। বইটা আমার চিন্তা চিত্তে অনুভূতির আলোড়ন জাগিয়ে দিল। বইটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য চিন্তা জগতে হারিয়ে গেলাম। চিন্তা করতে লাগলাম মানবদেহে যতগুলো পৃথক পৃথক দেহযন্ত্র আল্লাহ সংযোজন করেছেন মস্তিষ্ক যন্ত্রটি তন্মদ্ধে অন্যতম। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে আছে মগজ। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের মগজের ওজন ১.৪ কেজি এবং এর মধ্যে আছে ১৪ বিলিয়ন নার্ভ সেল। একটি সংকেত মগজে পৌছানোর সময় প্রতি ঘন্টায়

www.amarboi.org

৪০০ কিঃ মিঃ বেগে ছুটে যায়। মানুষের বুদ্ধি ভাণ্ডার হচ্ছে মগজ। এটাই জ্ঞান জগতে উদ্ভাবনশীলতার মূল উৎস। সকল অনুভূতি ও বুদ্ধির আধার এই মানব মস্তিষ্ক। মগজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি যেমন মানব জগতে জ্ঞান বিজ্ঞানকে চরম উন্নতির শিখরে এগিয়ে নিয়ে যায় তেমনি মগজের বুদ্ধিহীনতা, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, উন্মত্তা ইত্যাদি সবই মগজের নিষ্ফল ক্রিয়াকর্মের অচল অবস্থা। মানুষের চিন্তা শক্তি আসে মগজের শক্তি থেকে। কাজ চলাকালীন সময়ে মগজশক্তি মানুষকে সঠিক পরিচালনা দিয়ে সাহায্য করে। শুধু তাই নয় বরং বিকাশের প্রথম স্তরের সবটাই মগজ থেকে আবির্ভূত হয়। যে কোন কাজের জন্য কল্পনা সৃষ্টি হয় এই মগজ থেকে এবং আমাদের সমস্ত কাজের সূচনাও হয় মগজ থেকে। সুতরাং মগজের চেনতা অনুভূতি মানুষকে গতিময় করে রাখার যন্ত্রশক্তি এবং এই গতিমান যন্ত্রশক্তি হচ্ছে মানুষের প্রকৃত প্রাণ। মস্তিষ্কের মানসশক্তি হচ্ছে আত্মার প্রতিনিধি। এতোগুলো চিন্তা একসাথে আমার মাথার মধ্যে ঝিলিক মেরে মনের মধ্যে নাড়া দিয়ে উদ্বেলিত করতে লাগলো। বারবার মনে হতে লাগলো মানুষের জ্ঞানের পরিধি কত ব্যাপক এবং সুদূর প্রসারী। মুহূর্তে মনে হলো এর চেয়ে বড় জ্ঞানী আর একজন আছেন, তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ। এবারও যেন আমার মনমগজটা ভূকম্পনের মত একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আমাকে মুহূর্তে স্তব্ধ করে দিল।

জ্ঞানে আল্লাহর কাছে মানুষ মূঢ়মতি। আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী এবং মহাপ্রজ্ঞাময়। আল্লাহর জ্ঞান এবং তাঁর অসীম গুণাবলী সম্পর্কে কোরআন মজিদে মহান আল্লাহ্ বলেছেন– "পৃথিবীর সমুদয় বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এ যে সমুদ্র এর সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয় তবুও আল্লাহর গুণাবলী লিখে শেষ করা যাবে না।" (সূরা লুকমান, আয়াত-২৭) পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ আরও বলেন, আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি ছয়দিনে, আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। (সূরাঃ ক্বাফ,আয়াত-৩৮)।

বিশ্বে বড় বড় গ্রন্থাগারে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থের সমাহার দেখলে মনে হয় এ যেন এক যুগান্তকারী অলৌকিক বিশ্বজ্ঞান মঞ্জিল। জ্ঞানী লোকেরা তাদের জ্ঞানকে কালি কলম দিয়ে পুস্তকারে ধরে রেখেছে এই গ্রন্থাগারে। ধরণীর বুকে গ্রন্থাগার হচ্ছে জ্ঞানের খনি। বিশ্বের সকল পাঠাগারে জ্ঞানী লোকের জ্ঞান ভান্ডারাকারে সংরক্ষিত থাকলেও আল্লাহ্র কাছে তা নিত্যান্ত

www.amarboi.org

নগণ্য। জ্ঞান সম্পদ আহরণ করাই হচ্ছে জ্ঞান সাধকের কাজ। এজন্য অধ্যবসা দ্বারা আমাদের বই পড়ার সুন্দর অভ্যাস গড়ে উঠলে দেশের মানুষ মস্তিষ্ক প্রসূত হয়ে জ্ঞান সমৃদ্ধ শিক্ষা সংস্কৃতির ভাবধারায় উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হবে। তখন সেই জাতির গ্রন্থাগার হয়ে উঠে একটি অলংকৃত জ্ঞান ভান্ডার। একটি দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায় বিশ্বের দরবারে সেই দেশের মর্যাদা ততো প্রশংসিত হয়। যুগেযুগে এই পৃথিবীতে জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তাঁদের জ্ঞান সাধনার দ্বারা অন্ধকার থেকে আলোর পথে জীবনের গতিকে প্রসারিত করার জন্য গড়ে তুলেছে অনিবার্য পাঠাগার (For more new learning in any branch of knowledge)। মানব জাতির গবেষণা উদ্ভাবন কার্যক্রমের জন্যে পাঠাগারকে বিচ্ছিন্ন রাখলে মানব সভ্যতা কখনও জ্ঞানালোর মুখ দেখবে না।

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য শিক্ষা এবং জ্ঞান গবেষণার কথা পবিত্র কোরআনের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং যেখানে জ্ঞানের জন্য শিক্ষার ভূমিকা নাই সেখানে ধর্মের ফসলও উৎপন্ন হয় না। কারণ শিক্ষাই হচ্ছে ধর্ম পালনের মূল স্তম্ভ অর্থাৎ ধর্ম পালনের চারণ ক্ষেত্র। শিক্ষার অভাবে সকল ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে পাপ তিমির সমাজ। জীবনে সোনা ফলাতে হলে জ্ঞানবিজ্ঞানে শিক্ষা এবং ধর্মশিক্ষা দুটোই জীবনের পক্ষে কল্যাণকর। আল্লাহর নবী আমাদের যে ভাবে জীবন পথের নির্দেশনা দিয়েছেন তা যথাযথ ভাবে পালন করলে কল্যাণময় জীবনের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। মানুষের কর্মটা মূলতঃ ধর্ম দ্বারা বেষ্ঠিত। ধর্মের অঢেল ঐশ্বর্য হচ্ছে বেহেশতী সুখের সাফল্য। এ কারণে ধর্মের এবং কর্মের সাফল্য অর্জনের জন্য দরকার শিক্ষার সাথে ধর্মশিক্ষা।

মানুষ যখন শিক্ষার মাধ্যমে ইসলমকে অর্থাৎ নিজ ধর্মকে জানতে, বুঝতে এবং শিখতে শেখে তখন তার জ্ঞানের পরিধি ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হতে থাকে উৎসাহের দিকে। ধর্মের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হলে সে তার মনের উৎসাহ নিয়ে ধর্মীয় বই পড়ার সুযোগ নিজেই খুঁজে বের করে নেয়। তার মস্তিষ্কের তথা জ্ঞান বিকাশের জন্য যতটা প্রয়োজন ততটাই ভালভাল বই পাঠ দ্বারা বিকাশ প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে চলে।

সন্তানদের ধর্মগ্রন্থ পাঠাভ্যাসের মূল দায়িত্ব তাদের পিতামাতাদের হাতে। দায়িত্বটা পালন করতে হলে তাদেরও ধর্মের প্রতি থাকতে হবে

www.amarboi.org

আগ্রহ। শুধু তাই নয়, সন্তানের শিক্ষার প্রতিও থাকতে হবে সু-নজর। শিক্ষায় শিক্ষাপ্রীতি না থাকলে তা নিরক্ষরতার এবং অজ্ঞতার অন্ধকারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মনে রাখতে হবে নিরক্ষরতা হচ্ছে ইসলামের শত্রু। বইয়ের সাথে মানুষের সাক্ষাৎ থাকলে বই-ই তাকে অনেক বিষয়ে নতুন নতুন শিক্ষা দেয়। একজন পাঠানুরাগী নিজের পছন্দের ধর্মগ্রন্থ এবং জ্ঞানের জন্য আরও অন্যান্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে নিতে পারলে একদিন তার গৃহে গড়ে উঠবে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার। ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন ইসলামী পাঠাগার যেখানে ধর্ম শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ সংরক্ষিত থাকে। ইসলামী গ্রন্থগার থেকে মুসলিম সভ্যতা এবং জেহাদি আন্দোলনের কিতাব সংগ্রহ করে নিলে মুসলমান জাতির অতীত কীর্তি জানা হয় সহজ। মুসলিম ইতিহাস স্পষ্ট ভাষায় বলে দেবে এককালে মুসলমান জাতি কেমন করে আশ্চর্য জনক ভাবে চরম উন্নতি করেছিল। যে জাতি ইতিহাস কী তার প্রত্যক্ষ ধারণা দিতে পারে না কিংবা যে জাতি নিজের ইতিহাস জানে না এবং যে জাতি নিজেরদের ইতিহাস রক্ষা করতে পারেনা এর পরিণাম ফল কখনও শুভ হয় না।

মানুষের ইহকাল ও পরকালের সাফল্য অর্জনের জন্য দরকার ধর্মশিক্ষা। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্যে প্রয়োজন ইসলামী পাঠাগার। ইসলাম ধর্মতত্ত্বের জ্ঞান অর্জন দ্বারা প্রকৃত মোমেন হওয়ার সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং ধর্মজ্ঞানজ্যোতি দ্বারা ইসলামকে রক্ষা করা মুসলমান জাতির নৈতিক দায়িত্ব। একারণে মসজিদ পাঠাগারের গুরুত্ব অপরিসীম।

দেশে বড় বড় শহরের মসজিদগুলো আকারে যেমন বড় তেমন সুন্দরও বটে। মসজিদ কেবল আজান এবং নামাজের স্থান তা নয়, মসজিদ অর্থ সিজদা। সিজদার জায়গা মানে নামাজের ঘর। সামগ্রিক ভাবে মসজিদকে হতে হবে ইসলামী সংস্কৃতির দরবার। একারণে এখানে থাকবে ধর্মীয় গ্রন্থাগার যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যেও থাকবে দক্ষ পরিচালনা ব্যবস্থা। প্রাচীন মুসলিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মসজিদ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মসজিদ ভিত্তিক জ্ঞানচর্চার জন্যে প্রয়োজন ধর্মালোচনা, ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদি। মূলতঃ জ্ঞানের জন্যে প্রয়োজন বিভিন্ন গ্রন্থ এবং ঐ সকল গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য দরকার একটি পাঠাগার। জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানকে ধরে রাখতে হলে তাঁদের রচিত সকল বইপুস্তক পাঠাগারে

www.amarboi.org

সংরক্ষণ করতে হবে। ইসলামের স্বর্ণযুগ থেকে ধর্মীয় বইপুস্তক সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করার উত্তম স্থান হিসেবে মসজিদ এ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এজন্য প্রয়োজন মসজিদ পাঠাগার যেখানে ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা জ্ঞান চর্চার জন্যে অধ্যয়নে সময় কাটায়। ঢাকা শহরে প্রায় অনেক মসজিদে ইসলামী পাঠাগার চালু আছে। এই সকল পাঠাগার বেশ সুচারুরূপে পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে এই সকল পাঠাগারে পাঠকদের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বায়তুল মুকাররাম মসজিদ পাঠাগারটি "ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ" নামে পরিচিত। এই পাঠাগারে ইসলামধর্ম বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। মোটের উপর শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক জ্ঞান পিপাসু পাঠক নিয়মিত এই পাঠাগারে এসে জ্ঞান অর্জন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী বিভাগের ছাত্রগণ সংখ্যায় অল্প হলেও এই পাঠাগারে এসে তাদের মনের ইচ্ছার তাগিদ নিয়ে কিছুকিছু বিষয়ের উপর পড়াশুনা করে।

নবীজীর সময় ইসলামের সকল সমস্যার সমাধান হোত মসজিদে। ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সমর নীতি এবং ইসলামের উদারনীতি সবই পরিচালিত হোত মসজিদ কেন্দ্র থেকে। সুতরাং মসজিদ হচ্ছে মুসলিম সমাজের অন্তঃস্থল। মুসলিম সমাজে ইসলামী আলোড়ন আনতে হলে মসজিদকে হতে হবে ইসলামের শক্তিশালা। শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে ইসলামী পাঠাগার মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুমেয়। বাংলাদেশে প্রত্যেকটি মসজিদের কার্য পরিচালনার জন্যে একটি করে মসজিদ কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। মসজিদ পাঠাগার স্থাপনে মসজিদ কমিটির স্বক্রিয় উদ্যোগ এবং শান্তোজ্জ্বল দৃষ্টি থাকলে জ্ঞান পিপাসু মুসুল্লীরা মসজিদ পাঠাগার থেকে ইসলামী গ্রন্থ সংগ্রহ করে তাদের ধর্ম জ্ঞানকে আরও উৎস ধারায় বিকশিত করে নিতে পারবে।

মানুষের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের জন্যে মুসলিম জাহানে ছোট বড় অনেক কুতুবখানা স্থাপিত হয়েছে। বৃহদাকারে প্রথম পাঠাগারটি বাগদাদের বায়তুল হিকমা (জ্ঞান ভবন) ৮৩০ খৃষ্টাব্দে খলিফা আল মামুন প্রতিষ্ঠা করেন। এটা ছিল যুগবৎ পাঠাগার এবং অনুবাদ কার্যালয়। আরবরা যত প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা করতো তার প্রত্যেক প্রকার কেতাব এখানে পাওয়া যেত। গুরুত্বের দিক দিয়ে কায়রোর ফাতিমিয়া পাঠাগারটি ছিল বায়তুল হিকমার সমকক্ষ। খলিফা আল রাজী ছিলেন এই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা। এই

www.amarboi.org

পাঠাগারে মোট বইয়ের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার। ক্রমে এই পাঠাগারে বইয়ের সংখ্যা বিশলক্ষে দাঁড়ায়। এখানে কেবল প্রাচীন জ্ঞানের বই ছিল আঠারো হাজার। মিশরে আলী বিনয়্যাহরা আল মুনাজিম এর প্রাসাদে একটি পাঠাগার ছিল। স্বদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিদ্যার্থীরা এখানে আসতেন জ্ঞান অন্বেষণে। এখানে জ্যোতিরবিদ্যা চর্চা হোত বেশী। মুসলিম গৌরবের যুগে মুসলানেরা স্ব-স্ব দেশে বড় বড় কুতুবখানা স্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে কায়রো, ত্রিপোলী প্রভৃতি নগরে পাঠাগারে হস্ত লিখিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ছিল কয়েক লক্ষ।

ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলমানেরা মধ্যপ্রাচ্য, স্পেন, এবং পর্তুগালে অনেক উন্নতমানের শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। এইসব শিক্ষায়তনে ছিল সমোন্নত মানের গ্রন্থাগার। এসব গ্রন্থাগারে মুসলমানদের নিজস্ব গ্রন্থ ছাড়াও প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও কবি সাহিত্যিকদের জন্যও ছিল বিভিন্ন রচনাবলী। এছাড়াও অতীতে মুসলীম মনীষীরা মুসলিম জগতের প্রত্যেক স্থান থেকে জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ করে তাঁদের নিজস্ব পাঠাগার গচ্ছিত রাখতেন। প্রাচীন মুসলিম যুগে একটি গৌরবোজ্জ্বল দিক হচ্ছে হাতে কলমে চিকিৎসা শাস্ত্র ও বিজ্ঞান শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে মুসলমানেরা সর্বপ্রথম মিশরে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এই হাসপাতালে ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কীয় একটি পূর্ণ পাঠাগার। এই পাঠাগারে চিকিৎসা শাস্ত্রের সব ধরনের গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল। চিকিৎসকগণ তাদের পেশায় কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে এই পাঠাগারে যথারীতি চিকিৎসা শাস্ত্রে পড়াশুনায় ব্যস্ত রাখতেন নিজেদের।

প্রাচীনকালে মুসলমানদের রাজধানী কর্ডোভা নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল সত্তরটি সাধারণ পাঠাগার, সাত'শ মসজিদ এবং একশরও বেশী উন্নত মানের বিদ্যালয়। এখানে আরও ছিল একটি বিশ্ববিদ্যালয়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অমূল্য গ্রন্থের সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষের অধিক। সেখানে গ্রীক, ভারতীয় এবং পারসিক ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছিল উন্নত ব্যবস্থা।

ইবনে সিনার নাম আমরা সকলেই জানি। তিনি ছিলেন ইরাকের এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ধনী পরিবারের মানস ব্যক্তি। কোন এক সময় ইরাকের সুলতান নূর ইবনে মনসুর, ইবনে সিনা কর্তৃক রোগমুক্ত হলে তিনি তাঁর রাজকীয় বিশাল গ্রন্থগারটি ইবনে সিনাকে উপহার দেন। এই গ্রন্থগারে বহু

www.amarboi.org

প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান পুস্তক ভান্ডার সঞ্চিত ছিল।

খলিফা হাকিম ছিলেন মিশরের অধিবাসী। তিনি দারুল হিকমা নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে সেখানে উচ্চস্তরের বিভিন্ন জ্ঞানশাস্ত্রে শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। তাঁর রাজ প্রাসাদেও ছিল এক বৃহৎ গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারে বহু জ্ঞান পিপাসু সুধীবৃন্দের জন্য নিয়মিত পড়াশুনা ও জ্ঞান গবেষণার পথ তিনি উন্মুক্ত করে দিয়ে ছিলেন।

ইবনে হায়সাম ছিলেন ইরাকের অধিবাসী। তিনি জ্ঞানে ছিলেন অতি সুপন্ডিত ব্যক্তি। তিনি বহু গ্রন্থ হাতে লিখে এবং অনেক প্রাচীন গ্রন্থ নকল করে একটি গ্রন্থশালা স্থাপন করেছিলেন নিজ বাস গৃহে। তিনি অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে সতেরটি বিভিন্ন জ্ঞানশাস্ত্রের উপর সর্বমোট ১১৫টি গ্রন্থ হাতে লিখে রচনা করেছিলেন। তাঁর হাতের লিখাও ছিল অতিশয় সুন্দর।

ইসলামে জ্ঞান অর্জন একান্ত কর্তব্য। নামাজের মত ইসলামে শিক্ষা গ্রহণ এবং জ্ঞান অর্জন দুটোই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ করা হয়েছে। সুতরাং ইহকাল ও পরকালের মুক্তির জন্যে প্রত্যেক মুসলমানকে বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করতেই হবে। বিদ্যাশিক্ষা ছাড়া মুসলমানদের মুসলমানিত্ব থাকতে পারে না। পবিত্র কোরআনে "ইকরা বিসমি" এই ছোট্ট শব্দটি দ্বারা মহান আল্লাহ্ সর্বপ্রথম তাঁর বান্দাদের প্রতি জ্ঞান অর্জনের কথা বলেছেন। এ কারণে মুসলমান জাতিকে গ্রন্থপাঠের আবশ্যকতা ধরে রাখতে হবে ইসলামের ধর্ম চূড়ায় আরোহণ কল্পে। তাই পাঠাভ্যাসে পাঠকের মনোযোগ একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য নিজ মাতৃভাষায় রচিত গ্রন্থ সংগ্রহ করে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ইসলামের জ্ঞানপ্রদীপ জ্বেলে ধর্ম-দর্শনে যত্নবান হয়ে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হতে হবে মুসলমান জাতিকে। এ কারণে পাঠাগারকে গড়ে তুলতে হবে পাঠকদের জ্ঞানার্থবহ করে। পাঠাগারকে ভালবাসতে শিখলে জ্ঞান আহরণের জন্য নিজের কাছেও উৎসাহ পাওয়া যায়। ইসলামী পাঠাগারকে গুরুত্বে স্থান দিয়ে মনে রাখতে হবে ইসলামের নিরাপদ আশ্রয় স্থল শিক্ষার মাধ্যমে ধর্ম শিক্ষা।

ইসলামী পাঠাগার হচ্ছে ধর্মজ্ঞান বিকাশে সত্যের জ্ঞানকোষ। ইসলামী পাঠাগার মুসলীম সভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডার এবং জ্ঞান সাধনায় উত্তম পৃষ্ঠপোষক। ইসলামী পাঠাগার মুসলমান জাতির জন্য জ্ঞান আহরণের চিরন্তন এন্তেজাম এবং জ্ঞান গৌরবে ইহা একটি ধর্মজগৎ।

www.amarboi.org

লেখক পরিচিতি

লেখক আবুল হোসেন পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলায় ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। মাতা হালিমা খাতুন ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মহিলা। পিতা আবদুস ছামাদ কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় শিক্ষকতা পেশায় ব্যয় করেন।

আবুল হোসেনের শিক্ষা জীবন শুরু হয় মাদ্রাসা শিক্ষা দিয়ে। তিনি জুনিয়ার মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্ত করে স্থানীয় হাইস্কুলের শিক্ষা শেষে কলকাতার স্যার আশুতোষ কলেজ থেকে বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাব বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন।

লেখকের কর্মজীবন শুরু হয় ব্যাংকের চাকরি দিয়ে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সর্বস্ব হারিয়ে তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি বিটিএমসি এর অধীনে টেক্সটাইল মিলে চাকরি করে পরিবার পরিজনদের নিয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য জীবনপথে নতুন করে এগিয়ে চলেন। ২০০৩ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন। নিয়ম অভ্যাসের ধারাবাহিকতায় তিনি একজন পরিশ্রমী মানুষ। তিনি মনেপ্রাণে নিজের কাজে আনন্দ পান। কাজ তাঁর ভাল লাগে। ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত। চিন্তাশক্তির অনুভূতি নিয়ে চাকরি জীবনের পরবর্তী সময় থেকে তিনি লেখার দিকে মনোযোগী হয়ে লেখনী ধরেন। কিন্তু বাকী সময়টা তিনি লেখার ঝোঁকে কাটাতে চাইলেও বার্ধ্যকের ভারে তাঁর অনেক কিছু দুর্বল হয়ে থেমে যায়।

www.amarboi.org